# টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট:
# বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এপ্রিল ২০১৯

# টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট:
# বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ খ্রি:

(মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত এপ্রিল ২০১৯)

এসডিজিএস প্রকাশনা নং # জিইডি ১৫

প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব:
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলা প্রকাশকাল:
এপ্রিল ২০১৯

*বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা:*
সভাপতি, ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

*সম্পাদনা সহযোগী:*
ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ম-প্রধান
মিজ জান্নাত আরা, উপ-প্রধান
মিজ রাহনুমা নাহিদ, উপ-প্রধান
মো: মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, সিনিয়র সহকারী প্রধান
নেপোলিয়ন দেওয়ান, সিনিয়র সহকারী প্রধান
শিমুল সেন, সিনিয়র সহকারী প্রধান

এই প্রতিবেদনটি *Engaging with Institutions (EI)* শীর্ষক *IP* প্রকল্প, ইউএনডিপি-বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশ করা হয়েছে।

মুদ্রাকর:
**ইনতেশার প্রিন্টার্স**
২১৭/এ, ফকিরাপুল, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

মুদ্রণ: ২০০০ কপি

**এম. এ. মান্নান, এমপি**
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী (মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত)

বাংলাদেশের বৈশ্বিক উন্নয়ন অভীষ্ট(এসডিজি) অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ প্রকাশ করার জন্য আমি পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে (জিইডি) অভিনন্দন জানাই। এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো বিগত দু'বছরে, অর্থাৎ বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত ২০৩০ বৈশ্বিক উন্নয়ন অভীষ্ট শুরু থেকে অদ্যাবধি, আমরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি এবং কোথায় পিছিয়ে পড়েছি সে সম্পর্কে একটা বিশ্লেষণধর্মী ধারণা দেওয়া।

উত্তরসূরী এমডিজির সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত এসডিজি প্রকৃতিগতভাবে সমন্বিত বা অন্তর্ভুক্তিমুলক, সুদূরপ্রসারী এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নকালে এটি সহযোগিতাপূর্ণ অংশীদারিত্ব দাবি করে। এসডিজির মূল দর্শন 'কাউকে পেছনে না ফেলে' ধারণ করে বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকেছে এবং লক্ষ্য পূরণে এজেন্ডা ২০৩০ এর লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হয়। তবে, তার প্রস্তুতি হিসাবে এসডিজি বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকান্ড কীভাবে পরিচালনা করা হবে সে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়েছিল।

এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ একদিকে যেমন ১৭ টি বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রার তথ্যপুঞ্জি হিসাবে সফলতার ও চ্যালেঞ্জের চালচিত্র, তেমনি এটা ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এটা তাই অস্বাভাবিক নয় যে, বিদ্যমান নীতিগুলোকে ঝালিয়ে একটা অধিকতর হলিস্টিক পদ্ধতি নেয়ার জন্য এই প্রতিবেদনটি প্রণোদনা হিসাবে কাজ করবে।

এই সুযোগে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জিইডির কর্মকর্তা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যারা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সকলকে সাধুবাদ। এই প্রতিবেদন তৈরিতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দানের জন্য ইউএনডিপিকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশা করছি, প্রতিবেদনটি আরো বেশি পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়ার পথ প্রশস্ত করবে এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য বিভিন্ন অংশীজনদের সিংহদ্বার হিসাবে কাজ করবে।

(এম. এ. মান্নান, এমপি)

**মো. আবুল কালাম আজাদ**
মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী (মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত)

আমি শুনে খুবই আনন্দিত যে, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) 'বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮' প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং এই প্রসংশাধ্বনির কেন্দ্রে যে অর্জনগুলো ছিল তার মধ্যে রয়েছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, জেন্ডার সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়ন। এমডিজিতে সোনালী সাফল্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সর্ব-বেষ্ঠিত ২০৩০ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডার (এসডিজি) আলোচনায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে দেশটি ১৭ টি বৈশ্বিক অভীষ্ট জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করেছে। এর বাইরে যে কাজের জন্য জিইডি প্রসংশার দাবী রাখে তার মধ্যে আছে কিছু নীতিমালা সংক্রান্ত দলিল তৈরি করা। যেমন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য কর্মপরিকল্পনা, ডাটা গ্যাপ এনালাইসিস, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক, এসডিজির অর্থায়ন কৌশল, শিক্ষা খাত এবং বাংলাদেশের ভোলানটারি ন্যাশনাল রিভিউ ২০১৭। আমি আশা করছি যে, এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদনটি আমাদের সকল প্রস্তুতির সফলতা ও সীমাবদ্ধতার সার্বিক পরিস্থিতির চিত্তাকর্ষক একটি চিত্র তুলে ধরবে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ২০৩০ এজেন্ডার অত্যন্ত উচ্চভিলাষী এবং রূপান্তরিত দর্শন বাস্তবায়নের কাজটি তার পূর্বসুরী এমডিজির চেয়ে অনেক ব্যয়বহুল এবং পরিশ্রমী।

আর তাই এসডিজি অগ্রগতির প্রতিবেদন সফলতার সঙ্গে প্রস্তুতকরণে আমি জিইডির কর্মকর্তা ও নেতৃত্বকে তাদের প্রচেষ্টা, উৎসর্জন এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রশংসা প্রসারিত করতে চাই। একই সঙ্গে, নানাভাবে প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বলার বোধ হয় অপেক্ষা রাখে না যে, কারিগরি ও আর্থিক সহয়তা দিয়ে প্রতিবেদনটির পূর্ণতা প্রাপ্তিতে প্রশংসনীয় ভুমিকা পালন করেছে বলে ইউএনডিপি বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য।

আমি বিশ্বাস করি যে, একদিকে প্রতিবেদনটি যেমন অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করবে, অন্যদিকে তেমনি যে সমস্ত জায়গায় কৌশলকে দৃশ্যমান কর্মে পরিণত করতে আরও অন্তর্ভুক্তিমুলক এবং জরুরি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন, সেগুলো সনাক্তকরণে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। আমার বিশ্বাস যে, দেশের "সর্ব সমাজ" (Whole of society) অভিগমনে, প্রতিবেদনটি বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করবে এবং মূলমন্ত্র "আমরা একত্রে পারি (Together we can)" চেতনায় সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে প্রভূত সাহায্য করবে।

(মো. আবুল কালাম আজাদ)

**ডঃ শামসুল আলম**
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

## এসডিজি প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ সম্পর্কিত প্রারম্ভিক কথা
## (মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত)

**'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি):** বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮' দেশে চলমান এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য এসেছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে যারা এসডিজি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এসডিজির অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি রেজাল্ট ফ্রেমওর্য়াকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এমডিজি থেকে এসডিজিতে সন্দিহান উত্তরণে যে সমস্ত দেশ সমস্ত প্রস্তুতিমূলক পর্ব সম্পন্ন করে অগ্রদূত হিসাবে গণ্য, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ কর্তৃক সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদক্ষেপের কথা না বললেই নয়: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি অঙ্গীভূতকরণ, তথ্য ঘাটতি পর্যেলোচনা, আর্থিক দায় নিরুপণ এবং এসডিজির জন্য একটা জাতীয় পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরি করা। বলে নেয়া ভালো, এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এগুলো হলো মূল স্তম্ভ।

২০১৬ এবং ২০১৭ সালের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত এসডিজি ২০১৮ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে সাফল্য শুধু জাতীয় দারিদ্র্য রেখায়(এনপিএল) পরিমাপ করা চরম দারিদ্র্য নিরসনে সফলতার চিত্তাকর্ষক চিত্রের মধ্যেই সীমিত নয় বরং সমাজিক সুরক্ষার সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতি, সরকারি মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যয় ইত্যাদি প্রত্যাশিত পর্যায়ে আছে বলে মনে হয়। কৃশতা হ্রাসে অগ্রগতিতে ধীর গতি লক্ষ্য করা গেলেও খর্বতা হ্রাসের ক্ষেত্রে আমরা বেশ বড় মাপের অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছি। পাঁচ বছর বয়ষ্ক শিশুর মৃত্যুহার (<৫ এমআর) এবং নবজাতক মৃত্যুহার (এনএমআর) প্রত্যাশিত পর্যায়ে আছে। আশা করা যায় যে, বাংলাদেশ ২০২০ নাগাদ লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

২০১৩ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার মোট অন্তর্ভুক্তির অনুপাত ধীর গতিতে বেড়েছে (১.৪৫ শতাংশ পয়েন্ট/বছর)। এদিকে এক দশকের ও বেশি সময় ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার সমতা ১-এর উপরে থেকেছে। ২০১৭ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচক অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশে সার্বিক জেন্ডার সমতা ৭২ শতাংশে নেমে এসেছে। এর ফলে বাংলাদেশ বৈশ্বিক স্তরে ৪৭ তম অবস্থান নিয়ে কৃতিত্বের তালিকার শীর্ষে অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী অন্য দেশগুলোর তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তথা খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে উন্নতি চিত্তাকর্ষক। উন্নত পয়:নিষ্কাশন সুযোগ প্রাপ্তিতে উন্নতি ঘটেছে শতকরা হিসেবে ২৬% যেখানে খোলা জায়গায় মলত্যাগ হ্রাস পেয়েছে ৩৩%।

প্রতীয়মান হয় যে, ফি-বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার শুধু বাড়ছে না ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যহত আছে। যেমন, ২০১৫-২০১৮ আর্থিক বছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬-৭ শতাংশ থেকে উল্লম্ফন ঘটিয়ে ৭ শতাংশের ওপর পৌছায়। উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ এই যে, প্রতি কর্মরত ব্যক্তির জিডিপি বিবেচনায় নিলে, ২০২০ সালে প্রত্যাশিত বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭ সালেই অর্জিত হয়েছে। অপরদিক, জিডিপিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ মূল্য সংযোজনের হিস্যা নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ইতিমধ্যে ২০২০ সালের মাইলফলক ২০১৭ সালে অর্জিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বলা দরকার যে প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতার বিষয়টিও সুসময়ের সাক্ষ্য দেয় যেমন ২জি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত শতভাগের এর কাছাকাছি পৌছে গেছে আর ৩জি প্রযুক্তির আওতায় থাকা জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ২০২০ মাইলফলক ২০১৭ সালে অর্জিত হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ এখন ৪জি প্রযুক্তিতে প্রবেশ করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বাসযোগ্য সামর্থ্য অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশের এই অর্জন আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। জলবায়ু পরিবর্তন-প্রসূত সংকট মোকাবেলায় বলিষ্ঠ অগ্রগতি ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু কৌশল, পরিকল্পনা এবং কর্মকান্ড সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে এবং উপশম পদক্ষেপ কার্যকর করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলের বিশাল একটা অংশ প্রাপ্ত হয়েছে যা জৈব সম্পদ ও জৈববৈচিত্রে সমৃদ্ধশীল এবং এখানে রক্ষিত বিরল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার ঘটাতে হবে।

তবে এসব সফলতা সত্ত্বেও দেশটি এসডিজি লক্ষ্য বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে প্রয়োজনীয় সম্পদের সংযোজন। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের এক হিসাব মতে, এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত মোট বিনিয়োগ করতে হবে ৯২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রতিবছর ৬৬ বিলিয়ন ডলার। তার অর্থ-আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ কৌশল ঢেলে সাজাতে হবে এবং এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যক্তি খাতের যথাযথ ভূমিকার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বলার বোধ হয় অপেক্ষা রাখে না যে, ২০৩০ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা বা বৈশ্বিক উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সমস্ত অংশীজনদের মধ্যে মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

অন্যদিকে, তথ্যের ঘাটতি এসডিজি লক্ষ্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই যে, এই দুর্ভোগের সম্মুখীন আমরা হয়েছি ২০১৮ এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে। এর কারণ, এসডিজি অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জাতিসংঘ কৃর্তক নিয়োজিত ২৩ টি সূচকের মধ্যে আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল মাত্র ৭০ টি যা মোট সূচকের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। স্বাভাবিকভাবে সুপারিশ দাড়াঁয় এই যে, জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান এই তথ্য ঘাটতি হ্রাসে আরও বেশি সক্রিয় ও সচেষ্ট হবে। আর এটি করতে গেলে বিবিএসকে আরও শক্তিশালী, সম্ভব হলে জনগঠিত করা দরকার। একই সঙ্গে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের উচিত হবে এসডিজির সাথে সম্পর্কিত প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহে উদ্যমী হওয়া। প্রসঙ্গত না বললেই নয় যে, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের বিবিএস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে জরুরি ভিত্তিতে এগিয়ে আসা উচিত।

কিছুটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জাতিসংঘ এসডিএসএন সূচক ও ডাটা ড্যাশবোর্ড রিপোর্ট ২০১৭-এর ভিত্তিতে ১৫৭ টি দেশের মধ্যে মাত্র এক বছরের কৃতিত্ব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করেছে ১২০। ঘটনাটি দুঃখজনক এ জন্য যে শুধু ২০১৬ সালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনও হতে পারে যে অবস্থান নির্ধারণে আংশিক তথ্যের সাহায্য কিংবা অগ্রহণযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে এমনটি ঘটেছে। অবশ্য, অতি সাম্প্রতিক তথ্য অর্থাৎ ২-৩ বছরের ব্যবধানে নেওয়া তথ্য ঐ অবস্থানকে সমর্থন করে বলে মনে হয় না। সুতরাং, সুপারিশকৃত পদক্ষেপ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ এসডিএনএর মধ্যকার তথ্যের সমন্বয় সুসংহত ও সঠিক করা।

পরিশেষে, জিইডির সকল কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তারা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরিতে প্রসংশনীয় ভূমিকা রেখেছে বলেই সম্ভবত আমরা সফল হতে পেরেছি। জিইডির পক্ষ থেকে এতটুকু বলতে পারি যে, মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রায়োগিক এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে সচেষ্ট থেকেছে- যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জলবায়ু পরিবর্তন - যা এসডিজির মূল স্তম্ভের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সুযোগে আমি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) বাংলাদেশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই তার কারণ, ইআই (Engaging with Institutions) প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি আমাদের প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে।

জিইডির পক্ষ থেকে আমরা সবাই মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ মান্নান, এমপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁদের সর্বান্তকরণ সমর্থন এবং উৎসাহ এসডিজি অগ্রগতির প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করার কাজটি সহজতর করেছে।

(ডঃ শামসুল আলম)

# সূচিপত্র


আদ্যাক্ষর ..... ১৩

সারসংক্ষেপ ..... ১৭

ভুমিকাঃ এসডিজি বাস্তবায়ন পথ ..... ২৫

প্রেক্ষাপট ..... ২৬

২০৩০ আলোচ্যসূচি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ..... ২৬

জাতীয় উন্নয়ন আলোচ্যসূচিতে এসডিজি অঙ্গীভূতকরণ ..... ২৭

এসডিজি বাস্তবায়ন পদ্ধতি ..... ২৭

এসডিজি বাস্তবায়নে অভিগমনঃ "সার্বিক সমাজ" পদ্ধতি ..... ৩০

প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতিকল্পে নেয়া পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ..... ৩০

এসডিজি বাস্তবায়নে তদারকিতে প্রতিবন্ধকতা ..... ৩১

প্রতিবেদনটির সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ৩১

**এসডিজি ১ঃ দারিদ্র্য বিলোপ ..... ৩৩**

১.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৩৪

১.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ১ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৩৪

১.৩ এসডিজি ১ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ৩৮

১.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ৩৯

১.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ৪০

১.৬ সারাংশ ..... ৪১

**এসডিজি ২ঃ ক্ষুধা মুক্তি ..... ৪৩**

২.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৪৪

২.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ২ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৪৪

২.৩ এসডিজি ২ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ৪৬

২.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ৪৭

২.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ৪৭

২.৬ সারাংশ ..... ৪৮

**এসডিজি ৩ঃ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ ..... ৪৯**

৩.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৫০

৩.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ৩ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৫০

৩.৩ এসডিজি ৩ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ৫৫

৩.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ৫৬

৩.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ৫৭

৩.৬ সারাংশ ..... ৫৮

**এসডিজি ৪ঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাসম্পন্ন গুণগত শিক্ষা ..... ৫৯**

৪.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৬০

৪.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ৪ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৬০

৪.৩ এসডিজি ৪ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ৬৩
৪.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ৬৩
৪.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ৬৪
৪.৬ সারাংশ ..... ৬৫
**এসডিজি ৫ঃ জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন ..... ৬৭**
৫.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৬৮
৫.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ৫ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৬৮
৫.৩ এসডিজি ৫ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ৬৯
৫.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ৭০
৫.৫ অগ্রগতির সারাংশ ..... ৭০
**এসডিজি ৬ঃ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ..... ৭৩**
৬.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৭৪
৬.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ৬ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৭৪
৬.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়ঃ এসডিজি ৬ অর্জনে কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তুতি ..... ৭৭
৬.৪ অগ্রগতির সারাংশ ..... ৭৭
**এসডিজি ৭ঃ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি ..... ৭৯**
৭.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৮০
৭.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ৭ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৮০
৭.৩ সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রচেষ্টাসমূহ ..... ৮২
৭.৪ মূল চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ৮৩
৭.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ৮৪
৭.৬ সারাংশ ..... ৮৫
**এসডিজি ৮ঃ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ..... ৮৭**
৮.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৮৮
৮.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ৮ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৮৮
৮.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ৯৩
৮.৪ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ৯৩
৮.৫ সারাংশ ..... ৯৪
**এসডিজি ৯ ঃ অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ ..... ৯৭**
৯.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ৯৮
৯.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ৯ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৯৮
৯.৩ এসডিজি ৯ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ১০১
৯.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১০২
৯.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ১০২
৯.৬ সারাংশ ..... ১০৩
**এসডিজি ১০ঃ অসমতা হ্রাস ..... ১০৫**
১০.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১০৬

১০.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ১০ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ১০৬
১০.৩ এসডিজি ১০ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ১০৭
১০.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১০৭
১০.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ১০৮
১০.৬ সারাংশ ..... ১০৯
**এসডিজি ১১ঃ টেকসই শহর এবং জনপদ ..... ১১১**
১১.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১১২
১১.২ বাংলাদেশ এসডিজি ১১ অবস্থান ..... ১১২
১১.৩ এসডিজি ১১ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ১১৪
১১.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১১৬
১১.৫ সারাংশ ..... ১১৮
**এসডিজি ১২ঃ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উন্নয়ন ..... ১২১**
১২.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১২২
১২.২ টেকসই উৎপাদনের ধরন ও ভোগের অবস্থা ..... ১২২
১২.৩ এসডিজি ১২ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা ..... ১২৪
১২.৪ টেকসই ভোগ ..... ১২৫
১২.৫ সারাংশ ..... ১২৫
**এসডিজি ১৩ঃ জলবায়ু কার্যক্রম ..... ১২৭**
১৩.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১২৮
১৩.২ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ১২৮
১৩.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১৩৩
১৩.৪ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ১৩৩
১৩.৫ সারাংশ ..... ১৩৪
**এসডিজি ১৪ঃ জলজ জীবন ..... ১৩৫**
১৪.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১৩৬
১৪.২ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ১৩৬
১৪.৩ সরকারি প্রচেষ্টা ..... ১৩৬
১৪.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১৩৭
১৪.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ১৩৮
১৪.৬ সারাংশ ..... ১৩৮
**এসডিজি ১৫ঃ স্থলজ জীবন ..... ১৩৯**
১৫.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১৪০
১৫.২ অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ১৪০
১৫.৩ সরকারি প্রচেষ্টা ..... ১৪৫
১৫.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১৪৮
১৫.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ..... ১৪৮
১৫.৬ সারাংশ ..... ১৪৮

**এসডিজি ১৬ঃ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ..... ১৪৯**
১৬.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১৫০
১৬.২ সূচকের মাধ্যমে অভীষ্ট ১৬ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ১৫০
১৬.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১৫৩
১৬.৪ সারাংশ ..... ১৫৩
**এসডিজি ১৭ঃ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব ..... ১৫৫**
১৭.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ..... ১৫৬
১৭.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ১৭ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ১৫৬
১৭.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ ..... ১৬১
১৭.৪ সারাংশ ..... ১৬২
**তথ্যপঞ্জি ..... ১৬৩**
**সংযোজনঃ এসডিজিসমূহঃ এক দৃষ্টিতে লক্ষ্যমাত্রা নিরিখে বাংলাদেশের অগ্রগতি ..... ১৬৯**

# সারণি তালিকা


সারণি ১.১: আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত ..... ৩৪
সারণি ১.২: উঁচনিচু দারিদ্র্য রেখা ২১২২ (ক্যালরি/দিন) ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা ১৯৯২-২০১৬ ..... ৩৪
সারণি ১.৩: নিচুহত দারিদ্র্য রেখা ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা ১৯৯২-২০১৬ (%) ..... ৩৫
সারণি ১.৪: খানা প্রধানের জেন্ডার অনুযায়ী দারিদ্র্য প্রবণতা ২০০০-২০১৬ (%) ..... ৩৫
সারণি ১.৫: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি কভারেজ প্রবণতা, ২০০৫-২০১৬ (%) ..... ৩৬
সারণি ১.৬: মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিভিন্ন সেবায় সরকারি ব্যয় (%) ..... ৩৭
সারণি ২.১: ১৫-৪৯ বয়স্ক মহিলাদের অপুষ্টি (%) ..... ৪৪
সারণি ২.২: পাঁচ বছরের নিচে শিশুর পুষ্টিগত অবস্থানের প্রবণতা ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৪ (%) ..... ৪৫
সারণি ২.৩: বাংলাদেশে কৃষিমুখীতা সূচক ২০০১-২০১৫ ..... ৪৫
সারণি ২.৪: কৃষি খাতে মোট সরকারি প্রবাহ (সরকারি উন্নয়ন সাহায্য ও অন্যান্য সরকারি প্রবাহ), ২০১২ থেকে ২০১৭ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ..... ৪৬
সারণি ৩.১: মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত, ১৯৯৫-১৯৯৬ ..... ৫০
সারণি ৩.২: প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি, ১৯৯৪-২০১৬ (%) ..... ৫০
সারণি ৩.৩: অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুহার, (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে) ..... ৫১
সারণি ৩.৪: নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবন্ত জন্ম) ..... ৫১
সারণি ৩.৫: কিশোরী মায়ের সন্তান জন্মদানের হার (১৫-১৯ বছর) প্রতি এক হাজার জন নারীতে ..... ৫৩
সারণি ৩.৬: মেডিকেল চিকিৎসা গবেষণা এবং মৌলিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নীট উন্নয়ন সরকারি সহায়তা, ২০২২-২০১৭ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ..... ৫৪
সারণি ৪.১: মোট অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুপাত, প্রাক-প্রাথমিক, ২০০০-২০১৬ ৬১
সারণি ৪.২: শিক্ষায় জেন্ডার অগ্রাধিকার সূচক, ১৯৯০-২০১৬ ..... ৬১
সারণি ৪.৩: ১৫ ও তদূর্ধ্ব বছর বয়সী প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার ..... ৬২
সারণি ৪.৪: প্রাথমিক শিক্ষকের ডিপিইডি/সি-ইন-ইডি (%) ..... ৬৩
সারণি ৫.১: সংসদে মহিলা সদস্যদের অনুপাত, ১৯৯১-২০১৫ ..... ৬৯
সারণি ৫.২: দক্ষিণ এশিয়ায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের আপেক্ষিক চিত্র ..... ৭১
সারণি ৭.১: বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত (%) ..... ৮১
সারণি ৭.২: রান্নায় পরিষ্কার জ্বালানির ও প্রযুক্তিতে সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত (%) ..... ৮১
সারণি ৭.৩: মোট জ্বালানি ব্যবহারে নবায়ণযোগ্য জ্বালানির অংশ (%) ..... ৮২
সারণি ৭.৪: প্রাথমিক জ্বালানির তীব্রতার স্তর (প্রতি বিলিয়ন বাংলাদেশী টাকায় তেল সমতুল্য কিলোটন (কোটি) .. ৮২
সারণি ৮.১: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (%) ..... ৮৯
সারণি ৮.২: বেকারত্বের হার, অকৃষিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও উপার্জন ..... ৯০
সারণি ৮.৩: শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নেই এমন তরুণ-তরুণীর অনুপাত (এনইইটি) ..... ৯১
সারণি ৮.৪: মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় পেশাগত আঘাত ..... ৯২
সারণি ৮.৫: আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সূচক ..... ৯২
সারণি ৯.১: প্রতি বর্গমাইলে রাস্তার ঘনত্ব ..... ৯৮
সারণি ৯.২: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের অবদান, ২০০১-০২ থেকে ২০১৬-১৭ (%) ..... ৯৯
সারণি ৯.৩: মাথাপিছু ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজন (স্থীর ২০১০ মার্কিন ডলার), ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১৫-১৬ ৯৯

সারণি ৯.৪: মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান (%) ..... ৯৯
সারণি ৯.৫: প্রতি মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে (পূর্ণকালীন) গবেষকের সংখ্যা ..... ১০০
সারণি ৯.৬: অবকাঠামোগত খাতে মোট আন্তর্জাতিক সহায়তার পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ২০১২ থেকে ২০১৬ ১০০
সারণি ৯.৭: প্রযুক্তি দ্বারা মোবাইল নেটওর্য়াক দ্বারা আচ্ছাদিত জনসংখ্যার অনুপাত (%) ..... ১০০
সারণি ১০.১: প্রবাহের ধরন অনুযায়ী উন্নয়নখাতে সম্পদ প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ..... ১০৭
সারণি ১৩.১: দূর্যোগের প্রকৃতি অনুযায়ী আক্রান্ত খানা (%), ২০০৯ থেকে ২০১৪ ..... ১৩১
সারণি ১৫.১: বাংলাদেশের বন ..... ১৪০
সারণি ১৫.২: বন বিভাগ ও বন ব্যবস্থপনা ..... ১৪১
সারণি ১৫.৩: সংরক্ষিত জায়গার বিশেষত্ব (আইইউসিএন ২০১৫) ..... ১৪৩
সারণি ১৫.৪: প্রজাতির অবস্থান তুলনা, ২০০০ এবং ২০১৫ ..... ১৪৫
সারণি ১৫.৫: বাংলাদেশের ইকোলজিকালি ক্রিটিকাল এরিয়া (ইসিএএস) ..... ১৪৬
সারণি ১৬.১: পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ..... ১৫১
সারণি ১৬.২: মানব পাচার ও যৌন নিপীড়ণে আক্রান্তের সংখ্যা ..... ১৫১
সারণি ১৭.১: বহিস্থ অর্থায়নের উৎস ..... ১৫৭
সারণি ১৭.২: অভ্যন্তরীণ কর দিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজেট অর্থায়নের অনুপাত (%) ..... ১৫৮
সারণি ১৭.৩: বার্ষিক বাজেটে বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য ..... ১৫৮
সারণি ১৭.৪: বার্ষিক বাজেটে এফডিআই এর অনুপাত ..... ১৫৮
সারণি ১৭.৫: জিডিপিতে রেমিট্যান্স এর অনুপাত ..... ১৫৯
সারণি ১৭.৬: রপ্তানি অনুপাতে ঋণ পরিশোধ ..... ১৫৯
সারণি ১৭.৭: স্থায়ী ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রহণ ..... ১৫৯
সারণি ১৭.৮: ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অনুপাত (%) ..... ১৬০
সারণি ১৭.৯: বাংলাদেশের প্রতিশ্রুত কারিগরি সহয়তার ডলার মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ১৬০
সারণি ১৭.১০: গড় পড়তা শুল্ক হার ..... ১৬১

## চিত্রের তালিকা

চিত্র ৬.১: দক্ষিণ এশিয়ায় পান করার মত পানির সরবরাহ বিস্তৃতি ..... ৭৫
চিত্র ১৩.১: বাংলাদেশের বহুমুখী ঝুঁকির মানচিত্র ..... ১২৯
চিত্র ১৩.২: ঘূর্ণিঝড়ের সময় মৃতের সংখ্যা ..... ১৩০
চিত্র ১৩.৩: দূর্যোগের প্রকৃতি অনুযায়ী আক্রান্ত খানা (%), ২০০৯ থেকে ২০১৪ ..... ১৩০
চিত্র ১৪.১: সময়ের বিবর্তনে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি ..... ১৩৭
চিত্র ১৫.১: সংরক্ষিত এলাকার মানচিত্র (দুটো সামুদ্রিক এলাকা দেখানো হয়েছে) ..... ১৪২
চিত্র ১৫.২: বন-বিভাগ কর্তৃক ভেলচার সেভ জোন ..... ১৪৭

# আদ্যাক্ষর শব্দাবলী

| | |
|---|---|
| ADB | Asian Development Bank |
| ADP | Annual Development Programme |
| AIMS | Aid Information Management System |
| APA | Annual Performance Assessment |
| BBS | Bangladesh Bureau of Statistics |
| BB | Bangladesh Bank |
| BCCSAP | Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan |
| BCCTF | Bangladesh Climate Change Trust Fund |
| BCCRF | Bangladesh Climate Change Resilience Fund |
| BDF | Bangladesh Development Forum |
| BDT | Bangladesh Taka |
| BEN | BD ECD Network |
| BIDA | Bangladesh Investment Development Authority |
| BOBLME | Bay of Bengal Large Marine Ecosystem |
| BMI | Body Mass Index |
| BR | Birth Rate |
| BRIS | Birth and Death Registration Information System |
| BTRC | Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission |
| BWDB | Bangladesh Water Development Board |
| CCs | Community Clinics |
| CCGAP | Climate Change and Gender Action Plan |
| CEGIS | Centre for Environmental and Geographic Information Services |
| C-in-Ed | Certificate in Education |
| DAC | Development Assistance Committee |
| DBHWD | Department of Bangladesh Haor and Wetland Development |
| DFQF | Duty Free Quota Free |
| DGHS | Directorate General Health Services |
| DNCC | Dhaka North City Corporation |
| DPHE | Department of Public Health Engineering |
| DPEd | Diploma in Primary Education |
| DoE | Department of Environment |
| DoF | Department of Fisheries |
| DoP | Department of Prison |
| DOTS | Directly Observed Therapy with short course chemotherapy) |
| DR | Death Rate |
| DSCC | Dhaka South City Corporation |
| ECNEC | Executive Committee of the National Economic Council |
| EPI | Expanded Programme on Immunization |
| EU | European Union |

| | |
|---|---|
| ECA | Ecologically Critical Area |
| ECA | Export Credit Agency |
| ECD | Early Childhood Education |
| FFW | Food for Work |
| ERD | Economic Resources Division |
| ESP | Essential Services Package |
| ETP | Effluent Treatment Plant |
| FD | Forest Department |
| FDI | Foreign Direct Investment |
| FSRUs | Floating Storage Regasification Units |
| FY | Financial Year |
| FYP | Five Year Plan |
| GATS | Global Adult Tobacco Survey |
| GDP | Gross Domestic Product |
| GED | General Economics Division |
| GER | Gross Enrollment Rate |
| GCF | Green Climate Fund |
| GoB | Government of Bangladesh |
| GPI | Gender Parity Index |
| GNI | Gross National Income |
| GPEDC | Global Partnership for Effective Development Cooperation |
| HCWMP | Health Care Waste Management Plan |
| HEQEP | Higher Education Quality Enhancement project |
| HICs | High-Income Countries |
| HIES | Household Income and Expenditure Survey |
| HIV/AIDS | Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome |
| HLPF | High Level Political Forum |
| HLPW | High Level Panel on Water |
| HNPSP | Health, Nutrition and Population Sector Programme |
| HPNSDP | Health, Population and Nutrition Sector Development Programme |
| HRD | Human Resources Development |
| IHR | International Health Regulations |
| ICAI | Independent Commission for Aid Impact |
| ILO | International Labour Organization |
| IMCI | Integrated Management of Childhood Illness |
| INDC | Intended Nationally Determined Contribution |
| INFED | Integrated Non-Farm Education Programme |
| IOCs | International Oil Companies |
| IWRM | Integrated Water Resources Management |
| JMP | Joint Monitoring Programme |

| | |
|---|---|
| LDCs | Least Developed Countries |
| LGD | Local Government Division |
| LGED | Local Government Engineering Department |
| LMICs | Low and Middle-income Countries |
| MLD | Million Litres per Day |
| MCP | Micro Credit Programmes |
| MCP | Malaria Control Programme |
| MDGs | Millennium Development Goals |
| MDR-TB | Multi Drug Resistance Tuberculosis |
| MoC | Ministry of Commerce |
| MFN | Most Favoured Nation |
| MICS | Multiple Indicator Cluster Survey |
| MoDMR | Ministry of Disaster Management and Relief |
| MoHA | Ministry of Home Affairs |
| MoWCA | Ministry of Women and Children Affairs |
| MoWR | Ministry of Water Resources |
| MPA | Marine Protected Areas |
| NAP | National Adaptation Plan |
| NCBs | Non-Communicable Diseases |
| NGOs | Non-Governmental Organizations |
| NHD | National Household Data Base |
| NP | National Park |
| NPDC | National Policy on Development Cooperation |
| NSDS | National Sustainable Development Strategy |
| NSSS | National Social Security Strategy |
| NTPA | National Tripartite Plan of Action |
| ODA | Official Development Assistance |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development |
| OIC | Organization of Islamic Countries |
| O&M | Operation and Maintenance |
| PA | Protected Areas |
| PEDP | Primary Education Development Project |
| PHC | Public Health Care |
| PKSF | Palli Karma Sahayak Foundation |
| PMED | Primary and Mass Education Division |
| PMO | Prime Minister's Office |
| POs | Partner Organisations |
| POE | Panel of Experts |
| PPP | Public Private Partnership |
| PPP | Purchasing Power Parity |

| | |
|---|---|
| PSD | Public Security Division |
| PSMP | Power Sector Master Plan |
| RCS | Road Condition Survey |
| RHD | Roads and Highways Department |
| RLI | Red List Index |
| RMG | Ready Made Garments |
| RTIs | Road Traffic Injuries |
| SD | Standard Deviation |
| SDGs | Sustainable Development Goals |
| SEDP | Secondary Education Development Program |
| SIR | SDGs Implementation Review |
| SLIP | School Learning Improvement Plan |
| SPS | Sewerage Pump Station |
| SSD | Security Services Division |
| SSNPs | Social Safety Net Programmes |
| STP | Sewage Treatment Plants |
| TVET | Technical and Vocational Education and Training |
| UHC | Universal Health Care |
| ULGIs | Urban Local Government Institutions |
| UNDP | United Nations Development Programme |
| UNICEF | United Nations Children's Fund |
| UNSGAB | United Nations Secretary-General's Advisory Board on Water and Sanitation |
| VAT | Value Added Tax |
| VNR | Voluntary National Review |
| VAW | Violence against Women |
| VWB | Vulnerable Women Benefit |
| WASA | Water Supply and Sewerage Authority |
| WARPO | Water Resources Planning Organization |
| WASH | Water Sanitation and Hygiene |
| WFHI | Women Friendly Hospital Initiative |
| WB | World Bank |
| WDI | World Development Indicators |
| WHO | World Health Organization |
| WTO FCTC | WTO Framework Convention on Tobacco Control |

# সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরিতে একটি পদ্ধতিগত নির্মাণ কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এসডিজি সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝতে পারা। এই কাজটি করতে গিয়ে বিভিন্ন সংগঠন যথা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে এসডিজির সূচকগুলোর ওপর তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, তথ্য-ঘাটতি দূরীকরণে আন্তর্জাতিক উৎস যথা বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ এবং ওইসিডির সাহায্যও গ্রহণ করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট বা মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রদূত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি আজ আর অজানা নয়। দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা আনয়ন, নবজাতক ও পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার এবং মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, টীকা সম্প্রসারণে উন্নতি, সংক্রামক রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে। অনেক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করা গেছে; অন্যগুলো বেঁধে দেয়া ২০১৫ সময়সীমার মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বস্তুত চিত্তাকর্ষক এই কৃতিত্বের সূত্র ধরে বৈশ্বিক পর্যায়ে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কার্যকর অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের পেশকৃত প্রস্তাব ও ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রস্তাবের মধ্যে বিস্ময়সূচক মিল ছিল এবং বিশেষত, ১১টি অভীষ্টের মধ্যে ৯টি অভীষ্ট পুরোপুরিভাবে মিলে যায়। অন্যান্য অভীষ্টের মধ্যে সরাসরি সাদৃশ্য না থাকলেও ওইগুলো বাংলাদেশের প্রস্তাবে বিভিন্ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনিভাবে, আগামী দেড় দশকের মধ্যে বিশ্বকে যে সকল টেকসই উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে তা বাংলাদেশের অনুভূতি ও ভাবনায় জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়।

অনেকটা কাকতালীয়ভাবে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০) ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) অভিযাত্রা একই সময় ঘটে। এর ফলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে এসডিজি বাস্তবায়নে শুরুতেই বাংলাদেশ প্রথম সারিতে অবস্থান নেবার সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে যায়। বস্তুত ১৭ টি অভীষ্টের সব কটিই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার মধ্যে বিষয়বস্তুগতভাবে ১৪টি (৮২%) অভীষ্ট সম্পূর্ণভাবে এবং তিনটি (১৪, ১৬ এবং ১৭ নং অভীষ্ট) আংশিকভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয় । এতে সুবিধা হলো এই যে, পরিকল্পনার লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা মানে দাঁড়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কৃতিত্ব বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি পূরণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাবার সম্ভাবনা উজ্জলতর হলো।

এসডিজি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যারা প্রকল্প/প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কঠিন কাজটি অনুধাবন এবং জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত তথ্য উপাত্তের অভাব পূরণ করার চ্যালেঞ্জিং কাজটি সফলতার সাথে সম্পন্নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসডিজি বাস্তবায়নে এবং পর্যালোচনার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেন: যার মাধ্যমে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে তিনি কতোটা আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাই হোক, এই কমিটিতে মোট ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে অর্ন্তভুক্ত সচিবগণ এসডিজি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে থাকেন। সবকিছু যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসডিজির বাস্তবায়নে একটি উচ্চপর্যায়ের পদ তথা এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক নিয়োগ করা হয় যিনি এই কমিটির নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার সমাজের বিভিন্ন অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে "সমগ্র সমাজ" (Whole of Society) পদ্ধতিতে এগোবার প্রয়াস নেয় এবং সেই লক্ষ্য সামনে রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে এসডিজি বাস্তবায়ন, কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা চিহ্নিত করতে গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলও তৈরি করতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যে সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ জড়িত থাকার কথা তাদের ভূমিকা ভাগ করে বন্টন করা, এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/ডিভিশনের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা তৈরি, তথ্য-ঘাটতি পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক, অর্থায়ন ও শিক্ষা খাত কৌশল ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এভাবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয়ে প্রাথমিক বুদ্ধিবৃত্তিক কাজটির সিংহভাগ আগেই সেরে ফেলা হয়েছিল বিধায় বাকী দায়িত্ব ছিল শুধু প্রথম দু'বছরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের (২০১৬-২০১৭) অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

আশা করা যায় যে, বর্তমান অনুশীলনটি অনেক বিষয় সামনে নিয়ে আসবে। প্রথমত, তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ কতটুকু এগিয়ে বা পিছিয়ে আছে তার ওপর একটা আলোকপাত নিঃসন্দেহে ভবিষ্যত পদক্ষেপের বাতিঘর হিসাবে কাজ করবে। দ্বিতীয়ত, এই কাজটি করার ফলে তথ্যের ঘাটতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে এবং তার ভিত্তিতে করণীয় ঠিক করা সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য, এটা করা না হলে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনীতির সংখ্যাসূচক পরিমাপ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, প্রয়োজন সাপেক্ষে, এই অনুশীলনের মাধ্যমে চলমান নীতি ও কৌশল পূর্ণবিবেচনা করে লক্ষ্য পূরণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবার অবকাশ থাকবে।

## এসডিজি ১: দারিদ্র্য বিলোপ

চলমান দারিদ্র্য ডিসকোর্সে জাতীয় দারিদ্র্য রেখার কাঙ্খিত দৈনিক <১.৯০ ডলার আয়সম্পন্ন মানুষকে চরম দরিদ্র বলে বিবেচনা করা হয়। ***চরম দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে রয়েছে (অন ট্র্যাক)***। তেমনি ঈপ্সিত পর্যায়ে আছে সামাজিক সুরক্ষার আওতা ও বিস্তৃতির অগ্রগতি, এবং সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রভৃতি সেবা খাতের নিমিত্ত ব্যয়। উচ্চ দারিদ্র্যরেখার ভিত্তিতে হিসাব করা দারিদ্র্যের প্রকোপ হ্রাসের অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে হয়তো নেই তবে, যেমনটি দেখা যাচ্ছে, আশা করা যায় যে প্রত্যাশিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে, ২০২০ সালের মাইলফলকে পৌঁছাতে কষ্ট হবার কথা নয়। তবে শর্ত থাকে যে, বর্ধনশীল আয় বৈষম্য দারিদ্র্য হ্রাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবকে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত করবে না। মোট কথা সার্বিক দারিদ্র্য চিত্রে মাথাগণনা সূচকে দারিদ্র্যের প্রকোপ ২০১৬ সালে ছিল ২৪.৩ শতাংশ এর বিপরীতে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে হিসাবকৃত দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৩.১ ও ২১.৮ শতাংশ।

দারিদ্র্য বহুমাত্রিক বিধায় ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে আছে ত্বরান্বিত, অন্তর্ভুক্তিমুলক এবং অভিঘাতসহনীয় প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি ও কার্যকারিতা বাড়ানো, জেন্ডার সমতা বিধান, ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা, ব্যপ্তি ও বহুমুখীতা প্রদান, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আনায়ন এবং স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতিক পরিবেশ সৃষ্টি। এরপরও এসডিজি ১ বাস্তবায়নে কিছু প্রধান চ্যালেঞ্জ রয়ে যায় যেমন: সম্পদ বৃদ্ধি বিশেষত বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহ, এনএসএসএস বাস্তবায়ন, বিবিএস-এর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কিংবা গভীরতর দারিদ্র্যে পিছলে পড়া বন্ধ করা ইত্যাদি। আশার কথা, এতো প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বাংলাদেশ কিন্তু থেমে নেই – এসডিজি ১ বাস্তবায়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, মানবপুষ্টি উন্নয়ন, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকরণ এবং বিভিন্ন অভিঘাত হ্রাস করার মাধ্যমে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইটা অব্যাহত রয়েছে।

## এসডিজি ২: ক্ষুধা মুক্তি

***২০১৪ সালে খর্বকায় মানুষের অনুপাত ছিল ৩৬.১ শতাংশ। বর্তমানে যে হারে খর্বকায় শিশুর অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে তাতে লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ আছে বলে ধরে নেয়া যায়। একইভাবে কৃশতা বা ওয়েসটিং হ্রাসের অগ্রগতির হার ১৪.৩ শতাংশ এবং তা যথাযথ বলে ধরে নেয়া চলে।*** বাংলাদেশের কৃষিমুখীতা সূচকের মান হচ্ছে ০.৫ যা কিনা ভারত (০.৪), শ্রীলংকা (০.৪) এবং নেপালের (০.২) তুলনায় ভাল অবস্থানে রয়েছে । কৃষি খাতে মোট সরকারি সম্পদ প্রবাহ অপেক্ষাকৃত কম থাকার প্রধান কারণ সময়ের বিবর্তনে উন্নয়ন অংশীদারদের সূচিত সাহায্য বন্টণের ও নীতিমালায় পরিবর্তন। আর তাই এসডিজির বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রবাহকে কৃষি ব্যবস্থা রূপান্তরের কাজে লাগানোর প্রয়োজন রয়েছে।

ইতোমধ্যে জনগণের খাদ্য নিরপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার-সূচিত ইতিবাচক নীতি ও কর্মসূচি ছাড়াও ক্ষুধা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে পুষ্টি সমৃদ্ধ বা ফরটিফাইড চালের প্রচলন, গর্ভবতী, স্তন্যদানকারী মায়েদের ও কিশোরীদের মধ্যে আয়রণ-ফলিক সাপ্লিমেন্ট বিতরণ, শিশুদের জন্য ভিটামিন-এ বিতরণ, কৃমিরোধে ব্যবস্থা নেয়া, আয়োডাইজড লবণ, শিশুদের মায়ের দুধ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে মায়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি এবং ওয়াশ (WASH) কর্মসূচির আওতায় গুণগত পানি, পয়:নিস্কাশন ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, ক্ষুধার প্রকোপ শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনার সাথে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই পরিকল্পনায় বিবেচনা করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন-প্রসূত ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, অবহেলিত অঞ্চল ও গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ নামিয়ে আনা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধি ও নগরায়ন সমস্যা মোকাবেলা করা ইত্যাদি। সরকার স্পষ্টতই মনে করে যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২ অর্জনে এ সমস্ত পদক্ষেপ হবে অত্যন্ত জরুরি।

## এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ ও কল্যাণ

এসভিআরএস ২০১৭ অনুযায়ী, শিশু সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্জন করা গেছে; কোনটি আবার মাইলফলক-মাত্রা অতিক্রম করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ৫ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুহার এখন প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩১ এবং নবজাতক মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৭। নারী বিষয়ক বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা মাইলফলক ছুঁইছুঁই করছে যেমন, শিশু জন্মকালে সেবা প্রদানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকার সংখ্যা, আধুনিক জন্মনিরোধক ব্যবহারকারী বিবাহিত মহিলাদের অনুপাত (৫৯.২%) এবং কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের হার হ্রাস (১৫-১৯ বছর বয়সী) ২০২০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রায় দোরগোড়ায়। এরমধ্যে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় কতজন স্বাস্থ্যকর্মী থাকতে হবে, অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবার ঘনত্ব, সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শিশু জন্মের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ১৯৯৪ সালের ৯.৫ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে (বিডিএইচএস ২০১৭)। অনুমান করা হয়েছে যে ২০২০ সাল নাগাদ জন্মকালীন সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত হবে ৬৫ শতাংশ এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে, অগ্রগতি সন্তোষজনক (অন ট্র্যাক)।

*এমনিতে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস প্রকোপ ও ব্যাপকতা কম। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের যে ৩০টি দেশে যক্ষা প্রকোপ বেশি তার অন্যতম একটি হলো বাংলাদেশ। তাছাড়া, বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে অন্যতম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দেশ এবং পৃথিবীর প্রথম ১০টি ব্যাপক তামাক ব্যবহারকারী অন্যতম একটি দেশ।* সুতরাং, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংকট থেকে স্বস্তিকর পর্যায়ে যেতে এখনও যে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই ।

১৯৮৮ সাল থেকে সরকার স্বাস্থ্যখাতের জন্য খাত-বিস্তৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে ২০১৭-২২ সময়কাল বিস্তৃত, চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি – Health, Poplulation and Nutrition Sector Programme (HPNSP)। এ কর্মসূচির আওতায় আছে তিনটি অংশ যেমন, সংশ্লিষ্ট খাতের শাসন ও দায়িত্বসমূহ, শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং গুণগত স্বাস্থ্যসেবা। এই অংশগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে তেমনি এসডিজির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হবে।

স্বাস্থ্যখাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো কঠিন এবং বহুবিধ। এর মধ্যে আছে স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং সেবার গুণগত মান ও সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবায় সমতা নিশ্চিতকরণ। অন্যদিকে বর্ধমান অ-সংক্রামণ ব্যাধির বোঝা, আঘাতের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রকোপ, ডুবে মারা যাওয়া, বয়সজনিত ব্যাধি, সংক্রামক রোগের বিস্তার, স্বাস্থ্যের ওপর ভূ-জলবায়ু দুর্যোগজনিত প্রভাব, আর্সেনিক সমস্যা ও ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার মতো রোগের পুনরাবির্ভাব।

## এসডিজি ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাসম্পন্ন গুণগত শিক্ষা

*গত এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার সমতাসূচকের (জিপিআই) মান ছিল ১-এর বেশি।* বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থাৎ টারশিয়ারি শিক্ষায় জিপিআই ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ ০.৭৩৭ এবং তার পর থেকে কিছুটা নিম্নগামী যেমন,- ০.৭০১ (২০১৬) এবং ০.৭১ (২০১৭)। টারশিয়ারিতে জিপিআই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা সুসংহত করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকদের মধ্যে ডিপিএড/সি ইন এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ৮০ শতাংশের ওপর পৌঁছেছে। সবশেষে, ২০১৩ থেকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রতিবছর মোট অন্তর্ভুক্তি অনুপাত, একটু ধীর গতিতে হলেও, প্রতিবছর ১.৪৫ শতাংশ হারে বেড়েছে।

শিক্ষার পরিমাণ ও গুনগত মান উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে উন্নত মাত্রা অর্জনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শিক্ষাখাতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। এসবের মূল লক্ষ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস করা, শিক্ষার মান এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নীতকরণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং নবধারায় জ্ঞান ও দক্ষতার সদ্ব্যবহার করা। তবে শিক্ষাখাতে সরকারের নেয়া প্রচেষ্টার সফল অগ্রগতি সত্ত্বেও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো উপেক্ষা করবার মতো নয়। এর মধ্যে আছে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা, প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রদানে উৎকর্ষতা, বয়স্ক স্বাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা। এই খাতে ভবিষ্যত নীতিমালা ও কর্মসূচির দিকে নির্দিষ্ট মনযোগ দিতে পারলে অতীত অর্জনকে যেমন সুসংহত করা যাবে তেমনি ভবিষ্যত সমস্যাগুলোকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলার পথ সুগম হবে।

## এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশে ১৫ বছর বা ততোধিক বয়সী নারী ও বালিকা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এই নির্যাতনের সাথে একদিকে যেমন জড়িত আছে তাদের ঘনিষ্টজন, বিশেষত জীবনসঙ্গী, অন্যদিকে তেমনি জড়িত বহিরাগত নির্যাতনকারী। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, *২০১৭ সালে ২০-২৪ বছর বয়স্ক নারীদের মধ্যে ১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিয়ে অথবা যুগলবন্দী হয় ১০.৭০ শতাংশ এবং ১৮ বছর পূর্বে বিয়ের পিঁড়িতে বসে ৪৭ শতাংশ। বর্তমান সময়ে অবশ্য এ ধারা কিছুটা নিম্নগামী হয়েছে।* বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের মতো সমাজে পুরুষ মানুষের তুলনায় নারীর পরিবারে অনুপার্জিত অভ্যন্তরীণ কাজ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সিংহভাগ বহন করে এবং গবেষণায় পাওয়া যায়, এ সমস্ত কাজে একজন মহিলা দৈনিক মোট সময়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশের মতো সময় ব্যয় করে থাকে। সংসদে নারী সাংসদের অনুপাত ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং ২০১৭ সালে সংসদে নারীদের অনুপাত দাঁড়ায় ২০.৫৭ শতাংশ।

নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নে বাংলাদেশের কৃতিত্ব দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক ভাল। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, এক্ষেত্রে বৈশ্বিক ব্যাংকিংয়ে ০.৭২১ স্কোরসহ বাংলাদেশের অবস্থান ৪৮তম এবং তা সম্ভবত প্রমাণ করে যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের অবস্থান প্রশংসনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

তাই বলে আত্মতুষ্টির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিকল্পে সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্ঠা থেমে গেছে তেমনটি ভাববার অবকাশ নেই। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের নেয়া অব্যাহত প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে আছে বৈশ্বিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা, নীতি ও আইনগত কাঠামো প্রদান করা, নারীদের মানব সক্ষমতা উন্নীতকরণ, আর্থিক সুবিধাদি বাড়ানো, নারীদের জন্য প্রগতি-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি। তবে এতকিছুর পরও কিন্তু জেন্ডারসমতা অর্জনে চ্যালেঞ্জগুলো থেকেই যাচ্ছে যেমন: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল, বাল্যবিবাহ রোধ এবং প্রযুক্তি প্রসার ও উন্নয়নে জেন্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## এসডিজি ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সর্বজনস্বীকৃত কৃতিত্বের কথা আগেও বলা হয়েছে । এই স্বীকৃতির সূত্র ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এসডিজি ৬-বাস্তবায়নের জন্য পানি সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের সদস্য করা হয়েছে (High Level Panel on Water)। এই সদস্যপদের কারণে বাংলাদেশে এসডিজি ৬-কেন্দ্রিক অনেক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। ***বাংলাদেশে বর্তমানে ৮৭ শতাংশ মানুষের নিরাপদ পানি ব্যবহার করার সুযোগ আছে (লক্ষ্যমাত্রা ৬.১) এবং ৬১ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পয়ঃনিস্কাশনের সুবিধাপ্রাপ্ত (লক্ষমাত্রা ৬.২)***। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য দুটো প্রধান উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় সাথে লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩ (পানির গুনগত মান উন্নয়ন) ও লক্ষ্যমাত্র ৬.৬ (পানির ইকোসিসটেম সুরক্ষা) সম্পর্কিত আছে – যেমন: বুড়িগঙ্গা নদীর পানির গুণগত মান উন্নয়নে হাজারিবাগ ট্যানারী সাভারে স্থানান্তর এবং হালদা নদীর ইকোসিসটেম সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা; যার ফলশ্রুতিতে অধিক পরিমাণে মাছের ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

## এসডিজি ৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

উৎসাহব্যাঞ্জক সংবাদ এই যে বাংলাদেশ খুব দ্রুত' এমনকি ২০২৫ সালের নির্ধারিত সময়ের বেশ পূর্বেই, শতভাগ খানা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার পথে এগুচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ***২০১৭ সালে বিদ্যুৎ সংযোগে ছিল ৮৫.৩ শতাংশ খানা যা ২০১৮ সালে উন্নীত হয় ৯১ শতাংশে।*** তবে, জ্বালানির অন্যান্য নির্দেশকে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে আছে। একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ধীরগতিতে বৃদ্ধি অন্যদিকে অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মোট জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য জ্বালানির হিস্যা হ্রাস পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশের সকল খানায় নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহের লক্ষ্যে সরকারের চলমান প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে অন্য একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ অর্জন করা সহজতর হতে পারে। তবে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে অর্থায়ন, দাম নির্ধারণ এবং ভর্তুকী, জ্বালানি মিশ্রণ, গ্যাস আহরণ এবং জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়ন।

## এসডিজি ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

গত দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে বাংলাদেশ। ***উর্ধ্বমুখী পরিবর্তনের পথ ধরে গড়পড়তা ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে সম্প্রতি বছরগুলোতে (২০১৫-২০১৮) প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ উপর পৌঁছায়*** এবং এর সাথে নিম্নগামী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যুক্ত হয়ে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। দেশটি এখন ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জনের প্রায় দ্বারপ্রান্তে (প্রায় অন ট্র্যাক)। এটা উৎসাহজনক যে, কর্মজীবি মানুষের মাথাপিছু জিডিপি হিসাবে ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষমাত্রা ২০১৭ সালেই অর্জিত হয়েছে। অপরদিকে, প্রায় দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের হিসাবকৃত বেকারত্বের হার প্রায় ৪ শতাংশের কাছাকছি রয়েছে এবং যুক্তিযুক্তভাবে অনুমান করা যায় যে বেকারত্বের হার অদূর ভবিষ্যতেও এই মাত্রায় থাকবে।

২০১৩ সালের পর শিশুশ্রমের উপর তেমন কোনো তথ্য নেই যদিও প্রত্যাশা করা যায় যে ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধির হার, চরম দারিদ্র্য নির্মূল এবং একই সাথে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে শিশুশ্রম জনিত অবস্থানের প্রভূত উন্নতি ঘটবে। অন্য একটা উন্নতির দিক হচ্ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি যেখানে গত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অধিক সংখ্যক খানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সেবার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

শ্রমবাজারের কিছু কিছু দিক বর্তমানে প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। যদি ১৫-২৯ বছর বয়স্ক নাগরিকের উঁচু হারে বেকারত্ব বিলোপ করে ২০২০ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে হয়, তা হলে ক্রমবর্ধিষ্ণু অপ্রাতিষ্ঠানিকতার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হবে কারণ, এই ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিকতা শোভনীয় কাজ সৃষ্টিতে সরকারি উদ্যোগকে দুর্বল করে দেয়। যাই হোক, ভিত্তি বছরে যুব সম্প্রদায়ের ২৯ শতাংশ কোন প্রকার শিক্ষায় কিংবা কর্মসংস্থানে ছিল না (এনএনইটি), যা সম্প্রতি প্রায় ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং ২০১৬/১৭ সালে যুব পুরুষদের ছেলেদের বেলায় এই অনুপাত ১০ শতাংশ থাকলেও নারীদের বেলায় তা ৫০ শতাংশ। আগের বছরের তুলনায় উভয় হার বেশি বিধায় তারা কাজের বাইরে থাকছে এবং সেটাই সম্ভবত উদ্বেগের কারণ।

যাই হোক, এসডিজি ৮ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ: শ্রমবাজারে ক্রমবর্ধিষ্ণু অপ্রাতিষ্ঠানিকতা, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি বেকারত্ব, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার গরমিল, শ্রমবাজারে নারীদের কম অংশগ্রহণ, বৈদেশিক সম্পদ বিশেষত বৈদেশিক বিনিয়োগের নিম্ন প্রবাহ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, শিশুশ্রম এবং শ্রমিকদের অভিবাসন সম্পর্কিত সমস্যা প্রভৃতি। তবে, প্রবৃদ্ধি বর্ধন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারের নেয়া নীতিমালা ও কর্মসূচি আরও বেগবান করার জন্য অন্যান্য নীতিমালা ও কর্মসূচির কথাও চিন্তা করা হচ্ছে যেমন: অর্থনীতি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি প্রসারণ, শিক্ষা পদ্ধতি ও শ্রমবাজারের মধ্যকার যথাযথ সমন্বয়, নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং বৈদেশিক সম্পদ আহরণ প্রভৃতি।

## এসডিজি ৯: অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ

***প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে রাস্তার ঘনত্ব ২০১০ সালে ১৪.৪১ কি.মি. থেকে ২০১৭ সালে ১৪.৬১ কি.মি. বৃদ্ধি পেয়েছে।*** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নতুন নতুন লেন নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যমান রাস্তাগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি যথাযথ রাস্তা অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং এর মূল্য সংযোজনের অংশও বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে ২০২০ সালের মাইলফলক ২০১৭ সালে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। তেমনি মাথাপিছু ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে ২০২০ নাগাদ এর লক্ষ্যমাত্রা এখনও স্থির করার অপেক্ষায়। ২০১৩ পর্যন্ত মোট কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিদ্যমান কর্মসংস্থানের হিস্যা বৃদ্ধি পেলেও গত দু'বছরে সেটা স্থিতাবস্থায় রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। অবশ্য, কারও কারও মতে, এটা একধরনের দীর্ঘকালীন প্রবণতা যেখানে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থানের নেতিবাচক সম্পর্ক বিরাজ করে। তবে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

একথা ঠিক যে, বার্ষিক উঠা-নামা সত্ত্বেও অবকাঠামোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ***মোট জনসংখ্যার প্রায় শতভাগ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসে গেছে (২জি প্রযুক্তি) আর ৩ জি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মাইলফলক ২০১৭ সালেই অর্জিত হয়েছে।***

আসলে, এসডিজি ৯-এর জন্য নেয়া সরকারি প্রচেষ্ঠার সফলতা একদিকে যেমন নির্ভর করে সবধরনের যোগাযোগ মাধ্যম প্রসারের এবং আইসিটির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে, তেমনি সফলতার পেছনে থাকতে হবে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে নীতি সংক্রান্ত সমর্থন এবং পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারীত্ব বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

অবশ্য এসডিজি ৯ বাস্তবায়নে বাধা-বিপত্তি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা দরকার যেমন: অর্থায়ন সমস্যা, বাস্তবায়নকারী সংস্থার সীমিত সক্ষমতা, জমি অধিগ্রহণে জটিলতা ইত্যাদি। এত কিছুর পরও কিন্তু ক্রমাবনতিশীল জলবায়ুজনিত প্রভাবের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণে ব্যাপৃত রয়েছে।

## এসডিজি ১০: অসমতা হ্রাস

শুরু থেকেই সরকার একটা দরিদ্র-বান্ধব উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে আসছে যার মূল উপাদান একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ অন্যদিকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস। যদিও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং তার সাথে প্রশংসনীয়ভাবে দারিদ্র্য হ্রাসও ঘটেছে, কিন্তু এগুলো ক্রমাবনতিশীল আয় বিন্যাসকে উল্টাতে সমর্থ হয় নি। অতি ***সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ভোগ বৈষম্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পর্যায়ে আছে (এইচআইইএস ২০১৬)।***

অবশ্য, আন্ত:দেশীয় আয় বৈষম্যের হ্রাসের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার "প্রবাসীদের কল্যাণ ও ওভারসীজ এম্পলয়মেন্ট পলিসি ২০১৬" জানুয়ারি ২০১৬-এ অনুমোদন করেছে যার মূল লক্ষ্য নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করা এবং অভিবাসী ও তার পরিবারের নিরাপত্তা বিধান। দোহা রাউন্ডের সুপারিশের আলোকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে শূন্য শুল্কে আমদানীকৃত পণ্যের ট্যারিফ লাইনের অনুপাত একই রয়ে গেছে। এসডিজি সময়কালেও সরকারি উন্নয়ন সাহায্যের বর্ধিষ্ণু প্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে; বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবণতা উর্ধ্বমুখী হয়ে ২০১৭ সালে দাঁড়ায় ২০৪ বিলিয়ন ডলারের কিছু উপরে।

এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ মনে করে যে, দ্রুত অগ্রসরমান অসমতা দারিদ্র্য হ্রাস ও আপেক্ষিক বঞ্চনার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে যা বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এর আংশিক কারণ প্রগতিশীল করে আধুনিক ব্যবস্থার আওতায় সবধরনের আয় অন্তর্ভুক্তির অসামর্থ্যতা এবং আংশিক কারণ সরকারের মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করার ব্যর্থতা। তবে আশার কথা যে, অসমতা হ্রাসে যে সমস্ত নীতি ও কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আছে আয় ও সম্পদের অন্যায্য হস্তান্তর বন্ধ, প্রশাসনিক এবং সরকারি সংগ্রহে ও ব্যয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ, বেআইনি ভূমি দখল এবং গণসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম রোধে অধিকতর কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

## এসডিজি ১১: টেকসই নগর এবং জনপদ

নগরায়নে বাংলাদেশের অবস্থান এখনও নিচু স্তরে। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০১৬ সালে মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ শহরে বাস করতো। তবে, শহুরে জনসংখ্যার মোট সংখ্যা ৫৬.২৮ মিলিয়ন যে বেশ বড় একটা সংখ্যা তা বোধ হয় ব্যাখ্যা দাবি করে না। এই দেশে অঞ্চলভেদে অনুরুপভাবে নগরায়নের বিস্তৃতিতে বেশ তারতম্য আছে- যেমন, সাতক্ষীরা জেলার নগরায়নের তার ৭.২ শতাংশ যেখানে ঢাকা জেলার ৯০ শতাংশের ওপর। বাংলাদেশে প্রায় ৫৭০টি শহর-কেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে একমাত্র ঢাকা মেগা সিটি হিসাবে পরিচিত আর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেটকে বলা হয় মেট্রোপলিটন অঞ্চল। অন্যদিকে, ২৫টি শহরের প্রত্যেকটির জনসংখ্যা এক লাখের ওপর হলেও বাকীগুলো ছোট ছোট টাউন বা শহর।

তবে ছোট বড়, সব শহরের প্রধান সমস্যা একটাই আর তা হলো গৃহায়ণ সমস্যা। ২০১০ সালের এক হিসাব মতে, গৃহায়ণ ঘাটতির পরিমাণ মোট ৪.৬ মিলিয়ন ইউনিট। আরও দেখা যায় যে, ***শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৪৪ শতাংশ একেবারে ক্ষণস্থায়ী কাঠামোতে বাস করে; ২৯ শতাংশ বাস করে আধা-স্থায়ী কাঠামোতে***। সুতরাং, বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে শহুরে জনসংখ্যার সিংহভাগের বাসস্থান অত্যন্ত নিম্নমানের গৃহায়ণ কাঠামোতে। যদিও, এইচআইইএস সমীক্ষা ২০১৬ মতে, সম্প্রতি বছরগুলোতে গৃহায়ণের গুণগত মানের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি ঘটেছে। এতদসত্ত্বেও বস্তিতে থাকা খানাগুলোর ৯৬ শতাংশ পাকা নয় এমন নিম্নমানের ঘরে বাস করে।

শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ব্যাপক মাত্রায় পরিবহন সেবার চাহিদা বৃদ্ধি ঘটছে এবং যান্ত্রিক কিংবা অযান্ত্রিক যানবাহনের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। তীব্র যানজটের কারণে শুধু ঢাকা শহরেই প্রতিদিন ৩.২ মিলিয়ন কাজ-ঘন্টা হারিয়ে যায় বলে ধারণা করা হয় (বিশ্ব ব্যাংক ২০১৮)।

শুধু পরিবহন সমস্যা নয়, নগরায়নের কারণে আরও অনেক সমস্যার উদ্ভব উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইচআইইএস ২০১৬ বলছে, শহুরে খানার মাত্র ৩৭.২৮% পাইপড বা নলের পানির সুযোগ প্রাপ্ত এবং শহর থেকে শহরে এই সুযোগ প্রাপ্তিতে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পাইপড পানির সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপরে রয়েছে ঢাকা শহর যেখানে ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যুয়ারেজ অথরিটি তার সেবা এলাকায় প্রয়োজনের ৯০ শতাংশ প্রয়োজন মেটায়। অন্যদিকে, ঢাকা ব্যতীত প্রায় সকল শহর কেন্দ্রে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই এবং একটা বিরাট সংখ্যক খানার সেপটিক ট্যাংকের সাথে সংযোগ নেই (আহমদ ২০১৭)। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, সময়ের বিবর্তনে পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি ঘটছে যেমন: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ১৯৮১ সালের ৩২.৪ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ৭৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস, ২০১৭)।

ঢাকা শহরে প্রতিদিন যে পরিমাণ বর্জ্য (Solid waste) নির্গত হয় তার মাত্র ৬০ শতাংশ সংগ্রহ করে সিটি করপোরেশন। অবশ্য সিলেট ও চট্টগ্রামে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল যেখানে যথাক্রমে, ৭৬ ও ৭০ শতাংশ বর্জ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের অনেক শহর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে নদী ভাংগন, সাইক্লোন, খরা, টর্নেডো, শৈত্য প্রবাহ, বন্যা, হঠাৎ বন্যা এবং ভূমিকম্প। এর সাথে যুক্ত আছে মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ যেমন আগুন এবং দালান-ধ্বস। ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রসূত দুর্যোগ দমনে বাংলাদেশ শুধু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনই করেনি, উপকূলীয় অঞ্চলে জীবন রক্ষাকল্পে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ঘটিয়ে দেশটি আজ উপকূলীয় অভিঘাতসহনীয় ব্যবস্থাপনার বৈশ্বিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। তবে একথাও ঠিক যে, এত প্রচেষ্টার পরও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের জনসংখ্যার আক্রমত্যা বেড়ে চলেছে। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভূমিকম্প দুর্যোগ ঝুঁকি সূচক ব্যবহার করে বলা হচ্ছে বৈশ্বিক পর্যায়ে, বিশেষত ভূমিকম্পের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের ঢাকা শহর সবচেয়ে অরক্ষিত শহর।

টেকসই শহর ও জনপদ সৃষ্টি করা শুধু সরকারের একার কাজ নয়। ইদানিং এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছে শহুরে সেবা প্রদানে সক্ষম বিভিন্ন অংশীজন– শহর গৃহায়ন, বস্তি আবাসন, শহর পরিবহন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শহরে দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি হ্রাস, বায়ু দূষণ এবং নগর নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ। আবার, যে সমস্ত অংশীজনদের কথা বলা হলো তার মধ্যে আছে কিছু চিহ্নিত প্রতিষ্ঠান যেমন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউএলজিআইএস) এবং তাদের সংস্থাগুলো যথা ওয়াসা, উন্নয়ন সহযোগী (ডিপি) এবং সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও)।

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে চাই যে, নগর ও শহরগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করুক, তাহলে বেশ কটা চ্যালেঞ্জের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। এদের কয়েকটা হচ্ছে পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং সামর্থ্যের মধ্যে আবাসন নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই শহর পরিবহনের ব্যবস্থা করা যা নাগরিকদের সামর্থ্যের মধ্যে এবং হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে। তাছাড়া, অভিঘাতসহনীয় শহরের ব্যবস্থা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার চ্যালেঞ্জের কথাতো আগেই বলা হয়েছে।

## এসডিজি ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উন্নয়ন

বিশ্বব্যাপী, বিশেষত বাংলাদেশের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশে, খাদ্য ক্ষতি ও অপচয় আজ গুরুতর একটা উদ্বেগের বিষয় হিসাবে উদীয়মান। এই খাদ্যক্ষতি ও অপচয়ের কারণে বহু মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়। এর পেছনে ক্রিয়াশীল কারণগুলোর অন্যতম হলো ফসল কাটা, গুদামজাত, প্যাকিং, পরিবহন, অবকাঠামো অথবা বাজার/মূল্যজনিত প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রিভূত সমস্যাগুলো। তার সাথে যুক্ত আছে জলবায়ুর পরিবর্তন। অনুমান করা হয় যে, ফসল কাটার পরবর্তী ধাপগুলোতে শস্য উৎপাদনশীলতার ১০ শতাংশ হারিয়ে যায়।

মানুষের ভোগের নিমিত্ত তৈরি খাবার যদি ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে নষ্ট হয় কিংবা বাতিল করা হয়, সেটাকে বলে অপচয়। বলা হয়ে থাকে, মোট সংগৃহীত খাদ্যের প্রায় ৫.৫ শতাংশ যে অপচয় হয় তার মধ্যে ৩ শতাংশ অপচয় হয় সংগ্রহ ও প্রস্তুতিপর্বে, ১.৪ শতাংশ যোগানের সময় এবং ১.১ শতাংশ খাবারের থালা থেকে।

শহরাঞ্চলে বর্জ্য (Solid waste) উৎপাদিত হয় বিভিন্ন উৎস থেকে যথা গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাস্তা ঝাড়ু দেয়া এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি থেকে। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০৫ সালে সকল শহর কেন্দ্রে প্রতিদিন বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩,৩৩২.৯ টন যার মধ্যে মোট বর্জ্য উৎপাদনে ঢাকা ও চট্টগ্রামের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৩৪.৮ ও ১১.৬ শতাংশ। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বহুমুখী উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে- যথা: প্রাতিষ্ঠানিক, কমিউনিটি উদ্যোগ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি। বাংলাদেশ এখনও বর্জ্য বর্জন কিংবা ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের বহুমাত্রিক এবং সুসংগঠিত প্রচেষ্ঠা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি যদিও এটা সত্যি যে বর্জ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ কম্পোষ্ট হিসাবে পুনর্ব্যবহার করা হয়। শহরাঞ্চলের বর্জ্য থেকে জিএইচজি নির্গতের পরিমাণ ২০০৫ সালে ছিল ২.১৯ মিলিয়ন Co2 প্রতি বছর।

## এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম

সৌভাগ্যবশত সময়ের বিবর্তনে দুর্যোগের কারণে প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃতের সংখ্যা, নিখোঁজ হওয়া কিংবা দুর্যোগে সরাসরি আক্রান্তের সংখ্যা (সূচক ১৩.১১) হ্রাস পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে প্রতি লাখে ১২,৮৮১ জন লক্ষ্য হচ্ছে এই সংখ্যা ২০২০ এবং ২০৩০ নাগাদ যথাক্রমে ৬৫০০ ও ১৫০০ তে নামিয়ে আনা হবে। তবে আশার কথা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অনুসরণীয় গতিপথ থেকে অনুমান করা সহজ যে, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব কিছুই নয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সেনডাই ফ্রেমওয়ার্কের সূত্র ধরে বাংলাদেশের জন্য যে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল প্রস্তুত করেছে (২০১৬-২০২০) তা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস।

গর্বের সঙ্গে বলা চলে যে, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতি বেশ ভাল। ইতোমধ্যে বেশ কিছু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিয়ে এগুচ্ছে বাংলাদেশ। এই তো বিগত ৮ বছরে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্যই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিসিসিটিএফ এর মাধ্যমে প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে পানির বহুমাত্রিক সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

## এসডিজি ১৪: জলজ জীবন

সম্প্রতি বাংলাদেশ সামুদ্রিক অঞ্চলের বিশাল এলাকা (swath) প্রাপ্ত হয়েছে। সামুদ্রিক এই এলাকা প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদে ও জৈববৈচিত্রে সমৃদ্ধশীল। তবে এটা গ্যাস উত্তোলনের প্রচেষ্টা ক্ষতিকর হতে পারে কারণ, এই প্রচেষ্ঠা জৈব সম্পদের প্রতি হুমকিস্বরূপ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের জন্য প্রাপ্ত এই সম্পদগুলোর টেকসই ব্যবস্থাপনা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। সেই লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ দুটি সামুদ্রিক অঞ্চল সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষণা করেছে যার একটির লক্ষ্য ইলিশ মাছ প্রজননক্রিয়ার জায়গা রক্ষা করা এবং অন্যটির লক্ষ্য scetacean। বর্তমানে সংরক্ষিত জায়গা মোট সামুদ্রিক জায়গার ২.০৫% (লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ইলিশ মাছের সুরক্ষায় বিগত ১৫ বছরে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

## এসডিজি ১৫: স্থলজ জীবন

বর্তমান দেশে বনায়নের মাত্রা মাত্র ১৭.৫ শতাংশ যা ২০২০ নাগাদ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বনের গুণগতমান যা পল্লববিতানের বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করে। আর তাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা গাছ-গাছালির সংখ্যা বৃদ্ধি করে গাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি। তাছাড়া জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বাংলাদেশে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে আছে গাছ কাটা বিলম্বকরণ, ইসিএ ঘোষণা করা, বিশেষ জীববৈচিত্র অঞ্চল সৃষ্টি এবং দুটো ভালচার সেফ জোন তৈরি করা।

## এসডিজি ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

ইচ্ছাকৃত নরঘাতীমূলক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা ভিত্তি বছর থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে মানব পাচার এবং যুবসম্প্রদায়ের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয় যেমন বিগত ২০ বছরে মানব পাচারের শিকারদের সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের চেয়ে অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে এবং যদি বর্তমান কার্যকারিতা অব্যাহত থাকে তবে আশা করা যায় যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ১৬) নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন সম্ভব।

শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমন, বিভিন্ন অপরাধের সমন্বিত এবং হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি, আইনের যথাযথ কার্যকরীকরণের অভাব, বিচার ব্যবস্থার পক্ষে বিপুল সংখ্যক মামলা সামাল দেবার সীমিত ক্ষমতা এবং সহিংসতা/অপরাধ ঘটনার যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রদানে ব্যর্থতা।

সরকারি সেবায় কার্যকর এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়তে এবং দুর্নীতি রোধে সরকার শাসন সংক্রান্ত কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে যেমন, এনুয়াল পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট (এপিএ), সিটিজেন চার্টার, ন্যাশনাল ইন্টেগ্রেটি স্ট্রেটিজি (এনআইএস) এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে গ্রিভেংস রিড্রেস সিসটেম (জিআরএস)। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, নাগরিক সনদ, জাতীয় শুদ্ধাচার বেষ্টন, অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তি এগুলো ভবিষ্যতে দুর্নীতিমুক্ত এবং আরও দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ নিশ্চিত করবে।

## এসডিজি ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ পর্যন্ত পর্যালোচিত অধিকাংশ সূচকের চলমানতা থেকে এতটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নকালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং সূচকগুলো প্রত্যাশিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে (অন ট্র্যাক)। জিডিপির অনুপাত হিসাবে সরকারি রাজস্ব আদায় প্রত্যাশিত হারের চেয়ে বেশি গতিতে এগিয়েছে তবে এর পেছনে প্রধানত দুটো পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে: এক, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রাজস্ব আহরণে দক্ষতা/নিপুণতা বৃদ্ধি এবং দুই, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করা। বৈদেশিক সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) সম্পর্কিত তথ্য হতে এ খাতে সামান্য প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা যায় যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় বাজেটে এর অবদান প্রান্তিক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এফডিআই ও রেমিট্যান্স প্রবাহের ব্যাপক বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই; অন্তত এসডিজির সুষ্ঠ বাস্তবায়নের স্বার্থে এ দুয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি প্রয়োজন। অন্যান্য সূচকের উন্নতিও উল্লেখ করার মতো যেমন, ইন্টারনেটে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টানেট সুবিধার ব্যবহারের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তা ছাড়া, ফাইবার অপটিক ক্যাবল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, অপটিকেল ফাইবার ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কমকান্ড এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। আশা করা যায় যে বর্তমান গড়পড়তা বার্ষিক কর্মসম্পাদন গতি আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অনায়সেই অর্জিত হবে।

***এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মূলত ভূমিকা পালন করবে বহিঃসম্পদ সহ মোট সম্পদ সহজলভ্যতার উপর। এসডিজির ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৪১টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। এসডিজি ২০৩০ এর মতো সর্ববেষ্টিত ও ব্যাপক উন্নয়ন এজেন্ডা সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলাদেশের জন্য পর্যাপ্ত এবং সময়মতো সহায়তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে।***

## ভবিষ্যৎ করণীয়

এ পর্যন্ত যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ পেশ করা হলো তা থেকে এবং প্রাপ্ত প্রায় সকল সূচকের পরিবর্তন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এসডিজি বাস্তবায়ন সময়কালে সূচকগুলোর উন্নতি ঘটেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম শুধু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা সূচক যা প্রত্যাশিত কৃতিত্বের চেয়ে কম। অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু সূচক রয়েছে যাদের বর্তমান অগ্রগতির ধারা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করে আবার কিছু সূচক রয়েছে যেগুলো লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে নাও পারে। অতএব এসডিজি বাস্তবায়নে জড়িত মন্ত্রণালয় এবং তাদের আওতাধীন সংস্থাগুলোকে স্ব স্ব অবস্থান পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং একইসাথে এসডিজি বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে মন্ত্রণালয়গুলোকে এগুতে হবে।

আশা করা যায়, বর্তমান প্রতিবেদনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল জনগণকে নবোদ্যোমে কাজ করতে সহায়তা করবে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এসডিজির পূর্বসূরী হিসাবে পরিচিত এমডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিল। প্রসঙ্গত, ইউএন এসডিএসএন বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর যে পর্যবেক্ষণ রেখেছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে এবং ১৭টি এসডিজির মধ্যে ১০টিতে রেড থ্রেশহোল্ড পর্যায়ে অবস্থান করছে অথচ বর্তমান মূল্যায়নে প্রতিবেদনটির প্রস্তুতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে সম্ভবত প্রাসঙ্গিক সূচকের ক্ষেত্রে সীমিত তথ্যের কারণে ইউএন এসডিএসএন প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সূচকগুলোর অর্থবোধক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। এখানে এখনও তথ্য-ঘাটতি বা তথ্যের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একথা স্বীকার করেও এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে উন্নততর পরিস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে ।

# ভূমিকা
## এসডিজি বাস্তবায়ন পথ

## পটভূমি

সত্তর দশকের শুরু থেকেই পুরো পৃথিবীতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিদ্যমান ধরণ নিয়ে বিতর্ক জমে উঠে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখার চ্যালেঞ্জটা অনুভূত হতে শুরু করে। অবশ্য টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিতর্ক অগ্রভাগে জায়গা পাবার পেছনে ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলন এবং বেশ কিছু প্রভাব বিস্তারকারী প্রকাশনা যেমন: ক্লাব অফ রোম-এর ১৯৭২ সালের 'লিমিটস টু গ্রোথ' এবং 'বিশ্ব সংরক্ষণ কৌশল: টেকসই উন্নয়নের জন্য সক্রিয় সম্পদ' (আইইউসিএন ১৯৮০) ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। যাই হোক, টেকসই ধারণার আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞার সূচনা হয় 'আমাদের ভবিষ্যত' (our future) নামে `World Commission on Environment and Developmen' কর্তৃক ১৯৮৭ সালে ব্র্যান্ডল্যান্ড রিপোর্ট থেকে (ডব্লিউসিইডি ১৯৮৭)। ঐ প্রতিবেদনে বলা হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটাবার সামর্থ্যকে বাধাগ্রস্থ না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করাই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়নের এই ধারণাটি জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন থেকে শুরু করে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় (ইউএনসিইডি ১৯৯২, রিও আর্থ সামিট)।

সময়ের বিবর্তনে অবশ্য টেকসই ধারণাটি আন্তঃবংশীয় প্রয়োজন থেকে সরে এসে হোলিসটিক অভিগমনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং টেকসই ভাবনাকে গ্রহণ করে। ২০০২ সালে জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের ওপর বিশ্ব সম্মেলনে (ডব্লিউএসএসডি) উপস্থিত সরকার প্রধানগণ জোহান্সবার্গ প্লান অব ইমপ্লিমেনটেশন গ্রহণ করে। সেখানে টেকসই উন্নয়নের তিনটি অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা। এগুলো পারস্পরিক নির্ভরশীল এবং একে অপরকে শক্তি যোগানের স্তম্ভ। এর অর্থ এই নয় যে টেকসই ধারণাটি এখন আর আন্তঃবংশীয় নয় বরং বলা চলে বোধ হয়, টেকসই উন্নয়নের হোলিস্টিক ধারণার বিপরীতে তা এখন গৌণ হিসেবে বিবেচিত।

২০১২ সালে রিওতে রিও শীর্ষ বৈঠকের বিশ বছর পূর্তি স্মরণে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনের (RIO+20 সামিট) চূড়ান্ত প্রতিবেদনে 'যে ভবিষ্যত আমরা চাই' (The Future We Want) ধারণার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় । উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে প্রকাশিত দলিলেও উল্লেখিত টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি তিন অংশের কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে জাতিসংঘ শীর্ষ বৈঠকে গৃহীত প্রতিবেদনে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচ্যসূচির জন্য গ্রহণ করা হয়। এর শিরোনাম দেয়া হয় 'Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development' । বস্তুত ওখান থেকেই বিশ্বের জন্য নতুন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজিএস) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০৩০ এজেন্ডার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ১৭টি টেকসই উন্নয় অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা। এদের লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিলোপ, ক্ষুধা এবং বৈষম্যের অবসান, জলবায়ু এবং পরিবেশনজনিত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধি, মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। বলাবাহুল্য, এসডিজিগুলো পরিসর ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে নজীরবিহীন এবং এমডিজির (২০০১-১৫) থেকে অনেক ব্যাপক। কারণ এতে অন্তর্ভুক্ত আছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, টেকসই নগরায়ন, উদ্ভাবন অগ্রগতির তদারকিকল্পে তথ্য সংঘটন এবং সবার জন্য শান্তি ও ন্যায় বিচার। অপরদিকে, যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এই এজেন্ডা বা আলোচ্যসূচির আহ্বান শুধু দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি নয় – দরিদ্র, ধনী এবং মধ্যম আয়ের সকল দেশের প্রতিও। এসডিজি গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনত বাধ্যবাধকতা নেই তবে অভীষ্ট অর্জনে এবং জাতীয় কর্মকাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে সরকারগুলো মালিকানা গ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

## ২০৩০ আলোচ্য সূচি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

এমডিজি বাস্তবায়নের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে বাংলাদেশের ভূমিকা পুরো বিশ্বে আজ প্রশংসিত। দেশটি অনেক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে; অন্যগুলো বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করেছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যথা: দারিদ্র্য হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জেন্ডার সমতা অর্জন, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুহার এবং মাতৃমৃত্যুর অনুপাত কমিয়ে আনা, টিকাদান কর্মসূচির বিস্তৃতি বাড়ানো এবং সংক্রামক রোগের প্রকোপ হ্রাস ইত্যাদি। যাই হোক, সাফল্যে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এমডিজি পরবর্তী এজেন্ডা বা আলোচ্যসূচি প্রস্তুতিকরণে বৈশ্বিক প্রয়াসের সাথে যোগ দেয়।

দেশের ভেতর পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) ঢাকাস্থ ইউএনডিপির সহায়তা নিয়ে অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসহ ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডা তৈরিতে নেতৃত্ব দেয়। ২০১৩ সালে জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। এ সকল অংশীজনের মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি; সিএসও এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের বিশেষজ্ঞ, বিশেষত উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য থেকেও প্রথম খসড়া প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ হয়। শেষ পরামর্শ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালের জুন মাসে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সভার উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উৎসাহ প্রদান করেন আর অংশগ্রহণে ছিলেন মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সুশীল সমাজ সংগঠন। সবশেষে, জাতিসংঘে পেশকৃত

প্রস্তাব ছিল '২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা: বাংলাদেশ' যে প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১১টি অভীষ্ট, ৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৪১টি সূচক। অভীষ্টগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানব সম্ভাবনা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবারপরিকল্পনা, জেন্ডার সমতা, গুণগত শিক্ষা ও দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও কর্মজীবীর অধিকার, সুশাসন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, টেকসই পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক প্রত্যাশার সাথে বাংলাদেশের প্রস্তাবগুলো সংগতিপূর্ণ ছিল কেননা পেশকৃত ১১টি প্রস্তাবের মধ্যে ৯টি জাতিসংঘের ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ওডব্লিউজি) প্রস্তাবনায়ও ছিল। বস্তুত ওডব্লিউজির প্রস্তাবকৃত অন্যান্য অভীষ্টও বিভিন্ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে বাংলাদেশের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে যাই হোক, ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশ সরকার টেকসই-উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বৈশ্বিক এজেন্ডা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে।

# জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডায় এসডিজির সমন্বয়

## এসডিজি ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অনেকটা কাকতালীয়ভাবে, বাংলাদেশ দুটো যুগপৎ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এবং সেই প্রক্রিয়া জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডায় এসডিজি অঙ্গীভূতকরণের পথ প্রশস্ত করে। সরকার যখন বৈশ্বিক পর্যায়ে ২০৩০ এজেন্ডায় অংশগ্রহণ করছিল, ঠিক তখন দেশটি জাতীয় পর্যায়ে তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। ফলশ্রুতিতে ইউএন ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ওডব্লিউজি) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রস্তাবগুলো জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনার জন্য সামনে চলে আসে। যেহেতু সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৫ বছর বিস্তৃত একটা পথ পরিদর্শক প্রতিবেদন তাই ধরে নেয়া হয়েছিল যে, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলে এসডিজি বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। এসডিজির ১৭ অভীষ্টের সবগুলোই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে অভীষ্ট ১৪, ১৬ এবং ১৭ (১৮%), সপ্তম পরিকল্পনার সঙ্গে আংশিকভাবে এবং বাকি ১৪টি অভীষ্ট (৪২%) বিষয়বস্তুগতভাবে পূর্ণ সংগতিপূর্ন হয়।

তবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের তদারকির জন্য একটা উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ) পরিকল্পনার দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসডিজির সাথে সম্পর্কিত ডিআরএফ-এ ফলাফল এবং লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রিভূত ছিল মূলত সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, পরিবহন ও যোগাযোগ শক্তি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, জেন্ডার ও বৈষম্য, পরিবেশ, দুর্যোগব্যবস্থাপনা, আইসিটি, নগর উন্নয়ন, শাসন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর ডিআরএফটি পরামর্শভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে যাতে করে বিভিন্নজনের মতামত গ্রহণপূর্বক একটি যথোপযুক্ত ও শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরী করা যায়।

# এসডিজি বাস্তবায়ন পদ্ধতি

## এসডিজি অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি

উচ্চাভিলাষী ও রূপান্তরমূলক এসডিজি বাস্তবায়নে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের কথা চিন্তা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসডিজি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নকল্পে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার প্রমাণ রাখেন। এই কমিটিতে আছেন ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব যারা এসডিজি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের কাজগুলোর সমন্বয় সাধন করবেন। এই কমিটির প্রধান হলেন মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি সংক্রান্ত) যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সৃষ্ট একটা উঁচু পদ। আর জিইডি এই কমিটির সচিবালয় হিসাবে একদিকে নীতি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমন্বয় বিধান করে এবং অন্যদিকে এসডিজির তদারকি ও বাস্তবায়নের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে।

গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও জাতীয় আকাঙ্খার সাথে বৈশ্বিক অভীষ্ট প্রাসঙ্গিককরণে কাজ শুরু করেছে। সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক অভীষ্ট এবং লক্ষ্য মাত্রা চিহ্নিত করে স্ব স্ব খাতভিত্তিক পরিকল্পনায়, এমনকি নবসূচিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) প্রতিফলন ঘটাতে। প্রতি 'ছয়' মাস অন্তর এই কমিটি এসডিজি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদে পেশ করবে।

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে মন্ত্রণালয়সমূহের ম্যাপিং:

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাঠামোতে দুটো বড় পর্ব রয়েছে: প্রথম পর্বে বক্তব্য এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ১৩টি খাতে বিস্তৃত উন্নয়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা। খাত-ভিত্তিক কৌশল থেকে কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানত পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন করা হয়ে থাকে এবং খাতগুলো খুবই সমষ্টীভূত এবং কোনো বিশেষ খাতের আওতায় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে বেশ কটা মন্ত্রণালয়/বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার দিকে দায়সারাভাবে দৃষ্টি দিলেও বোঝা যায়, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মন্ত্রণালয়গুলোর অংশগ্রহণ অনেকটা যেন জটিল

মাকড়সার জালের মতো। আর তাই মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে অভীষ্ট ও তৎসঙ্গে বাজেট দেয়া হয়েছে। এই ম্যাপিং অনুশীলনটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মূল নেতৃত্ব সমর্পণ করেছে প্রাসংগিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওপর। অবশ্য ওই মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা সংগঠনের সাহায্যে থাকবে সহ – নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যাদের কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় স্বার্থ আছে, তাদেরকে সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগভুক্ত করা হয়েছে। মনে করিয়ে দেয়া দরকার যে, এসডিজি ম্যাপিং এমন কর্মপরিকল্পনা রীতিতে করা হয়েছে যা পরিকল্পনাকালে কর্মকাণ্ড, বিদ্যমান নীতিসংক্রান্ত উপায় সনাক্ত করে এবং কৃতিত্ব পরিমাপকল্পে বৈশ্বিক সূচক সম্পর্কে ধারণা দেয়।

## এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

ম্যাপিং অনুশীলনের জের ধরে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যার যার ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যেখানে নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড/কার্যক্রম এবং হস্তক্ষেপসহ পদক্ষেপের কথা থাকবে যাতে করে স্ব স্ব অভীষ্ট/লক্ষ্যাত্রা অর্জনের পথ সুগম হয়। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০৩০ এজেন্ডা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী খাত-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করে। তবে মনে রাখা দরকার যে, এর পরিধি শুধু সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ নয়, এমনকি তার পরও।

পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি এসডিজির জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতিমূলক কাজটি করেছে। একটা গভীর পরামর্শকদায়ক প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও পুনঃপ্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিইডি ৪৩টি প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করেছে। তারপর একটা বিশেষ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখে এমন চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা প্রণয়ন করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কিংবা তারপরও যে সমস্ত কর্মসূচি/প্রকল্পের প্রয়োজন সেগুলো আনুমানিক ব্যয়সহ চিহ্নিত করা হয় এবং চলমান প্রক্রিয়ায় যদি নতুন কোনো নীতি/কৌশল প্রবর্তনের প্রয়োজন পড়ে সেগুলোও উল্লেখ করা হয়। মোট কথা, এই পরিকল্পনা এসডিজি ও পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনা যাচাই করা ও মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্য নিরূপণে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ পথনির্দেশনা দেবে বলে বিশ্বাস। সবশেষে, ধারণা করা হয় যে এই পরিকল্পনা দলিল অষ্টম পঞ্চবার্ষিক দলিল প্রস্তুতিকল্পে পথ-নির্দেশক প্রতিবেদন হিসাবেও কাজ করবে।

## এসডিজির জন্য তথ্য ঘাটতি পর্যালোচনা

নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী এসডিজির অগ্রগতি সনাক্তকরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তথ্য ও পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্ভবত সেই জন্য ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন এজেন্ডার জন্য ২০১৩ সালে গঠিত জাতিসংঘ মহা সচিবের হাই লেভেল প্যানেল অফ এমিনেন্ট পারসন্স একটা "তথ্য বিপ্লবের" ডাক দিয়েছিল। কারণ, প্যানেল অনুভব করেছে, সাধারণত উন্নয়নশীর দেশগুলো প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রা তদারকির নিমিত্ত সকল প্রকার তথ্য সংগঠন করে না। সুতরাং, সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশ দুটো অনুশীলন হাতে নেয়। একটা নেয় বিবিএস ও অন্যটি পরিকল্পনা কমিশন যাতে তথ্য প্রবাহের বর্তমান অবস্থা, প্রকৃতি ও তথ্য ঘাটতি যাচাই শেষে এসডিজির অগ্রগতি পরীক্ষণে কোনোপ্রকার সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয়। আর সে কারণেই বিভিন্ন উৎসে তথ্যের প্রাপ্তি এবং নতুন তথ্য সংঘটন করে ঘাটতি পূরণ বিষয়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০১৭ক) দেশে বর্তমানে বিদ্যমান তথ্যভাণ্ডার পর্যালোচনার কাজ হাতে নেয়। এই অনুশীলনের আওতায় বিবিএস সহ সব তথ্য সংঘটনকারী সংস্থা রয়েছে।

তথ্য প্রাপ্তির অবস্থান বুঝে এই প্রতিবেদন সূচকগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে: (১) যেসব সূচকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেকোনো সময় পাওয়া যাবে; (২) যেসব সূচকের তথ্য আংশিকভাবে প্রাপ্ত এবং পুরো তথ্য সংগ্রহে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা দাবি করে এবং (৩) যেসব সূচকের তথ্য পাওয়া যায় না বিধায় নতুন সমীক্ষা বা শুমারির প্রয়োজন হতে পারে। গভীর পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায়, ৭০টি সূচক প্রথম শ্রেণীভুক্ত (২৯ শতাংশ), ৬৩টি সূচক তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত (২৬শতাংশ) এবং ১০৮টি সূচক দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত (৪৫ শতাংশ)। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তথ্য-ভিত্তিক সঠিক নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কার্যকর তদারকির জন্য সঠিক সময়ে অধিক ও গুণগত তথ্যের কোনো বিকল্প নেই।

তথ্য ঘাটতি পর্যালোচনায় জিইডির নেয়া পদক্ষেপের পূর্বে বিবিএসও একটা অনুশীলনে হাত দিয়েছিল। ওই অনুশীলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভিত্তি ও রেফারেন্স বছর নির্ধারণে এবং এসডিজির তদারকিতে ফলাফল ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণে তথ্যঘাটতি চিহ্নিতকরণ। এমনকি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) এবং এসডিজি অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০) অগ্রগতি পর্যালোচনার কাজটিও অন্যতম লক্ষ্য ছিল। বিবিএস সমগ্র তথ্য ভান্ডারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে: (ক) বিবিএস থেকে পাওয়া; (খ) বিবিএস-এর বাহির থেকে প্রাপ্ত এবং (গ) তথ্য পাওয়া যায় না। প্রথম শ্রেণীভুক্ত তথা বিবিএস থেকে সরাসরি পাওয়া যায়, এবং দ্বিতীয় ধরনের তথ্য সরবরাহে প্রতিষ্ঠানটিকে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে। এই অনুশীলনটি থেকে বেরিয়ে আসে যে, সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কিংবা এসডিজি অগ্রগতি পরিমাপ করতে গেলে বিদ্যমান তথ্য ঘাটতি নিরসনে স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে কিছু কর্মসূচি/প্রকল্প হাতে নেয়া দরকার।

## এসডিজির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক

আগামী ১৩ বছর ধরে চলমান এসডিজি অভীষ্টের বাস্তবায়ন ও সাফল্যের অগ্রগতি নজর দেয়ার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই) ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয় (জিইডি ২০১৮)। এই ফ্রেমওয়ার্কের ওপর আলোচনার সূত্রপাত করার আগে কিছু বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। প্রথমত, অর্থনীতির বিস্তৃতি ও গভীরতা সাপেক্ষে এসডিজির অগ্রগতি পরিমাপে ব্যবহৃত সূচকগুলো বহুমুখী ও জটিল হয়ে উঠতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্যমাত্রা শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, বরং বিভাজনের উপর নির্ভর করে বহু সংখ্যা ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয়, বিবিএস আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই সংঘঠন ও সরবরাহ করে না বিধায় অনেক সূচকের তথ্যে ঘাটতি থেকে যায়। তৃতীয়ত, নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিবিএস কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সমীক্ষার সময়ের ব্যবধান খানার আয় ও ব্যয় জরিপের জন্য নেয়া ৫ বছর থেকে বাংলাদেশ জনমিতিক ও স্বাস্থ্য সমীক্ষার জন্য তিন বছর। বিবিএস এখন ত্রৈমাসিক ভিত্তিক শ্রমশক্তি জরিপ চালায় যা একসময় তিন বছর অন্তর অন্তর করা হতো। চতুর্থত, আরও ঘন ঘন এবং বিভাজিত স্তরে- যেমন ভৌগলিক অবস্থান বা স্পেস সংক্রান্ত, জেন্ডার, বয়সগোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক শ্রেণি, বেকারত্ব অবস্থান ইত্যাদি ভেদে তথ্য সংগ্রহের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো বর্ধিষ্ণু আর্থিক ও মানব সম্পদ, লজিস্টিক সহায়তা এবং তার সাথে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

তথ্যপ্রাপ্তি সাপেক্ষে সনাক্তকরণ ফ্রেমওয়ার্কটি প্রতি সূচকের জন্য ভিত্তি বছরের এবং এসডিজির শেষ বছর অর্থাৎ ২০৩০ সালের জন্য তথ্য প্রদান করে। এর মধ্যে তথ্য আসবে দুটো মাইলফলক ২০২০ ও ২০২৫ অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্যও। তবে একথা ঠিক যে তথ্যের উৎস সম্পর্কে দ্রুত ধারণা দেবার জন্য যেসব সংস্থা তথ্য সংগ্রহে লিপ্ত আছে, তাদের মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও প্রকাশনার নাম দেয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, তথ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে সব সূচকের জন্য একই ভিত্তিবছর নির্ধারণ করা যায় নি। আর তাই ২০১৪-১৫ তে অর্থাৎ এমডিজির প্রান্তিক বর্ষে যেসব সূচকের জন্য তথ্য পাওয়া গেছে সেই বার্ষিক তথ্য ভিত্তিবছর হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে। অপরদিকে, যে সূচকের জন্য ২০১৪-১৫ সময়ের তথ্য পাওয়া যায় নি তার বেলায় অতি সাম্প্রতিক সমীক্ষাকৃত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা, ১২৭টি সূচকের জন্য ভিত্তি বছরের তথ্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু এম এন্ড ই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয় ১০৮টি সূচকের জন্য। বিশেষত গুণগত প্রকৃতির সূচকের জন্য এখনও মাইলফলক নির্ধারণ করা যায় নি। যাই হোক, তথ্য ঘাটতি পর্যালোচনার শ্রেণিভূক্তি অনুসরণ করে সূচকগুলোতে তিনটি বন্ধনীতে ফেলা হয়েছে: অনায়াসে লভ্য, আংশিক লভ্য এবং লভ্য নয়। বর্তমানে ৬৪টি সূচক সহজলভ্য, ৫৮টি আংশিক লভ্য এবং ১১০টি সূচকের তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রাপ্তিতে সক্ষম না হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা- বিশ্বব্যাংক, এফএও, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইএলও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত তথ্যে ব্যবহার করে ২২টি সূচকের ভিত্তিরেখা স্থির করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, লভ্য নয় এমন সূচকের সংখ্যা ৮১ যার জন্য অর্জিত আইএইজি-এসডিজি কর্তৃক মেটাডাটা এখনও পূর্ণতার অপেক্ষায়। এসব কথা বলার অর্থ, এই দেশে তথ্য-ঘাটতির তীব্রতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া।

তথ্যজনিত ঘাটতির প্রসঙ্গ যখন আসলই তখন অন্য একটা কথা না বললেই নয়। প্রথমত, অভীষ্ট অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যেখানে এসডিজি ৩, ৪, ৯, ৫, ৮, ১৭, ৭ এবং ২-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের লভ্যতা মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে, সেখানে এসডিজি ১২, ১৪, ১৩, ১১, ১৬, ১০ এবং ১৫-এর ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির সংবাদ কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। দ্বিতীয়ত, এসডিজি সংক্রান্ত অধিক তথ্য আসবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) থেকে যেমন, ২৪৪টি সূচকের মধ্যে তারা দেবে ১০৫টি। পরিবেশ ও বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় তথ্যের জন্য হবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস (৪২), তারপর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৩৪)। তাছাড়া, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ তথ্য দেয়ার কথা ২৪টি সূচকের জন্য এবং অর্থবিভাগ থেকে ২০টির।

তৃতীয়ত, এসডিজির তথ্য প্রদানে দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিবেচনা করে দেখা গেছে যে, সরকারের বিবিএস ও এনএসও সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানে যারা বিশ্বাসযোগ্য এবং বিভাজিত তথ্য সময়মতো দিতে পারে। অবশ্য বিবিএস এর পথ অনুসরণ করে এগিয়ে আসবে ডিওই, ডিজিএইচএস, বিএফডি, নিপোর্ট এবং বিবি।

## এসডিজির অর্থায়ন কৌশল

২০১৭-২০৩০ সময়কাল উচ্চাভিলাষি এসডিজি বাস্তবায়নে প্রচুর পরিমাণে সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং, বলাবাহুল্য, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ ও তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা। যেহেতু বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই প্রয়োজনীয় সম্পদের একটা হিসাব করার প্রয়োজন যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অর্থায়নের কৌশল ও উপায় নির্ধারণের উপর গুরুত্ব দেয়া। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ "এসডিজি অর্থায়নের কৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" নামে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে যেখানে দেখানো হয়েছে বছরভিত্তিক সম্পদ ঘাটতি এবং সেই সূত্রে পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারি অর্থায়ন ও হস্তক্ষেপজনিত কৌশল পরিবর্তনের সুযোগ সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা। হিসাবে দেখা যায়, এসডিজির জন্য সরকারি ও বহিঃস্থ উৎস থেকে বিনিয়োগের অতিরিক্ত হিসাবে লাগবে ৯২৮.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৫-১৬ স্থির মূল্যে)। অর্থবছর ২০১৭ থেকে অর্থবছর ২০৩০ ব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে এই

পরিমাণ অর্থের যোগান মানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রসারিত প্রবৃদ্ধিও দৃশ্যের প্রেক্ষিতে পুঞ্জিভূত জিডিপির ১৯.৭৫ শতাংশ ব্যয় করা। এই সময়কালে এসডিজি বাস্তবায়নে গড় বার্ষিক খরচ দাঁড়াবে ৬৬.৩২ বিলিয়ন (স্থির মূল্যে)। স্মর্তব্য যে, ব্যয়ের এই অনুশীলন এসডিজির ১৬৯ সূচকের ৮০ ভাগের জন্য প্রযোজ্য।

জিইডি কর্তৃক প্রস্তুত উক্ত অধ্যায়নটি অর্থায়নের ঘাটতি মোকাবেলায় ৫টি সম্ভাব্য উপায়ের উপদেশ দেয়: ব্যক্তিখাতের অর্থায়ন, সরকারি খাতের অর্থায়ন, পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব (পিপিপি), বৈদেশিক অর্থায়ন যার মধ্যে আছে বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং সাহায্য ও মঞ্জুরি, এবং বেসরকারি সংগঠন (এনজিও)। ২০১৭-৩০ সময়ে মোট অর্থায়নের সরকারি খাতের অবদান হবে গড়পড়তায় ৩৪ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতের ৪২ শতাংশ। মনে রাখতে হবে যে, এসডিজির অভীষ্ট ও তার সাথে সম্পর্কিত সূচকগুলোর মধ্যে বড় ধরনের পাবলিক পণ্য (public goods) রয়েছে যা সরবরাহ করতে গেলে বেসরকারি তুলনায় সরকারি ব্যয় বেশি লাগবে। পিপিপি গড় হিস্যা ৬ শতাংশ, বহিঃ উৎসের অবদান হবে ১৫ শতাংশ যেখানে এফডিআই ১০ শতাংশ পূরণ করবে এবং অর্থায়ন ঘাটতির ৫ শতাংশ পূরণ করবে বৈদেশিক সাহায্য। সবশেষে, একই সময়কালে এনজিওর অবদান হবে ৪ শতাংশ।

## কৃতিত্ব চুক্তিতে এসডিজি সূচক অঙ্গীভূত করা

বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়বদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) (Annual Performance Agreement) করেছে। এটা একটা ফলাফল-ভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুশৃংখল পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজন হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরদাতাগণ হলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব। আশা করা যায় যে, এপিএ সম্পাদন করার ফলে এসডিজি বাস্তবায়নে নিযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি হবে।

## এসডিজি বাস্তবায়নে অভিগমন: "সমগ্র সমাজ" পদ্ধতি

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে বাংলাদেশ সরকার সবসময় 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতিকে অনুসরন করে আসছে এবং এসডিজি প্রস্তুতির শুরু থেকেই এই ধারা অব্যাহত আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, Post-2015 Development Agenda: Bangladesh Proposal to UN (GED 2013) তৈরীর নিমিত্ত উপকরণ এসেছিল বহুবিধ অংশীজনের কাছ থেকে যেমন: জাতীয় বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিখাত, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিএসও প্রতিনিধি। উচ্চাভিলাষি- এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার সেই শক্তিশালী ঐতিহ্যকে প্রসারিত করেছে মাত্র। সেই লক্ষ্যে বহুবার বহু পরামর্শক-সভা অনুষ্ঠিত হয় যেগুলোতে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন অংশীজন যথা: এনজিও প্রতিনিধি, সিএসও, ব্যবসায়ী, উন্নয়ন সহযোগী, ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী, পেশাজীবি গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন, নারী নেটওয়ার্ক ও গণমাধ্যম। এসব পরামর্শ সভার ফলে এসডিজি বাস্তবায়নে সমস্ত অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা, আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বিশেষত, এসডিজির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ব্যক্তিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মাথায় রেখে সরকার, ব্যক্তিখাত ও জাতিসংঘ সংস্থানের মধ্যকার অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভা এসডিজিতে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা ও সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে খুব ভাল একটা ধারণা দেয়। অন্যদিকে, জনগণের মাঝে এসডিজি নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার মূল্য সরকার সানন্দে স্বীকার করে নেয়। তবে মনে রাখা দরকার যে, এত কিছুর পরও ভবিষ্যতে এসডিজি সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কার্যকর ও সংগতিপূর্ণ, শক্তিশালী ভূমিকায় প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

## প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদনের প্রস্তুতিকল্পে নেয়া পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

এসডিজি অগ্রগতির প্রথম প্রতিবেদন প্রস্তুতিকল্পে একটা শক্তিশালী পদ্ধতিগত নির্মাণকাঠামো (Methodological Framework) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলের উপর সম্পূর্ণ ধারণা এবং জিইডি কর্তৃক প্রস্তুত অন্যান্য প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মস্তকরণ: যার মধ্যে এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২০১৮), এসডিজি বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা/সূচক অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্ম পরিকল্পনা, এসডিজি অভীষ্টের জন্য তথ্য ঘাটতি পর্যালোচনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২০১৭) এবং এসডিজির অর্থায়ন কৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২০১৭)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় পরিসংখ্যান সংগঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে এসডিজি সূচকের ওপর তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে জোর প্রচেষ্ঠা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা: বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, এফএও, আইএলও এবং ওইসিডি থেকে তথ্য নিয়ে ঘাটতি পূরণে প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য এটাও ঠিক যে, পরবর্তীকালে এসডিজির বাস্তবায়ন সমীক্ষার উপর জুলাই ২০১৮ তে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ডিভিশন সাম্প্রতিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে।

প্রতিবেদনের প্রথম খসড়া জিইডির অভ্যন্তরীণ উৎসে পর্যালোচিত হয়েছে এবং সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনী আনা হয়েছে। তাছাড়া, জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রতিবেদন তৈরিতে জিইডির দীর্ঘকালের অংশীজনদের অংশগ্রহণমূলক যে ঐতিহ্য, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বস্তুত অংশীজনদের সাথে দুটো পরামর্শক সভা করা হয় এবং সেই সভা থেকে প্রাপ্ত ধারণা প্রতিবেদনটিকে অধিকতর সমৃদ্ধশীল করে।

## এসডিজি বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণে প্রতিবন্ধকতা

### জটিল লক্ষ্যমাত্রা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রাগুলো শুধু জটিল নয়, এমনকি অনেক লক্ষ্যমাত্রা ভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। আপাতদৃষ্টে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এসডিজিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব দিক বিবেচনা না করে কেবলমাত্র জ্ঞানজাগতিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপরও স্বীকার করে নেয়াটা ভাল যে, বড় মাপের অভীষ্ট/লক্ষমাত্রা অর্জন করা গেলে আমাদের এই পৃথিবী বসবাসের জন্য উন্নত অবস্থানে চলে যাবে। আর একটা কথা না বললেই নয় আর তা হলো, একটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন কিন্তু দেখা যায় যে ঐ বিনিয়োগ দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা আংশিক পূরণ করা যায়, সবটা নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পে/কর্মসূচিতে বিনিয়োগ ভাগ করতে গেলে বেশ বড় মাপে বিনিয়োগ আকার বৃদ্ধি পেয়ে যায়। একটা সহজ উপমার সাহায্য নেয়া যেতে পারে। লক্ষ্যমাত্রা ১.১ ২০৩০ নাগাদ সকল মানুষের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য নির্মূল দাবী করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে অথচ লক্ষ্যমাত্রা ১.১.১ জনগোষ্ঠীকে জেন্ডার, বয়স, কর্মসংস্থানজনিত অবস্থান, ভৌগলিক অবস্থান (শহর/গ্রাম) হিসাবে শ্রেণীকরণ করে। বাংলাদেশ বর্তমানে দারিদ্র্যের ওপর জাতীয় স্তরে এবং ভৌগলিক অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষা ও জেন্ডার ভেদে তথ্য সংগ্রহ করে মাত্র।

### এসডিজির মিল-অমিল

বলতে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো ২০৩০ নাগাদ সূচক অনুযায়ী এসডিজি বাস্তবায়নের নিমিত্ত নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা। তবে সমস্যা দাঁড়ায়, কোথাও কোথাও এসডিজিগুলো এমন সূক্ষ্মভাবে সম্পর্কিত যে এক খাতে নেয়া এসডিজি নীতি অন্য খাতের কৃতিত্বকে অপ্রত্যাশিতভাবে খাটো করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নয়নশীল কিংবা স্বল্পোন্নত, অভীষ্ট ৮ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে একটা দেশ যদি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চায়, তা হলে সে অভীষ্ট ১০ অর্থাৎ বৈষম্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। উল্টোদিকে, একটা খাতের এসডিজি সংক্রান্ত নীতি অন্য খাতে অতি-কৃতিত্বের কারণ হতে পারে (Pedercini and Arquitt 2016)। সুতরাং, এসডিজি সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচিকে এই সমস্ত মিল-অমিলের জটিল সংযোগের হিসাব বিবেচনায় রাখতে হবে।

### তথ্যের সীমাবদ্ধতা

এসডিজির সর্ববেষ্টিত প্রকৃতির কারণে এমনকি উন্নত দেশগুলো এসডিজি বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব অনুভব করে থাকে। অতএব বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ পর্যাপ্ত তথ্যের প্রকট ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাই সরকার এসডিজি তদারকিতে তথ্যের প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতার সীমা চিহ্নিত করণে তথ্য-ঘাটতি পর্যালোচনার পদক্ষেপ নেয়। দেখা গেছে, বিদ্যমান তথ্য সংঘটন পদ্ধতিতে ২৩২টি সূচকের মধ্যে ৭০টি যখন-তখন লভ্য (অবশ্য কোনোটির ব্যবধান ২-৩ বছর), অন্য ১০৮টি সূচকের তথ্য পাওয়া যায় বিদ্যমান শুমারি, সমীক্ষা ও এমআইএস-এর সংশোধন সাপেক্ষে এবং সেটা করতেও সময় নেবে। আবার এও দেখা গেছে যে, প্রাপ্ত তথ্য প্রত্যাশিত অ-সমষ্টিভূত (Dis-aggregation) পর্যায়ে পাওয়া যায় না। সবশেষ সমস্যাটা হচ্ছে তথ্য সংঘটনে সময়ব্যপ্তি যেমনঃ কোনোটা ত্রৈমাসিক (শ্রমশক্তি সমীক্ষা), কোনোটা পাঁচবছর মেয়াদী (খানার আয় ও ব্যয় জরিপ) এবং কোনটা দশবছর পর পর (জনসংখ্যা ও বসত শুমারী)। সুতরাং অনেক সূচকের কোনো একটা বিশেষ সময়ের জন্য সাম্প্রতিক তথ্য না থাকার ফলে এসডিজি অগ্রগতি বাস্তবায়নের সমরূপ পর্যালোচনার কাজটি বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

## প্রতিবেদনটির সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যত করণীয়

বর্তমান প্রতিবেদনটি সকল এসডিজি অভীষ্টের অগ্রগতি সম্পর্কিত সমরূপ পর্যালোচনা পেশ করতে পারে নি। তার কারণ, যেমন একটু আগেও বলা হয়েছে, হয়তো প্রাসঙ্গিক সূচকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্পূর্ণ ঘাটতি অথবা হালনাগাদ তথ্যের অভাব। এসডিজি শুরুর পর থকে পর থেকে এবং দু'বছরের জন্য তথ্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে, অগ্রগতি সন্তোষজনক (অন ট্র্যাক) কিংবা ২০২০ মাইলফলক স্পর্শ করতে পরবে কি না সেজন্য সাধারণ ও সরলরৈখিক প্রক্ষেপণ ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এসডিজি সময়কালের সাথে এমডিজি সময়কালের শেষ বছরের তথ্য ব্যবহার করে উপসংহার টানতে হয়েছে। আর, যদি মাত্র একটা পয়েন্টে কোনো উপাত্তের উপস্থিতি দেখা যায় সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি পরিমাণগত বিবেচনা থেকে বিরত থেকেছে।

এ বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন বলেই এমনতরো পরিস্থিতিতে বিশ্বাসযোগ্য, নিয়মিত, সময়মতো এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংঘটনে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। তথ্য অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নিরূপনে জিইডি প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তা নয়। জিইডির উদ্দেশ্য ছিল এই অনুশীলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ সমস্যা চিহ্নিত করবে অন্যদিকে সীমাবদ্ধতা তেমনি সম্পূর্ণ সচেতনতা সৃষ্টি করবে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেয়া সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটলো – যে প্রতিশ্রুতি ছিল এসডিজি বাস্তবায়নে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরীক্ষা এবং সঠিক পথে থাকার নিমিত্ত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আশা করা যায় যে, প্রতিবেদনটি সব অংশীজনের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাব কাজ করবে যাতে তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে ২০৩০ মাইলফলক পৌঁছাবার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে প্রয়োজনীয় অগ্রগতির হার নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার তথ্য সংঘটনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্বলতা যথা: যথাকালীনতা, পুনঃপুনঃ সংঘটন, গুনগতমান এবং অসমষ্টিগতকরণ ইত্যাদি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত এবং অতিদ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সামনের পথ চলা।

# ১ দারিদ্র্য বিলোপ

## সর্বত্র সবধরনের দারিদ্র্যের অবসান

## ১.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

এক হিসাব থেকে জানা যায়, বৈশ্বিক পর্যায়ে, ২০১৩ সালে ৭৬৭ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থান করছিল। এই সংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ। আবার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের বাস উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষত সাবসাহারা আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ায়; দক্ষিণ এশিয়া একাই ধারণ করে বিশ্বের ৫০ শতাংশ দরিদ্র্যকে। এসডিজি ১-এর আহ্বান, পরবর্তী পনের বছরব্যাপী, সব জায়গায় চরম দারিদ্র্য নির্মূল করতে হবে এবং সব মাত্রিকতা নিয়ে দারিদ্র্য অর্ধেকে নেমে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যাশা আরও যে জেন্ডার ও বয়সভেদে সব মানুষের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে; দরিদ্র ও অরক্ষিত সহ সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার সম্প্রসারিত থাকবে। এসডিজি ১ সবার জন্য সমান অধিকার, এবং অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদে, এমনকি প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদে, প্রবেশগম্যতা বা সুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চায়। এই অভীষ্টের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে দরিদ্রকে অভিঘাতসহনীয় করে গড়ে তোলে জলবায়ুর পরিবর্তন সহ সকল প্রকার অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেয়া। সম্প্রসারিত উন্নয়ন সহযোগীতাসহ বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ আহরণ এবং ত্বরান্বিত দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য দরিদ্র-বান্ধব ও জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তিতে শক্তিশালী একটা নীতি-কাঠামো তৈরিতেও এই অভীষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে।

## ১.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ১ অগ্রগতি পর্যালোচনা

### *সূচক ১.১.১: আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত*

দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখনও দরিদ্র এবং এদের প্রায় অর্ধেক চরম দরিদ্র। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, চরম দরিদ্র তারাই যারা ২০০৫ সালের আন্তর্জাতিক মূল্যস্তর (পিপিপি) সমন্বয় সাপেক্ষে প্রতিদিন ১.২৫ ডলারের নিচে বাস করে। এই হিসাবটা এসেছে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্য থেকে ১৫টি জাতীয় দারিদ্র্য রেখার গড় নেয়ার মাধ্যমে। অবশ্য ২০১১ সালের আন্তর্জাতিক দাম সমন্বয় সাধন করে (পিপিপি) চরম দরিদ্রের নতুন হিসাব দাঁড়ায় দৈনিক ১.৯০ ডলারের নিচে (<১.৯০ ডলার)। সারণি ১.১ থেকে দেখা যায়, সময়ের বিবর্তনে উভয় পরিমাপে দারিদ্র্যের প্রকোপ নিম্নমুখী তবে হালনাগাদ হিসাবে চরম দরিদ্রের অনুপাত অত্যন্ত কম। আরও লক্ষণীয়, ২০১০ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে গড়পড়তা ০.৯৪ পয়েন্টেস।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবকৃত এই দারিদ্র্য রেখার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যের আন্তঃদেশীয় পরিস্থিতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা। তবে, কোনো একটা দেশের দারিদ্র্য প্রকোপ পরিমাপে ঐ দেশের জাতীয় দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করাটা উচিত বলে অনেকেই মনে করে থাকেন ।

**সারণি ১.১ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%)**

| দারিদ্র্য পরিমাপ | ১৯৯২ | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১.৯০ ডলার জন প্রতি | ৪৪.২ | ৩৩.৭ | ২৪.৫ | ১৮.৫ | ১৩.৮ |
| ১.২৫ ডলার জন প্রতি | ৭০.২ | ৫৮.৬ | ৫০.৫ | ৪৩.৩ | ঘঅ |

*উৎস: বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন সূচক*

### সূচক ১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

১৯৯১-৯২ থেকে দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের চমকপ্রদ অর্জন ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় স্তরে দারিদ্র্য অর্থাৎ, জাতীয় উঁচুমৃদু দারিদ্র্য রেখার নিচে বাসরত জনগোষ্ঠীর অনুপাত, নিয়মিত নিম্নমুখী হয়ে ২০১০ ও ২০১৬ সালে যথাক্রমে ৩১.৫ ও ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক হিসাবে মনে করা হচ্ছে যে ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের এই হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে ২১.৮ শতাংশে (সারণি ১.২)।

**সারণি ১.২ উচ্চ দারিদ্র্য রেখার (২১২২ ক্যালরি/দিন) ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা ১৯৯২-২০১৬**

| | ১৯৯১-৯২ | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৬ | ২০১৭ (হিসাবকৃত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | ৫৬.৭ | ৪৮.৯ | ৪০ | ৩১.৫ | ২৪.৩ | ২৩.১ |
| শহর | ৪২.৮ | ৩৫.২ | ২৮.৪ | ২১.৩ | ১৮.৯ | প্রাপ্ত নয় |
| গ্রাম | ৫৮.৮ | ৫২.৩ | ৪৩.৮ | ৩৫.২ | ২৬.৪ | প্রাপ্ত নয় |

*উৎস: বিবিএস, খানা আয় ও ব্যায় জরিপ, বিভিন্ন বছর*

কিন্তু কিছুটা হলেও উদ্বেগের বিষয়, ২০০৫-২০১০ সময়কালের তুলনায় ২০১০-১৬ সময়কালে দারিদ্র্য হ্রাসের গতি যেন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। যেমন, পূর্ববর্তী সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক হার ছিল গড়পড়তা ১.৭ শতাংশ পয়েন্ট আর তার বিপরীতে পরবর্তী সময়কালে দারিদ্র্য নেমেছে ১.২ শতাংশ পয়েন্ট হারে। অথচ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে প্রত্যাশাকেও অনেকটা অতিক্রম করে বেড়েই চলেছে তা নিয়ে কারও

মনে সন্দেহ নেই। যাই হোক, পরবর্তীকালে দারিদ্র্যের ওপর প্রবৃদ্ধির প্রভাব প্রশমিত হবার কারণ সম্ভবত আয়-বিতরণে উর্ধ্বমুখী বৈষম্য। মোট কথা, সার্বিক দারিদ্র্য পর্যালোচনায় সুখবর হলো, শহর কিংবা গ্রাম উভয় জায়গাতেই, দারিদ্র্যের নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষণীয় এবং এর পাশাপাশি শহর-গ্রাম দারিদ্র্য ব্যবধানও সংকুচিত হবার পথে।

সেই সূত্র ধরে দুটো বিশেষ ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের হার শহরের চেয়ে দ্রুততর হওয়ার সুবাদে গ্রামীণ অর্থনীতিতে দ্রুত ও বহুবিস্তৃত রূপান্তর ঘটে যায়। আবার, সময়ের বিবর্তনে শুধু দারিদ্র্যের হার হ্রাস পায়নি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবিমিশ্র সংখ্যা ১৯৯২ সালের ৮৩.০৬ মিলিয়ন থেকে ২০১৬ সালে ৩৯.৬০ মিলিয়নে নেমে আসে। এর অর্থ, এই সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্য রেখার উপরে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে। যাই হোক, সম্প্রতি বছরগুলোতে অব্যাহতভাবে ৭ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি এবং আসছে বছরগুলোতে প্রত্যাশিত উঁচু প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করা গেলে তা দারিদ্র্যের হার হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে মাইলফলকে পৌঁছাতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

তুলনীয় সময়ে এমনকি নিম্ন দারিদ্র্য রেখার নিচে থাকা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অব্যহতভাবে উপরে উঠে আসে এবং এ ক্ষেত্রেও নিম্নগামিতার হার ২০০৫-১০ সময়কালে ১.৫ শতাংশ পয়েন্টস থেকে ২০১০-২০১৬ তে দাঁড়ায় ০.৭৮ শতাংশ পয়েন্টস। অতি সাম্প্রতিক হিসাব দেখাচ্ছে, ২০১৮ সালে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৩ শতাংশ।

### সারণি ১.৩ নিম্নহত দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা ১৯৯২-২০১৬ (%)

| | ১৯৯১-৯২ | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৬ | ২০১৭ (হিসাবকৃত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | ৪১ | ৩৪.৩ | ২৫.১ | ১৭.৬ | ১২.৯ | ১২.১ |
| শহর | ২৪ | ১৯.৯ | ১৪.৬ | ৭.৭ | ৭.৬ | ঘধ |
| গ্রাম | ৪৩.৮ | ৩৭.৯ | ২৮.৬ | ২১.১ | ১৪.৯ | ঘধ |

*উৎস: বিবিএস, খানার আয় ও ব্যয় সমীক্ষা, বিভিন্ন বছর।*

চরম দারিদ্র্য শহরাঞ্চলে যেমনি কমেছে তেমনি কমেছে গ্রামাঞ্চলে। শহর-গ্রাম ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে বটে কিন্তু ২০১৬ সালে গ্রামের দারিদ্র্য ছিল শহুরে দরিদ্রের দ্বিগুণ। সম্ভবত এটাই স্বাভাবিক কারণ মূলত বিশাল আকারের চরম দরিদ্র গ্রামেই থাকে। আবার, ২০১০ এবং ২০১৬ সময়কাল, গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্র্য যেখানে দ্রুত হ্রাস পেয়েছে সেখানে শহরাঞ্চলে তা প্রায় একই অবস্থানে রয়ে গেছে। একই সময়কালে চরম দারিদ্র্যের অবিমিশ্র সংখ্যা ২৭ মিলিয়ন থেকে ২১ মিলিয়নে নেমেছে যার অর্থ দাঁড়ায় তুলনীয় সময়ে বাংলাদেশ ৬ মিলিয়ন মানুষকে চরম দরিদ্র্যকে দহন থেকে মুক্তি দিতে পেরেছে। চরম দারিদ্র্য হ্রাসে অগ্রগতি সত্ত্বেও এর বর্তমান সংখ্যা বিচলিত করার মতো।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এখন পর্যন্ত দরিদ্র সংক্রান্ত অনেক সূচকেরই তথ্য সংগ্রহ করেনি যা দ্বারা এসডিজি অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যায়। এর অন্যতম একটা কারণ হতে পারে এই যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এখন পর্যন্ত দারিদ্র্যের সব প্রাসঙ্গিক সূচক সংগ্রহ করে না। তবে, প্রধান ব্যতিক্রম জেন্ডারভেদে দারিদ্র্যের অবস্থানজনিত তথ্য এবং বিবিএস খানা প্রধানের জেন্ডার-ভিত্তিক দারিদ্র্যের যে তথ্য দেয় তা দেখা যেতে পারে (সারণি ১.৪)।

### সারণি ১.৪ খানা প্রধানের জেন্ডার অনুযায়ী দারিদ্র্য প্রবণতা ২০০০-২০১৬ (%)

| | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|
| পুরুষ | | | | |
| জাতীয় | ৪৯.০ | ৪০.৮ | ৩২.১ | ২৪.৮ |
| কহর | ৩৫.১ | ২৮.৭ | ২১.৭ | ১৮.৮ |
| গ্রাম | ৫২.৫ | ৪৪.৯ | ৩৫.৯ | ২৭.১ |
| মহিলা | | | | |
| জাতীয় | ৪৭.২ | ২৯.৫ | ২৬.৬ | ১৯.৯ |
| শহর | ৩৭.১ | ২৪.৪ | ১৭.৫ | ১৯.৭ |
| গ্রাম | ৫০.৬ | ৩১.০ | ২৯.৩ | ২০.০ |

*উৎস: বিবিএস, খানার আয় ও ব্যয় সমীক্ষা, বিভিন্ন বছর*

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা প্রতীয়মান যে, সময়ের বিবর্তনে জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় পর্যায়েই নারী খানাপ্রধান খানার দারিদ্র্যের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে (সারণি ১.৪)। প্রসঙ্গত, নারী-দারিদ্র্যের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের দু'টো দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। এক, যেসব খানার প্রধান পুরুষ, সেসব খানার দারিদ্র্যের প্রকোপ নারী-প্রধান খানার চেয়ে বেশি। দুই, নারী খানা প্রধানের ক্ষেত্রে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৬ নাগাদ আঞ্চলিক সমতা প্রায় অর্জিত হয়েছে। নারী-পুরুষ দারিদ্র্যজনিত বৈষম্যের ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে: বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারীদের হাতে রেমিট্যান্স প্রবাহ পৌঁছা, নারীদের সাহায্যে সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি হয় এবং গ্রামাঞ্চলে মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি উপাদান সম্ভবত নারী খানা প্রধানদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

তবে সময়সাপেক্ষে দারিদ্র্যের ভিন্নতা নিয়েও মানতেই হবে যে, অব্যাহতভাবে দারিদ্র্য হ্রাসের পেছনে শক্তভাবে কাজ করেছে সাম্প্রতিক বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যা বার্ষিক ৭ শতাংশের ওপর গড়িয়েছে। তাছাড়া, দারিদ্র্য হ্রাসে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি ব্যয়, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাইর থেকে আসা রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বিস্তার।

## *সূচক ১.৩.১ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত*

এটা আজ সুবিদিত যে দারিদ্র্য, ঘাতোপযোগিতা এবং প্রান্তিকতা দূর করার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার বহুবিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির (এসপিপিএস) সূচনা করেছে। এই কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত আছে পাবলিক সার্ভিস পেনশন, বিশেষ প্রয়োজনের দাবীদার জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগকালীন সহায়তা, কল্যাণমূলক এবং মানব উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নিবেদিত কর্মসূচি।

২০টি মন্ত্রনালয়ের অধীনে ১৪০টি কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ কর্মসূচির প্রভাবকে দুর্বল করে। এমনকি তা কর্মসূচির লক্ষ্য ও সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে অধিক্রমণের দুয়ার খুলে দেয়। সম্ভবত এ চিন্তা মাথায় রেখে ২০১৫ সালে সরকার জিইডি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস) গ্রহণ করে। এর প্রধান লক্ষ্য এমন একটা সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলা যেটা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, জীবনচক্রের ঝুঁকি অবদমনে অধিকতর কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, সবচেয়ে দরিদ্র ও অরক্ষিতদের অগ্রাধিকার প্রদানে প্রস্তুত থাকবে।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫ থেকে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে বিবিএস সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির (এসএসএনপি) বিস্তৃতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান শুরু করে। পরবর্তী বছরগুলোতে এই কর্মসূচির সংখ্যা বেড়েছে এবং খানা ও সুবিধাভোগী উভয়ের শতাংশ নিরীখেই এসএসএনপির বিস্তৃতি বেড়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০১০ এবং ২০১৬ সময়কালে কর্মসূচি থেকে সুবিধাভোগীদের অনুপাত প্রতিবছর প্রায় আধা শতাংশ পয়েন্ট হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

**সারণি ১.৫ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিস্তৃতি প্রবণতা, ২০০৫-২০১৬ (%)**

| সমীক্ষার বছর | জাতীয় | | শহর | | গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | খানা | কর্মসূচিতে লাভবান | খানা | কর্মসূচিতে লাভবান | খানা | কর্মসূচিতে লাভবান |
| ২০১৬ | ২৭.৮ | ২৮.৭ | ১০.৬ | ১০.৯ | ৩৪.৫ | ৩৫.৭ |
| ২০১০ | ২৪.৬ | ২৪.৬ | ৯.৪ | ৯.৪ | ৩০.১ | ৩০.১ |
| ২০০৫ | ১৩.০৬ | ঘঅ | ৫.৪৫ | ঘঅ | ১৩.০৬ | ঘঅ |

*উৎস: বিবিএস, এইচআইইএস, বিভিন্ন বছর*

## *সূচক ১.৫.১ মৃতের সংখ্যা, নিখোঁজ এবং দুর্যোগে সরাসরি অভিঘাতপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা (প্রতি ১০০,০০০ জনে)*

অনন্য ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশের অবস্থান। দেশটির উত্তরে আছে হিমালয় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তবে প্রধান প্রধান দুর্যোগগুলোর উৎস হচ্ছে নদী যেমন, নদী ভাংগন, হঠাৎ বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন, বড়/উত্তাল ঢেউ, জলাবদ্ধতা, খরা এবং ভূমিধ্বস।

ইদানিং দেশের জন্য ভূমিকম্পও যেন সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশ অন্যতম একটা দেশ যে জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত ঝুঁকির মুখে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে আছে। বলা হয়ে থাকে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সাপেক্ষে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপকতা ও পুনঃপুনঃ সংঘটন বৃদ্ধি পাবে।

তবে বাংলাদেশে সংকট ও সম্ভাবনার সহাবস্থান সবার জানা। বাংলাদেশ সরকার এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকার প্রয়াস নিয়েছে। বিগত বছরগুলোতে একটা বিস্তৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকার কথা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং কম্যুনিটি স্তরে সংগঠনগুলো। এসবের উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুর্যোগ ও

দুর্যোগের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির প্রভাব হ্রাস করা। সুসংবাদ যে, ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৃতের সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। মানবজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শীর্ষক এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ২০১৫ সাল প্রতি এক লাখে ১২,৮৮১ জন জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকিতে আক্রান্ত হয়েছিল।

## *সূচক ১.৫.২ দুর্যোগ-প্রসূত প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতি*

দুর্যোগ-প্রসূত প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে আক্রান্ত এলাকায়, পুরো অথবা আংশিক, ভৌত সম্পদের ক্ষতির আর্থিক মান। এর মধ্যে আছে বাড়ীঘর, স্কুল, হাসপাতাল, বাণিজ্যিক ও সরকারি ভবন, পরিবহন, জ্বালানি, টেলিকম্যুনিকেশনস ও অন্যান্য অবকাঠামো; ব্যবসায়িক সম্পদ এবং শিল্প কারখানা। আরও অন্তর্ভুক্ত আছে ফসলহানি, কৃষি অবকাঠামো এবং গবাদিপশু। কোথাও কোথাও পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতিকেও বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে (ওইসিডি ২০১৬)। বিবিএস-এর এক হিসাব মতে ভিত্তি বছর ২০১৪ সালে দুর্যোগের কারণে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল জিডিপির ১.৩ শতাংশ।

## *সূচক ১.৫.৩ দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসকরণে সেন্ডেই ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণে জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়ন (২০১৫-২০৩০)*

২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচ্যসূচিতে সেন্ডেই ফ্রেমওয়ার্ক (Sendai Framework) প্রথমবারের মতো একটা বড় ধরনের সমঝোতা চুক্তি হিসাবে সামনে চলে আসে। এর উদ্দেশ্য জীবন-জীবিকা এবং স্বাস্থ্যে এবং মানুষের অর্থনৈতিক, ভৌত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশিক সম্পদ, ব্যবসায়ী, কিংবা কম্যুনিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষতি ব্যাপক হ্রাস করা। এই আলোচ্যসূচিতে মোট ৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ৪টি অগ্রাধিকারমূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে। সমঝোতাটি বাধ্যতামূলক নয় (non-binding) তবে প্রত্যাশা করা হয় যে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকারের দায়িত্ব প্রথম হলেও এই দায়িত্বের অংশীদার হিসাবে অন্যান্য অংশীজনদের বেছে নিতে হবে যেমন, স্থানীয় সরকার, ব্যক্তিখাত এবং অন্য অংশীজন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক (২০১৫-২০৩০) এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটা জাতীয় পরিকল্পনা (এনপিডিএম ) প্রস্তুত করেছে (২০১৬-২০২০)।

সূচক ১ক.২ সেবাখাতে সরকারি ব্যয়ের অনুপাত (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা)

এমডিজি সময়কালে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা সৃষ্টি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া কমিয়ে আনা, শিক্ষা-চক্র পূর্ণকরণে উন্নতি এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে। শুধু তাই নয়, দেশটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জনেও কাংখিত কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে। অপরদিকে, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টির ক্ষেত্রের যে কটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে বাংলাদেশ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে তার মধ্যে আছে কম ওজনের শিশুদের প্রাবল্য কমিয়ে আনা এবং <৫ শিশুমৃত্যুহার হ্রাস করা। তবে অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে – যেমন মাতৃমৃত্যু হার এবং অপুষ্টি কমিয়ে আনা – অগ্রগতি ছিল বিভিন্ন মাত্রায়।

এই প্রতিবেদনের অন্যত্র সামাজিক সুরক্ষা এবং এর সম্প্রসারণ-কেন্দ্রিক কিছু কথাবার্তা হয়েছে। এ সমস্ত প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে সরকার বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়োজিত রেখেছে। তার ফলে, এসব খাতে সরকারি ব্যয়ের অবিমিশ্র বর্ধমান ধারা লক্ষ্য করা গেছে যদিও মোট সরকারি ব্যয়ে এদের হিস্যার বার্ষিক ওঠানামা দেখা গেছে। ২০১৫ অর্থবছরে জরুরী এই সেবাগুলোতে সরকারি মোট ব্যায়ে স্বাস্থ্যখাতের অংশ ছিল ৪.৮১ শতাংশ, শিক্ষার ১২.৮২ শতাংশ এবং সামাজিক সুরক্ষার ১২.৭২ শতাংশ। তবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতের হিস্যা ৬.৫৩ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ উঠে ১৫.১৫ শতাংশ। ২০১৬ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অংশ সর্বোচ্চ ১৫.১৫ শতাংশে উঠে। তার পরের বছর থেকে কমতে থাকে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ উঠে ১৫.২৫ শতাংশ ব্যয় হয় ২০১৬-১৭ সালে। মোট কথা, এই তিনটি খাতের সরকারি ব্যয়ে মিশ্র প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা গেলেও ভবিষ্যতে শিক্ষাখাতের অংশ বৃদ্ধি ঘটাতে পারলে ২০২০ মাইলফলকে পৌঁছা যাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

**সারণি ১.৬ মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিভিন্ন সেবায় সরকারি ব্যয় (%)**

| সেবা | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|
| ডশক্ষা | ১৩.৩৯ | ১২.৮২ | ১৫.১৫ | ১৪.৪২ |
| স্বাস্থ্য | ৪.৬০ | ৪.৮১ | ৪.৮০ | ৬.৫৩ |
| সামাজিক সুরক্ষা | ১২.৩০ | ১২.৭২ | ১৩.৬০ | ১৫.২৫ |

*উৎস: অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট তথ্য থেকে হিসাবকৃত*

## ১.৩ এসডিজি ১ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা

দ্রুততর, অন্তর্ভুক্তিমুলক, টেকসই এবং অভিঘাতসহনীয় প্রবৃদ্ধি: একদিকে যেমন বাংলাদেশ দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত কৌশল অবলম্বন করে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রবৃদ্ধি-পথকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সংবেদনশীল এবং রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে পরিপূরক কৌশল ও নীতি গ্রহণ করেছে। প্রবৃদ্ধিকে টেকসই ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল করার লক্ষ্যে নীতিমালাও কার্যকর আছে। চরম দারিদ্র্য হ্রাসে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে অরক্ষিত জনসংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট জীবিকা কর্মসূচি এবং অভিঘাত হ্রাস দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

**সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বিস্তৃতি ও কার্যকারিতা:** দরিদ্র এবং অভিঘাতের মুখোমুখি জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও নাজুকতার দিকে গুরুত্ব দেবার কারণে সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি (এসএসএসপি) দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সাহায্য করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা জাল ব্যবস্থার বলয়ে (এসএসএনএস) বিবিএস জাতীয়-ভিত্তিক খানার ওপর তথ্য-ভিত তৈরি করছে। আশা করা যায় যে, এ কাজটি সুসম্পন্ন হলে প্রকৃত দরিদ্র খানা নির্বাচনে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/এজেন্সির মধ্যকার সমন্বয় সাধনে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

**অভিবাসন ও রেমিট্যান্স:** রেমিট্যান্স শুধু যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটা প্রধান চালক তা নয়, বরং অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল খানার রূপান্তর, গ্রামীন মজুরিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং গ্রামাঞ্চলে উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টিতেও রেমিট্যান্সের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। এতসব ইতিবাচক প্রভাবের বিপরীতে অবশ্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার উদ্বেগ রয়েছে: যার মধ্যে আছে শোষণ, মানবাধিকার খর্ব এবং নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন ইত্যাদি। তবে উদ্বেগ নিরসনে এবং নারীসহ সকল অভিবাসীর নিরাপদ, শৃঙ্খল এবং নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করতে ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড মাইগ্রেশন ২০১৩ এবং ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি ফান্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই অভিবাসন সংক্রান্ত অমানিশার অবসান ঘটবে।

বস্তুত, সরকারি নীতিমালার মূল লক্ষ্য হলো রপ্তানির জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নকে উৎসাহ দেবার পাশাপাশি অভিবাসী কর্মীদের ঝামেলামুক্ত অভিবাসন ও কল্যাণকামী সেবা নিশ্চিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, বিদেশ যাওয়া কর্মীর সংখ্যা শিখরে পৌঁছে ২০১৭ সালে (১ মিলিয়ন) এবং বার্ষিক রেমিট্যান্স প্রবাহ সর্বোচ্চ ১৫ বিলিয়ন ডলার পৌঁছায় ২০১৫ সালে যা ছিল জিডিপির ৭.২ শতাংশ।

**জেন্ডার বৈষম্য:** প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন করা গেলেও শ্রমবাজারে এর প্রতিফলন এখনও তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়। গ্রামীণ শ্রমবাজারে যত বেশি সম্ভব নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ সরকার চায়। অন্য একটা উন্নতি হলো ২০১০ অর্থবছরে পুরুষ-নারী মজুরি অনুপাত ৭৩ শতাংশ থেকে ২০১৪ অর্থবছরে ৭৮ শতাংশ দাঁড়ায় অর্থাৎ, মজুরি বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ এলাকার প্রধান খাত কৃষিতে জেন্ডার বৈষম্য যথাসম্ভব হ্রাস করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

**ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি:** ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বেশ সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যথা: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিমালিকায় ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংক, বিশেষায়িত সরকারি সংগঠন (এনজিও)। পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) নামক শীর্ষ সংগঠনটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণের প্রসার ঘটানো এবং সেটা করতে গিয়ে, অর্থাৎ দরিদ্রের দুয়ারে ক্ষুদ্রঋণ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে, এই সংগঠনটি সহযোগী সংগঠনের (পিও) সাহায্য নিয়ে থাকে।

তবে একথা, সত্যি যে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহে এক হাজারের ওপর প্রতিষ্ঠানে থাকা সত্ত্বেও উপরের দিকের ৫০টি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে রয়ে ৮৭ শতাংশ সদস্য, দখলে আছে বাজার হিস্যার ৭৮ শতাংশ এবং মোট ঋণের ৯১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালে মোট বাইরে থাকা (outstanding) ঋণের ৮৯ শতাংশ এদের কাছ থেকে বাজারে গেছে। যাই হোক, ক্ষুদ্রঋণ বাজার যত বড় হোক কিংবা, বিস্তৃত ও বহুমুখী পণ্য নিয়ে আসুক না কেন, দারিদ্র্য হ্রাসে এর প্রভাব বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সম্প্রতি এক অধ্যয়ন দেখিয়েছে যে, দু'দশক ধরে বিস্তৃত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলো দারিদ্র্য হ্রাস ও আয় বর্ধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এবং সেসব সুফল ধরে রাখতেও পেরেছে। এই সময় ক্ষুদ্রঋণ গ্রামীণ মোট দারিদ্র্য হ্রাসে ১০ শতাংশের জন্য দায়ী অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো ১০ শতাংশ দরিদ্রকে দারিদ্র্য রেখার উপরে তুলতে সাহায্য করেছে (খন্দকার ও অন্যান্য ২০১৬)।

### একটি বাড়ী, একটি খামার প্রকল্প: দারিদ্র্য লাঘবে একটা আদর্শ

একটি বাড়ি একটি খামার বর্তমান সরকারের নেয়া একটা প্রকল্প। এর মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ এলকায় পুঁজি সংঘটন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য লাঘব ও টেকসই উন্নয়ন সাধন করা। যেসব গ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি রয়েছে তার সাথে এই প্রকল্পের পার্থক্য এই যে, প্রকল্প থেকে সমপরিমাণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় সাহায্য দিয়ে মোট সঞ্চয় উৎসাহিত করা হয়। অথচ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে এটা একেবারেই অনুপস্থিত। এই প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের মধ্যে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও হত-দরিদ্র এবং ভিক্ষুক দ্বারা গ্রামীণ উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারা বাংলাদেশে সব জেলায় এই প্রকল্পের অস্তিত্ব রয়েছে এবং ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত মোট ভিডিওর সংখ্যা ৭৫,৫৩১; তালিকাভূক্ত মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩.৬১ মিলিয়ন খানা যা ৬ মিলিয়নে নেবার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। এই ৬ মিলিয়নের মধ্যে আবার অর্ধেক চরম দরিদ্র। এই প্রকল্প দরিদ্র খানার আয় ও স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবার ১৫ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নেমেছে বলে অনুমান করা যায়। আর এই প্রকল্প শেষ হবার পরও যাতে প্রভাব অব্যাহত থাকে সে জন্য রুর‍্যাল সেভিংস ব্যাংক নামে একটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্ভবত এটাই বিশ্বে প্রথম ব্যাংক যা দারিদ্র্যের জন্য শতভাগ অনলাইন সেবা উৎসর্গ করে।

**আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রবর্তন:** গরিবের জন্য অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি দারিদ্র্য হ্রাসে প্রধান সহায়ক। যেসব দরিদ্র প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অর্থায়ন থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু নবধারামূলক উপায় বের করেছে। এর মধ্যে আছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান, মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে অন্তত অর্ধেক গ্রামাঞ্চলে স্থাপনের নির্দেশ, এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা এবং কৃষকদের জন্য ১০ টাকায় সঞ্চয় হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা। প্রসঙ্গত, দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি খুব দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রস্তুত করছে।

**বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসূচক (এমপিআই) ব্যবহার:** দারিদ্র্য অবসানের অগ্রগতি অনুসরণে এমপিআই সূচক অধিকতর উপযোগী বলে ধারণা করা হয়। এটা ইউএনডিপি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির যৌথ প্রয়াস। এমপিআই পরিমাপ ব্যবহার যাতে দক্ষতার সাথে করা যায় সেই জন্য যথাসাধ্য বিনিয়োগ করবার জন্য বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা করছে। এটা করা গেলে আর্থিক পরিমাপের পরিপূরক হিসাবে অধিক্রমণ বঞ্চনাগুলো, যা ব্যক্তিবিশেষ একই সময় মুখোমুখি হয়, বিবেচনায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

**সামাষ্টিক অর্থনীতিক পরিবেশ:** বাংলাদেশ নিরলসভাবে সামষ্টিক অর্থনীতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে আসছে এবং দৃঢ়তার সাথে বলা চলে যে, এই স্থিতিশীলতা দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। সামষ্টিক অর্থনীতিক স্থিতিশীলতার সাথে উঁচু হারে প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীল এক ডিজিট মূল্যস্ফীতি, নিম্ন বাজেট ঘাটতি এবং বহি:ভারসাম্যের উন্নতি ইত্যাদি দারিদ্র্য নির্মূলের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

## ১.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

দারিদ্র্য হচ্ছে একটা বহুমাত্রিক ধারণা এবং এটা মোকাবেলা করতে গেলে যে সরকারের সর্বাত্তকরণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এসডিজির নানামুখী লক্ষ্যমাত্রার জন্য মন্ত্রণালয়গুলো বন্টন করতে গিয়ে দেখা গেল ৪৪টি মন্ত্রণালয়/ডিভিশন এই অভীষ্ট অর্জনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর মধ্যে কার্যকর সংযোগ সফলতার পথে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাছাড়া:

- সম্পদ আহরণ বিশেষত বহি:সম্পদ আহরণ একটা বড় চ্যালেঞ্জ।
- জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধি ও দক্ষতার পথে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা।
- তথ্য উপাত্ত সংঘটনকল্পে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি করা দরকার যাতে করে এসডিজি ১ অগ্রগতির গতিবিধি নজরদারি ও গুনগত তথ্য-প্রাপ্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে অন্যান্য উৎসের সাথে তুলনা করা যায়।
- বাংলাদেশে বহু খানা আছে যারা দারিদ্র্যরেখার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বিধায় ছোট-খাটো ধাক্কায় দারিদ্র্য রেখার নিচে পড়ে যায়। এর ফলে এ যাবৎকালের অর্জিত সুবিধা হারিয়ে দারিদ্র্যে গুহায় নিপতিত হয়।
- বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চলে ঘনঘন বন্যা, খরা, সাইক্লোন, শিলাবৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এসডিজি ১ বাস্তবায়ন বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে মনে করা হয়ে থাকে।

## ১.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

**প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বহুমুখীতা:** ২০১৭ অর্থবছরে শ্রমশক্তির সংখ্যায় এক নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটে যখন ১.৪ মিলিয়ন নতুন কর্মী শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। এর বিপরীতে, ২০১৩-২০১৬ সময়কালে শ্রমবাজারে নবাগতদের সংখ্যা ছিল গড়পড়তা প্রায় আধা মিলিয়ন। সুতরাং, চ্যালেঞ্জটা ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সেই লক্ষ্যে অর্থনীতিতে উৎপাদনক্ষম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আগত শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে বলে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা চিন্তা করছে। প্রত্যাশা করা যায় যে সরকারি ও বেসরকারি এবং বৈদেশিক উৎস থেকে আসা বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ ঘটার মাধ্যমে উঁচু প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং তা উপচে পড়বে দরিদ্রের দুয়ারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যথা: দক্ষতার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, শ্রমদক্ষতা উন্নীতকরণ, নিয়ন্ত্রণকারী বাধাগুলো কমিয়ে আনা এবং জ্বালানি সহায়তা নিশ্চিত করা। কোনো কোনো বলয় থেকে এটি বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি যা বোধ হয় ঠিক নয়। এঠা ঠিক যে প্রত্যাশিতভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আন্ত:খাত পার্থক্য রয়েছে- কেউ এগিয়ে, কেউ পিছিয়ে – তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে খাতগুলোতে মোটামুটি ইতিবাচক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমশক্তি সমীক্ষা (এলএফএস) থেকে তথ্য নিয়ে দেখানো যায় যে, ২০১৩ এবং ২০১৫/১৬ সময়কাল ১.৪ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং আরও ১.৩ মিলিয়ন সৃষ্টি করা গেছে ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ সালে। পরিবর্তনের শতাংশ হিসাবে ২০১৩ এবং ২০১৫/১৬ এর মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বার্ষিক হার ছিল ১ শতাংশ আর ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ এর মধ্যে সেই হার ছিল ২.২ শতাংশ (ইকবাল ও পাবন ২০১৮)।

তবে স্বীকার করতেই হয়ে যে, সামনের দিকে পা বাড়াবার পথ বন্ধুর। আর সেজন্যই অতীতের মতন সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন মাত্রায় বহুমুখীতা অর্জন। খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জোর দেয়া অব্যাহত থাকবে সন্দেহ নেই, তবে কৃষি বহুমুখীকরণ অধিকতর গুরুত্ব পাবে। আর সেটা হবে একদিকে ভূমি ও শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে, এবং অন্যদিকে গুনগত উপকরণ, যথাযথ যান্ত্রিকতা এবং অবকাঠামো নিশ্চিত করার মাধ্যমে। এরি মাঝে বিনে পয়সায় ভোজ (রেন্ট সিকিং) প্রবণতা, অর্থাৎ কোনো কাজ-বাজ না করে খাজনা আদায়ের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা না গেলেও অন্তত হ্রাস করতে হবে। অপরদিকে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে তৈরি পোষাকের অব্যাহত সফলতার ওপর গুরুত্বারোপ চলবেই এবং একই সাথে অন্যান্য সম্ভাব্য শ্রম-নিবিড় কর্মকাণ্ড যথা: চামড়া, জুতা, প্লাস্টিকস, খেলনা, ইলেক্ট্রনিকস, পাটজাত দ্রব্য এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সমৃদ্ধ করবার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া শ্রম রপ্তানি অতীতের মতোই যথাযথ গুরুত্ব অব্যাহত থাকবে তবে নতুন চিন্তায় আসন নেবে বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিরাপদ অভিবাসন। সবশেষে, ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্লাস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে পারলে এগুলো কর্মসংসস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

**মানব পুঁজির উন্নয়ন:** সব ধরনের শিক্ষায় আয়-ভিত্তিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে বেশ বড় উন্নতি যে একটা সুখবর তা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে এখনও বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ অবারিত করতে হবে। ইদানিং গুরুত্ব পাচ্ছে গুনগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি কেননা কেবলমাত্র গুনগত শিক্ষা দক্ষতা বৃদ্ধি করে দরিদ্র শিশুদের দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে। আবার শুধু আয় বৈষম্য নয়, শিক্ষায় বিদ্যমান অন্যান্য বৈষম্যের- যথা- অসামর্থতা ও নৃতাত্ত্বিক কারণে বৈষম্যের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। সবশেষে, সঙ্গত করণেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে গুণগত শিক্ষা প্রসারের জটিল ব্যাপারটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে এবং সেটা দূরীকরণে যথাযথ এবং যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

**বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নীতকরণ:** বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকারকে আরও বেশি সচেষ্ট ও সক্রিয় হয়ে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ-বৈরি বাধাগুলো একেবারেই অজানা নয় যেমন: জমি অধিগ্রহণ, জ্বালানি ঘাটতি, বাণিজ্য সংক্রান্ত লজিস্টিকস, চুক্তি কার্যকরীকরণ এবং কর সংক্রান্ত বিষয় দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি ইত্যাদি। যদিও সুবিদিত যে দীর্ঘমেয়াদে এগুলোর সমাধান সম্ভব, তারপরও যতটুকু সম্ভব স্বল্পমেয়াদে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব। একই সাথে অবকাঠামো, জ্বালানি ঘাটতি পূরণে এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত লজিস্টিকস উন্নয়নে বড় ধরণের বিনিয়োগ যে প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য।

**সামাজিক সুরক্ষা:** সামাজিক সুরক্ষার জন্য সরকার একটা বহু-বিস্তৃত কৌশল হাতে নিয়েছে যার নাম জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)। এটা বাস্তবায়ন করা গেলে তিনটি লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে – চরম দারিদ্র্য, ঘাতপযোগিতা এবং বৈষম্য হ্রাস। তাছাড়া, দরিদ্রদের জন্য সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকল্পে বিদ্যমান সরকারি কর্মসূচির মধ্যে আছে সবচেয়ে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিকল্পে কর্মসূচি (ইজিপিপি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (ইএফডব্লিউ) এবং জাতীয় সেবা কর্মসূচি (এনএস) ইত্যাদি। আশা করা যায় সবচেয়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগুলো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

**ধাক্কা/অভিঘাত নিবারণ ও হ্রাসকরণ:** সমাজের বিশেষত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের ধাক্কার/অভিঘাতের মুখোমুখি হতে হচ্ছে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আয়, সম্পদ এবং স্বাস্থ্যজনিত ধাক্কা। এই ধাক্কার ফলে একজন গরিব আরও গরিব হতে পারে অথবা চরমদরিদ্র কিংবা নিঃস্ব বনে যেতে পারে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসের হার আরও দ্রুততর হতে পারতো যদি না দরিদ্র খানার মধ্যে এ ধরনের আভিঘাত অনুপস্থিত থাকতো। সরকার এ ধরনের অভিঘাত অপসারণ বা অবদমনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং নিচ্ছে যার কিছু সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে।

## ১.৬ সারাংশ

প্রতিদিন ১.৯০ ডলারের নিচে বা জাতীয় দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে পরিমাপকৃত চরমহত দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি সন্তোষজনক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় (অন ট্র্যাক)। তেমনি, সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি ও বিভিন্ন সেবায় যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি ব্যয় মোট ব্যয়ের তুলনায় যথাযথ (অন ট্র্যাক) রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে উচ্চমৃদু দারিদ্র্য রেখার দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হ্রাস সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে বলে মনে হয় না। তবে একথাও ঠিক যে, যেমনটি সাম্প্রতিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, যদি প্রত্যাশিত ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় এবং বর্ধিত আয় বৈষম্য দারিদ্র্য হ্রাসে প্রবৃদ্ধির প্রভাবকে দুর্বল না করে, তা হলে ২০২০ মাইলফলক অর্জন করা সম্ভব। এবং তা যে সম্ভব তার প্রমাণ অতীতের অর্জন – মাথাগণনা সূচকে ২০১৬ সালে দারিদ্র্যর প্রকোপ ছিল ২৪.৩ শতাংশ আর ২০১৭ সালের হিসাবকৃত হার ২৩.১ শতাংশ।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরসনে সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আছে তরান্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অভিঘাতসহনীয় প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষার বিস্তার ও কার্যকারিতা, জেন্ডার সমতা অর্জন, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রসার, ব্যাপ্তি ও বহুমুখীতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রদান, এবং স্থিতিশীল সামাষ্টিক অর্থনীতি। তবে সাফল্যের সূর্যের আলো ম্লান করে দিতে পারে এমন চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে: সম্পদ বিশেষত বৈদেশিক সম্পদ সন্নিবেশ, এনএসএসএস বাস্তবায়ন, বিবিএস এর দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে পেশাগত উৎকর্ষতা, এবং অভিঘাত জনিত কারণে অধিকতর কিংবা চরম দারিদ্র্যে পিছলে পড়া বন্ধ করা। মোটকথা, বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১ অর্জনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে যার মধ্যে গুরুত্ব পাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, মানবপুঁজির উন্নয়ন, ব্যক্তি বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নীতকরণ এবং বিভিন্ন অভিঘাত/ধাক্কার তীব্রতা উপশমন।

২

# ক্ষুধা মুক্তি

## ক্ষুধার অবসান, খাদ্যনিরাপত্তা অর্জন এবং উন্নত পুষ্টিমান ও টেকসই কৃষি প্রবর্তন

## ২.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

২০১৪-২০১৬ সময়কালে সারা বিশ্বে ৭৯৩ মিলিয়ন মানুষ যার অর্থ প্রতি ৯ জনের মধ্যে ১জন অপুষ্টিতে আক্রান্ত ছিল। ক্ষুধার সবচেয়ে বড় বোঝা বহন করে দক্ষিণ এশিয়া যেখানে ২৮১ মিলিয়ন মানুষ (মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ) অপুষ্টির কারণে ধুকেধুকে মরে। ক্ষুধা ও অপুষ্টির নির্মূল এবং যথেষ্ট নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যে সুযোগ নিশ্চিত করা এসডিজি ২-এর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে টেকসই খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি ও অভিঘাতসহনশীল কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা ও ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদকের আয় দ্বিগুণ করতে হবে। বস্তুত, ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দরকার এমন টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা বা কর্মকাণ্ড যা জৈববৈচিত্র ও জেনেটিক রিসোর্স রক্ষা করতে সক্ষম হয়, এবং তার জন্য প্রয়োজন হবে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ সেবায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। তবে খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনের ফলশ্রুতিতে সরবরাহ বা প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে মাত্র কিন্তু উন্নীত খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন বাণিজ্য বিধিনিষেধ হ্রাস ও রপ্তানি ভর্তুকি এবং সমপ্রভাবের রপ্তানি পদক্ষেপ উঠিয়ে দিয়ে একটা দক্ষ খাদ্য-বাজার সৃষ্টি করা। তাছাড়া, দক্ষ ও কার্যকর পর্যাপ্ত বাজার গড়ে তুলতে হলে বাজার সংক্রান্ত তথ্যের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

## ২.২ সূচকের মাধ্যমে এসডিজি ২ অগ্রগতি পর্যালোচনা

### *সূচক ২.১.১ অপুষ্টির ব্যাপকতা*

আন্ত:বংশীয় দারিদ্র্য প্রসারে যে সমস্ত উপাদান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে তার মধ্যে অপুষ্টি অন্যতম। অল্প বয়সে অপুষ্টির কারণে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাবার প্রস্তুতি এবং কিছু শেখার ক্ষমতা খর্ব হয়; এমনকি প্রাপ্ত বয়সে ঝুঁকিপূর্ণ রোগেশোকে কাতর হয়ে পড়ে। নাজুক ও রুগ্ন একজন মানুষ পূর্ণকালীন সময় কাজ করতে পারে না বলে তার আয় কম থাকে। তাছাড়া, অপুষ্টির অন্যতম পরিণতি হিসাবে চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত খরচ খানার বাজেটকে সংকুচিত করে দারিদ্রাবস্থার অবনতি ঘটায়। অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে অপুষ্ট শিশু জন্ম দেবার সম্ভাবনা বেশি থাকে বিধায় শিশুটির জীবন-চক্র উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব রাখে। এক হিসাবে দেখা যায়, অপুষ্টিজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর যে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি হয় তার আর্থিক দাম ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক। এর সাথে, যদি স্বাস্থ্য পরিচর্যা খরচ বিবেচনায় নেয়া হয়, তা হলে অংকটা যে আরও বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, ২০১৬ সালে মোট জনসংখ্যার ১৬.৪ শতাংশ অপুষ্ট ছিল যার অর্থ এ দেশে প্রায় ২৬ মিলিয়ন মানুষ অপুষ্টির শিকার (এফএও ২০১৬)।

**সারণি ২.১: ১৫-৪৯ বয়স্ক বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টি (%)**

| | ১৯৯৬-৯৭ | ১৯৯৯-০০ | ২০০৪ | ২০০৭ | ২০১১ | ২০১৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃশতা | ৫২ | ৪৫ | ৩৪ | ৩০ | ২৪ | ১৯ |
| অতিশয় স্থূলতা | ৩ | ৫ | ৯ | ১২ | ১৭ | ১৯ |

*উৎস: নিপোর্ট, বিডিএইচএস, বিভিন্ন বছর।*

একদিকে কম পুষ্টি ও অন্যদিকে বেশি ওজন, উভয় সমস্যাই নারীর ক্ষেত্রে বেঁচে থাকা ও স্বাস্থ্য সূচক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। বাংলাদেশে কৃশতায় আক্রান্ত নারীর অনুপাতের প্রবণতা নিম্নগামী অথচ অতিশয় স্থূল নারীর অনুপাত উর্ধ্বমুখী (সারণি ২.১)। যদি ২০১১ এবং ২০১৪ সালের নিম্নগামীতার হার ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে, তা হলে ২০২০ নাগাদ অপুষ্ট নারীর অনুপাত দাঁড়াবে ৯ শতাংশের মতো। যাই হোক, যেহেতু এ সর্ম্পকিত কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল না তাই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা নিয়ে আপাতত কিছু বলা যাচ্ছে না।

***সূচক ২.২.১: ৫ বছর নিচে শিশুর মধ্যে খর্বতার ব্যাপকতা (বয়স তুলনায় উচ্চতা <২ বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি)***

বয়সের প্রেক্ষিতে উচ্চতার পরিমাপ একজন শিশুর রৈখিক বেড়ে উঠার দিকে ইংগিত করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সূত্র অনুযায়ী, যদি কোনো শিশু বয়সের জন্য উচ্চতা নিরীখে মধ্যমা বা মধ্যবর্তী মান-এর চেয়ে দুই ষ্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নিচে থাকে (-২ এসডি) তা হলে বুঝতে হবে বয়সের তুলনায় শিশুটির যে উচ্চতা থাকা দরকার তা নেই। আর তাই সে খর্বকায় বা ষ্ট্যানটেড। দীর্ঘকাল ধরে পর্যাপ্ত পুষ্টি অভাবের প্রতিফলন বা ফলাফল হচ্ছে খর্বতা এবং পৌণঃপুনিক ও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার কারণে এর অবণতি ঘটে। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছে যেমন, ১৯৯৬-৯৭ সময়কালের খর্বকায় শিশুর অনুপাত ৬০ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে (বিডিএইচএস ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০১৪)।

**সারণি ২.২: পাঁচ বছরের নিচে শিশুর পুষ্টিগত অবস্থানের প্রবণতা, ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৪ (%)**

| নির্দেশক | ১৯৯৬-৯৭ | ১৯৯৯-২০০০ | ২০০৪ | ২০০৭ | ২০১১ | ২০১৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খর্বিত বিকাশ | ৬০ | ৪৫ | ৫১ | ৪৩ | ৪১ | ৩৬ |
| রুদ্ধ বিকাশ | ১৭.৭ | ১০ | ১৫ | ১৭ | ১৬ | ১৪ |

*উৎস: এআইপিওআরটি, বাংলাদেশ জনমিতিক ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা, বিভিন্ন বছর।*

### *সূচক ২.২.২: পাঁচ বছরের নিচে শিশুর মধ্যে পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা*

বয়সের প্রেক্ষিতে ওজন পরিমাপ করলে পাওয়া যায় ব্যপ্তির প্রেক্ষিতে শরীরের ভর এবং এটা একটা শিশুর বর্তমান পুষ্টিগত অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে। যে শিশু বয়সের প্রেক্ষিতে তার ওজনে সুপারিশকৃত মধ্যমা বা মধ্যবর্তী মান এর দুই ষ্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (-২ এসডি) নিচে থাকে, তাকে রুদ্ধ বিকশিত বা ওয়েসটেড বলে বিবেচনা করা হয়। এই ধরনের অবস্থানকে অতি সাম্প্রতিক পুষ্টির তীব্র ঘাটতির প্রতিফলন বলে ধরে নেয়া হয়। আমাদের দেশে খাদ্য, শাকসব্জি ও প্রাণী -প্রোটিনের উৎপাদন বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও সময়ের বিবর্তনে শিশুদের মধ্যে উঁচুমাত্রায় অপুষ্টির অবসানে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। যাই হোক, উঠানামা নিয়ে কৃশকায় শিশুদের অনুপাত ১৯৯৯-২০০০ সালের ১০ শতাংশ থেকে ২০০৭ সালে সর্বোচ্চ ১৭ শতাংশে পৌঁছায় এবং তারপর থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ১৪ শতাংশে।

### *সূচক ২.৫.২: ঝুঁকিগ্রস্ত, ঝুঁকিবিহীন বা বিলুপ্তি ঝুঁকির অজানা পর্যায়ভুক্ত এমন শ্রেণীবিন্যাসে স্থানীয় প্রাণীজাতের অনুপাত*

গাছ এবং প্রাণীর বংশানুগতি সম্বন্ধীয় বৈচিত্র্য ধরে রাখতে পারার বেশ কটা সুবিধা আছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা উদীয়মান জলবায়ুর পরিবর্তন, রোগবালাই ও পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক ইত্যাদি উপদান বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মকে নতুন প্রাণিজগত সংরক্ষণ কিংবা উদ্ভাবনে সাহায্য করতে পারে। আর তাই জানা দরকার কোন স্থানীয় প্রাণিজাত ঝুঁকিতে, ঝুঁকিবিহীন কিংবা বিলুপ্তির পথে রয়েছে এবং সে সম্পর্কিত প্রবণতা জানাও জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ৪৭ প্রকার শস্যের প্রজাতি হুমকির মুখে, ৩৫ ল্যান্ডরেস শস্য এবং ১৭ ধরনের মাছের প্রজাতি বিলুপ্তি ঝুঁকিতে রয়েছে।

### *সূচক এসডিজি ২.ক.১: সরকারি ব্যয়ের জন্য কৃষি পরিস্থিতির সূচক বা এগ্রিকালচারেল অরিয়েন্টেশন ইনডেক্স (এওআই)*

সকল উন্নয়নশীল বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশে এসডিজি ২ অর্জনকল্পে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। আর এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের পরিপূরক হিসাবে সরকারি বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহায়তামূলক নীতিমালা, সংস্কার এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কৃষিতে প্রযুক্তির প্রসার ঘটাবার জন্য বাংলাদেশের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারি ব্যায়ে কৃষিমুখীতা সূচকের (এওআই) মাধ্যমে অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষিতে সরকারি ব্যয়ের প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।

এওআই হচ্ছে কৃষিতে সরকারি ব্যয় ও অর্থনীতিতে কৃষির অবদানের অনুপাত যেখানে কৃষি মানে শস্য, বন, মৎস এবং শিকার সংক্রান্ত খাত। এওআই হিসাবের সূত্র নিম্নরূপ; কৃষিতে (কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়/মোট সরকারি ব্যয়/(কৃষি মূল্যসংযোজন/জিডিপি))। এওআই এর মান ১-এর বেশি হলে বুঝতে হবে অর্থনীতিতে কৃষির অবদানের তুলনায় সরকার কৃষিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অপরপক্ষে, ১-এর কম হলে ধরে নেয়া হয় যে কৃষির তুলনায় অন্যান্য খাত সরকারের কাছ থেকে অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে।

**সারণি ২.৩: বাংলাদেশে কৃষিমুখীতা সূচকের প্রবণতা, ২০০১-২০১৫**

| | ২০০১ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এঅআই | ০.২০ | ০.২৮ | প্রাপ্ত নয় | ০.৫২ | ০.৫৮ | ০.৭৮ | ০.৫৬ | ০.৫৩ |

*উৎস: এফএও*

অনতুন সহস্রাব্দের শুরুতে বাংলাদেশ সরকারি ব্যয়ের কৃষিমুখীতাসূচক অপেক্ষাকৃত কম ছিল তবে তা ২০০৮ সালে লাফিয়ে উঠে ০.৫০-তে। স্মর্তব্য, বিশ্ব ওই বছরটিতে খাদ্য দামে তীব্র উর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রত্যক্ষ করে এবং তীর্যক এই মূল্যবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারি প্রচষ্টার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। সম্ভবত সে কারণে সরকারি বরাদ্দে কৃষিখাত নজর কাড়তে সক্ষম হয়। যাই হোক, ২০১৩ সাল ব্যতীত, যখন এওআই সর্বোচ্চ ছিল ০.৭৮, এর মান প্রায় ০.৫০-এ ঘুরপাক খায় (সারণী ২.৩)। তার অর্থ, অর্থনীতিতে অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ যতটুকু বিনিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্ব পাওয়া উচিত তার অর্ধেক পেয়েছে কৃষি। অন্যদিকে, এর অর্থ আরও এই যে, বাজেট বরাদ্দে অ-কৃষি খাত অধিকতর গুরুত্ব পায়।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যেখানে অর্থনীতিতে কৃষির অংশ অপেক্ষাকৃত বেশি সেখানে এর মান কম; বিপরীতে, উন্নত দেশগুলোতে জিডিপিতে কৃষির অবদান কম অথচ সেখানে এর মান বেশি। যাই হোক, একথা মনে রাখতে হবে যে, এওআই এর সাথে অপুষ্টিজনিত পরিস্থিতির সুশৃঙ্খল কোনো সম্পর্ক নেই। একই মাত্রায় অপুষ্টি নিয়ে দেশভেদে এওআই মান ভিন্নতর হতে পারে। সুতরাং, এওআই'র অনন্য কোনো মান নেই নয় তবে এটা বলা প্রয়োজন যে খুব ছোট মান টেকসই পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা এমনকি কৃষি গবেষণা ও অবকাঠামোর জন্য ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে।

### *সূচক ২.ক.২: কৃষিখাতে মোট সরকারি অর্থ প্রবাহ (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা এবং অন্যান্য সরকারি প্রবাহ)*

কৃষিতে প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয়ের জন্য উন্নত দেশগুলোর উচিত অনুন্নত দেশগুলোতে পর্যাপ্ত সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। কারণ, এসব দেশের কৃষিতে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীন সম্পদ ও প্রত্যাশিত সরকারি বিনিয়োগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিখাতে সরকরি প্রবাহের প্রবণতায় উঠানামা আছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের কৃষি খাতে মোট সরকারি সাহায্য প্রবাহ সর্বোচ্চ ৩৬৩মিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌছায় কিন্তু তারপর ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে (সারণি ২.৪)। তবে সাহায্য প্রাপ্তির উঠানামা স্বত্বেও বাংলাদেশের কৃষিখাত এখনও বড় দাগে সাহায্য প্রবাহ আকৃষ্ট করতে পারে যদি উন্নয়ন অংশীদারগণ তাদের সাহায্য নীতি এসডিজির সাথে সমন্বিত করতে সমর্থ হয়।

**সারণি ২.৪: কৃষি খাতে মোট সরকারী প্রবাহ (সরকারী উন্নায়ন সাহায্য ও অন্যান্য সরকারী প্রবাহ), ২০১২ থেকে ২০১৭ (মিলিয়ন ইউএস ডলার)**

| বছর | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট সরকারী প্রবাহ (ঋণ এবং সাহায্য) | ৩৪.৯৯ | ৬৫.০১ | ৩৬৩.০২ | ২১০.৫৭ | ১৭৭.৮৩ | ১৯২.৫৮ |

***উৎস: এআইএমএস ওয়েব পোর্টেল, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ***

## ২.৩ এসডিজি ২ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা

### *অপুষ্টি বিষয়ক পদক্ষেপ*

পুষ্টি অধ্যয়ন ও গণসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে দি ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ এন্ড নিউট্রিশন (আইপিএইচএন) কে প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নিয়মিত পুষ্টি সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পুষ্টি কর্মসূচিকে ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস (জাতীয় পুষ্টি সেবা) নামে একটা কার্যকর প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবাহিত করা হয়। কৃষিমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন উদ্ভাবিত পুষ্টি উপাদান-সমৃদ্ধ ফরটিফাইড বিভিন্ন শস্যের জন্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা। গোল্ডেন রাইস নামে বিটা কেরোটিন (ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট) সমৃদ্ধ একটা চালের উদ্ভাবন সম্ভবত এ যাবৎকালের বড় অর্জন যা উপযুক্ত এলাকায় বিতরণ করা হচ্ছে।

আন্তঃবংশীয় স্বাস্থ্য প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশে বহুমাত্রিক প্রবেশ পথ রয়েছে। এর মধ্যে আছে শিশু/মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি, খাদ্যের মান ও খাদ্য বহুমুখীতা। বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো ব্যবহার করে গর্ভবতী, স্তন্যদানকারী মহিলা ও কিশোরীদের মধ্যে আয়রন ঘাটতি তথা রক্তস্বল্পতা দূর করতে আয়রন ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে বিতরণ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, শিশুদের জন্য ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ অব্যাহত আছে। স্তন্যদুগ্ধ পানকারী নবজাতকদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' অবস্থার উন্নতিকল্পে পোস্টপারটাম ভিটামিন-এ বিতরণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। লবন আয়োডিনযুক্তকরণ পদক্ষেপে শক্তিশালী করা হয়েছে। ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য জিংক পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রচার করা হয়েছে। আন্ত্রিক জীবানু চিকিৎসা সম্প্রসারণ করা হয়েছে যার মধ্যে আছে এলবেনডেজল ট্যাবলেট এবং তার সাথে কৃমি দূরীকরণ কর্মসূচি বিবেচনাধীন রয়েছে। শিশু অসুস্থতার সুসংহত ব্যবস্থাপনার (আইএমসিআই) বিস্তৃতির সাথে সাথে আশা করা যায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে জিংক ট্যাবলেট বিনামূল্যে বিতরণ করার কথা বিবেচনাধীন রয়েছে।

ছয়মাস পর্যন্ত নবজাতকের একচেটিয়া স্তন্যদুধ পেতে সাহায্য করার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে কর্মজীবি মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। আশা করা যায় এই পদক্ষেপ নবজাতকের পুষ্টিজনিত অবস্থানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে চলেছে।

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস) অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এই কৌশলের মধ্যে আছে অরক্ষিত মহিলাদের পুর্নগঠিত সুবিধা (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি এবং শিশুদের জন্য ভাতা বৃদ্ধি সুসংহত করা। তাছাড়া, সরকার ইতোমধ্যে ফরটিফাইড চাল বিতরণ, অরক্ষিত মহিলাদের জন্য নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান এবং ভিজিডি কর্মসূচিতে বিসিসি পুষ্টির প্রসার ঘটিয়ে চলছে।

শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পুষ্টিসংক্রান্ত উন্নতিতে প্রভাব ফেলতে পারে পানির গুণগত মান। বস্তুত পুষ্টিজনিত অবস্থান পানির মান দ্বারা বেশ শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত। তেমনি গুরুত্বপূর্ণ পয়ঃনিস্কাশন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি। এই তিনটি কর্মকাণ্ডকে 'ওয়াশ' বন্ধনীতে ফেলা যায়। আবার, 'ওয়াশের' এই তিন অংশের মধ্যে পয়ঃনিস্কাশনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে। তারপর আছে নিরাপদ পানি। অবশ্য অভিযোগ আছে যে পানি আর্সেনিক দ্বারা কিছুটা দূষিত তবে তা এখনও ব্যক্তি শিশু স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য বিপদরেখার অনেক নিচে আছে। সম্প্রতি এক অধ্যয়নে দেখা গেছে যে, শিশু পরিচর্যাকারীদের মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশ যথাযথভাবে হাত-মুখ পরিস্কার করার জন্য পদক্ষেপ নেয় এবং দুঃখজনকভাবে, এমনকি সম্পদশালী গোষ্ঠীর মাত্র ৩৩ শতাংশ ঠিকমতো হাত পরিস্কার রাখে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে খানা এবং কমিউনিটি স্তরে একটা প্রধান করণীয় হলো সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যাপক প্রচার চালানো।

## ২.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের প্রভাবের প্রেক্ষিতে কৃষিতে, বিশেষ করে খাদ্যখাতে, প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার কাজটি বেশ কঠিন হয়ে পড়তে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। অবশ্য বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, যা ২০১৮ সালে ৪ সেপ্টেম্বর অনুমোদিত হয়, এক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সাহায্য করতে পারবে বলে ধারণা করা হয় কারণ, বদ্বীপ পরিকল্পনায় এ ধরনের নানামুখী ভবিষ্যত ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুতির কথা বলা আছে যেমন, জলবায়ুর পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে পরিকল্পাকে আরও বেশি সংগতিপ্রবণ ও গতিময় হতে সাহায্য করা। যাই হোক সন্দেহ নেই যে, বদ্বীপ পরিকল্পনা ভবিষ্যত অনিশ্চিয়তা বিবেচনায় নিয়ে সংগতিপ্রবণ ও গতিময় হবে, তবে সেটা বাস্তবায়নে বিরাট চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে।

দেশের সর্বত্র ক্ষুধাজনিত পরিস্থিতি এক নয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০-১৬ সময়কালে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য প্রকোপে খুব প্রান্তিক পরিবর্তন ঘটেছে অথচ এই বিভাগের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্যে নিপতিত এবং ৩০ শতাংশ চরম দরিদ্র। সেখানে এখনও এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু খর্বতায় আক্রান্ত। খাদ্য ঘাটতির সময়ে এখানে এখনও পুরুষের তুলনায় নারী দুর্ভোগের শিকার হয় বেশি অর্থাৎ নারী খাদ্য-বঞ্চনার শিকার হয় অধিকমাত্রায়।

সুতরাং বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে যাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে তাদের মধ্যে আছে দরিদ্র, অরক্ষিত ও আক্রান্ত মানুষের মধ্যে অভিঘাত সহনশীলতা সৃষ্টি করতে হবে। তারা যেন দারিদ্র্যের গুহার থেকে উঠে এসে আবার কোনো ধাক্কায় পিছলে পড়তে না পারে সেজন্য নমনীয় ও তীব্র অভিঘাত যথা: খরা, সাইক্লোন, বন্যা ইত্যাদির মুখোমুখি হবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এরিমধ্যে আবার নগরায়নের প্রেক্ষিতে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে যা নগর জীবনের জন্য অনন্য না এই শহর জীবনের সাথেই সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে আছে (ক) নিরাপদ খাদ্যের অভাব (খ) বিশেষত মহিলাদের মধ্যে অতিশয় স্থূলতা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং (গ) শিশুর কল্যাণ সাপেক্ষে শিশু পরিচর্যা ও বাইরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

## ২.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

সময়ের বিবর্তনে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যার মধ্যে আছে চাল, শাকশব্জি, চাষকৃত মাছ, হাঁস-মুরগী ও ডিমের উৎপাদন। বস্তুত আয় বৃদ্ধির সাথে এই উৎপাদন বৃদ্ধি দেশে ক্ষুধা ও অপুষ্টি কমাতে প্রভূত সাহায্য করেছে । জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির সাথে সংগতি রাখতে একটা সমৃদ্ধশীল কৃষিখাতের প্রয়োজনীয়তা যে অনস্বীকার্য তা বলাই বাহুল্য। কারণ, অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী আয়বৃদ্ধির ফলে চাল-বহির্ভূত আয়-স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবারই কথা।

**কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ:** কৃষি গবেষণায় সরকারি বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা হবে। তবে এই কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগের জন্য নতুন ক্ষেত্র হচ্ছে পানি ও সার সংক্রান্ত দুর্যোগ সহনীয় শস্যের উদ্ভাবন ও উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, জিএম প্রযুক্তি এবং কৃষক কর্তৃক নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি পরিগ্রহণ। তা ছাড়া, বিশেষত সেচ কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের উদ্দশ্য হবে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র সেচকাজে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তৃত ব্যবহার । সবশেষে, কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগের অন্যতম ক্ষেত্র হবে গ্রামীণ অবকাঠামো যা ক্ষুদ্র চাষীদের সংগে দেশ বিস্তৃত বাজারের সাথে সংযোগের সুযোগ বৃদ্ধি করে উপকরণ ও উৎপাদনে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করার এবং একই সাথে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করবে।

**সচেতনতা সৃষ্টি:** পুষ্টিসংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন ও অবকাশ হয়েছে যেমন: পুষ্টিকর খাদ্য, শিশু পরিচর্যাকালীন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, মাতৃসেবা এবং পুষ্টি সাপ্লিমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে ইলেকট্রনকি মিডিয়া ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে উঁচুমাত্রায় প্রচারণা চালানো। তেমনিভাবে কৃষকদের মাঝে টেকসই কৃষি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে।

**পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি:** দারিদ্র্য হ্রাসে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশেষ আঞ্চলিক ও গোত্র/গোষ্ঠী ভেদে দারিদ্র্যের প্রকোপ উঁচুমাত্রায় রয়ে গেছে। আর তাই পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য অধিক সম্পদ বরাদ্দে, ব্যক্তি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে, অবকাঠামো নির্মাণে এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টিতে, বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও বিস্তৃতি ক্ষুদ্র কর্মসূচি প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

## ২.৬ সারাংশ

খর্বতার ক্ষেত্রে বর্তমান গতিতে হ্রাসের অগ্রগতি (২০১৪ সালে ৩৬.১ শতাংশ) প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত পর্যায়ে রয়েছে (অন ট্র্যাক)। তেমনি রুদ্ধ বিকাশ স্তর ১৪.৩ শতাংশও প্রত্যাশিত পর্যায়ে। বাংলাদেশের কৃষিমুখীতা সূচকের মান বর্তমানে ০.৫ এর বেশি যা তুলনীয় দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে – যেমন ভারতে ০.৪, শ্রীলংকায় ০.৪ এবং নেপালে ০.২। এটা সত্যি যে কৃষিখাতে মোট সম্পদ প্রবাহ অপেক্ষাকৃত কম তবে এর জন্য দায়ী মূলত বরাদ্দ সংক্রান্ত দাতাদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী। আর তাই এসডিজি বাস্তবায়নে কৃষিতে আরও সম্পদ প্রবাহ বৃদ্ধিতে উন্নয়ন অংশীদারদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলানোর প্রয়োজন রয়েছে। কৃশতার পরিমাপে নারীদের অপুষ্টিজনিত অবস্থার প্রান্তিক উন্নতি ঘটেছে কিন্তু অতিশয় স্থূলতা বাড়ছে (২০১৪ সালে উভয় মিলে ১৯ শতাংশ)। অবশ্য শিশুদের মধ্যেও কৃশতা ও রুদ্ধ বিকাশের বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থূলতা বৃদ্ধি একটা উদীয়মান উদ্বেগের বিষয়।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে, এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিবারণে সাধারণ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকারের নেয়া কতকগুলো বিশেষ কর্মসূচির প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। এর মধ্যে আছে পুষ্টি সমৃদ্ধ বা ফরটিফাইড চালের সূচনা, কিশোরী মেয়ে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের মাঝে আয়রণ-ফলিক বিতরণ, শিশুদের জন্য ভিটামিন-এ, কৃমি দূরীকরণ, আয়োডাইজড লবন, স্তন্যদুধ সরবরাহে সাহায্যকল্পে মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি এবং গুণগত পানি, পয়ঃনিস্কাশন ও স্বাস্থ্য নিয়ে 'ওয়াশ' কর্মসূচির বিস্তৃতি।

তবে, ক্ষুধার প্রাবল্য শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার চ্যালেঞ্জটি বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। এই পরিকল্পনায় আছে ভবিষ্যত অনিশ্চয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে পা বাড়ানোর কথা যথা: জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, অবহেলিত অঞ্চল ও গোষ্ঠীর ক্ষুধা হ্রাসকল্পে পদক্ষেপ, নগরায়ন সমস্যা মোকাবেলা এবং অভিঘাতসহনশীল একটা দরিদ্র জনগোষ্ঠী তৈরি করা। সরকার এরিমধ্যে এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করে ফেলেছে এবং আশা করা যায় যে, এগুলো মোকাবেলা করতে শীঘ্রই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

# ৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

## সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

## ৩.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

২০০০-২০১৫ সময়কালে বিশ্বব্যাপী একদিকে পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু ও মাতৃ মৃত্যুহার এবং সংক্রামক ব্যাধীর বোঝা হ্রাস পেয়েছে, তেমনি একই সময়ে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে প্রত্যাশিত আয়ু বৃদ্ধি। কিন্তু উৎসাহব্যাঞ্জক উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও ২০১৫ সালে ৬ মিলিয়নের অধিক শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিন পালন করার পূর্বেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অন্য কথায়, প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুহার ৪২। অন্য এক হিসেবে দেখা যায়, ২০১৬ সালে সারা বিশ্বে ৩০৩,০০০ নারী শিশু জন্মকালীন সময় কিংবা গর্ভধারণ সংক্রান্ত নানান জটিলতায় জড়িয়ে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে যার অর্থ প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে মাতৃ মৃত্যু হার ২১৬।

এসডিজি ৩ তাই তিন দিক থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষাতাড়িত: এক, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে সকল বয়সীর সকলের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বৃদ্ধি; দুই,প্রধান সংক্রামক ব্যাধির মহামারীর অবসান; তিন; সংক্রামক ও মানসিক ব্যাধীর প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং চার, প্রজনন সম্পর্কিত মৌলিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার সুযোগবৃদ্ধি। এই অভীষ্ট আচরণগত ও পরিবেশজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করতেও প্রত্যয়ী। আর এসব উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে অন্যান্য কিছু লক্ষ্য যথা: সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধার বিস্তৃতি; সবার জন্য মূল্যসাশ্রয়ী, নিরাপদ এবং কার্যকর ওষুধ ও টীকার সুযোগ নিশ্চিত করা; সবার জন্য সংক্রামক ও অ-সংক্রামক রোগের ওষুধ ও টীকার গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা; স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও উন্নয়নশীল দেশে স্বাস্থ্যকর্মী বৃদ্ধি করা। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাক-সতর্কীকরণ, ঝুঁকি হ্রাস এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার।

## ৩.২ সূচকের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩ অগ্রগতি পর্যালোচনা

### *সূচক: ৩.১.১ মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)*

মাতৃ মৃত্যু অনুপাত বলতে বোঝায়, প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে শিশুর জন্ম অথবা গর্ভজনিত কারণে মায়ের মৃত্যুর সংখ্যা। যেসব মায়েরা শিশু জন্মের সময় ঝুঁকিতে থাকেন, সেইসব মায়েদের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মরণশীলতা সূচক। সারণি ৩.১ অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মাতৃ মৃত্যুহার ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী। মাতৃ স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ও নগরে মৃত্যুর হারের মধ্যে যে বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তা উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে।

**সারণি ৩.১ মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত, ১৯৯৫-২০১৬**

| অঞ্চল | ১৯৯৫ | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | ৪৪৭ | ৩১৮ | ৩৪৮ | ২১৬ | ১৮১ | ১৭৮ | ১৭২ |
| গ্রাম | ৪৫২ | ৩২৯ | ৩৫৮ | ২৩০ | ১৯১ | ১৯০ | ১৮২ |
| শহর | ৩৮০ | ২৬১ | ২৭৫ | ১৭৮ | ১৬২ | ১৬০ | ১৫৭ |

*উৎস: বিবিএস, এসভিআরএস, বিভিন্ন বছর*

### *সূচক: ৩.১.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত*

যথাযথ প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতি নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করে মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ও ধাত্রীদের উপস্থিতিতে শিশু জন্মের অনুপাত ১৯৯৪ সালে ৯.৫ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে ৪২.১ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আশা করা যায়, এই অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে দাঁড়াবে ৬৫.৭ শতাংশে যার অর্থ অগ্রগতি প্রত্যাশিত স্তরে আছে (অন ট্র্যাক)। তারপরেও প্রশিক্ষিত প্রসূতী সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে শিশুর জন্ম নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া, গ্রামীন ও শহরের মধ্যে শিক্ষাগত স্তর ও সম্পদভেদে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বিরাট বৈষম্য রয়েছে।

**সারণী ৩.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি, ১৯৯৪-২০১৬ (%)**

| | ১৯৯৪ | ২০০৪ | ২০০৭ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিশু জন্মের সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি | ৯.৫ | ১৫.৬ | ২০.৯ | ২৪.৪ | ২৬.৫ | ৩১.৭ | ৩৪.৪ | ৪২.১ | ৫০* |

*উৎস: এনআইপিওআরটি, বিডিএইসএস, বিভিন্ন বছর; *বাংলাদেশ মেট্যারনাল মরটালিটি এন্ড হেল্‌থ কেয়ার সার্ভে ২০১৬*

### *সূচক: ৩.২.১ অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)*

পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (ইউএমআর) বলতে বোঝায় প্রতি ১০০০জন পাঁচ বছর বয়সী জীবিত শিশুদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা। ১৯৯৫-২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মুত্যুহার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ তেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ও শহর এলাকায় শিশু মৃত্যুহারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেলেও বর্তমানে তা কমে এসেছে। সবচেয়ে বড় সুখবর হলো, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা (৩৪) ২০১৭ সালেই অর্জিত হয়েছে।

**সারণি: ৩.৩ অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুহার, (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)**

| এলাকা | ১৯৯৫ | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রাম | ১৩০ | ৯০ | ৭১ | ৪৮ | ৩৯ | ৩৬ | ৩৩ |
| শহর | ৮৩ | ৫৫ | ৫৬ | ৪৪ | ৩২ | ৩২ | ২৭ |
| জাতীয় | ১২৫ | ৮৪ | ৬৮ | ৪৭ | ৩৬ | ৩৫ | ৩১ |

*উৎস: এনআইপিওআরটি, বিডিএইসএস, বিভিন্ন বছর; * বাংলাদেশ মেটারনাল মোরটালিটি ও স্বাস্থ্য সেবা সমীক্ষা ২০১৬*

### *সূচক: ৩.২.২ নবজাতকের মৃত্যুহার, (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)*

নবজাতকের মৃত্যুহার বলতে বোঝায় এক মাসের কম বয়সী প্রতি ১০০০জন শিশুর মধ্যে কতজন মারা যায় তার হিসাব। ২০০০-১৫ সময়ের মধ্যে নবজাতক মৃত্যুহার যেমন ধারাবাহিকভাবে কমেছে তেমনি গ্রামীণ ও নগর বৈষম্য দূর হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিও নিশ্চিত হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই প্রবণতা চালু থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে নবজাতকের মৃত্যুহার প্রায় ১৩ তে নেমে আসবে।

**সারণি: ৩.৪ নবজাতক মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০জন জীবিত নবজাতকের মধ্যে)**

| অঞ্চল | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | ৩৯ | ৩৩ | ২৬ | ২১ | ২০ | ১৯ | ১৭ |
| গ্রাম | ৪৩ | ৩৫ | ২৬ | ২১ | ২০ | ১৯ | ১৭ |
| শহর | ২৮. | ২৮ | ২৫ | ১৯ | ২০ | ২০ | ১৭ |

*উৎস: বিবিএস, এসভিআরএস, বিভিন্ন বছর*

### *সূচক: ৩.৩.১ জেন্ডার, বয়স এবং মূল জনসংখ্যা অনুসারে প্রতি ১০০০ জন অসংক্রমিত মানুষের মধ্যে নতুন এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা*

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে উদীয়মান সংক্রামক রোগ এইচআইভি/এইডস এবং ডেঙ্গু সহ পুনরায় উদিত যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠরোগ, ফাইলেরিয়া সিস এবং কালাজ্বর ছাড়াও নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব গুরুত্বপূর্ণ। এই সব সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের অবসান এবং প্রতিরোধ আমাদের জন্য সবসময়ই বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সংক্রামক ও অসংক্রামক দুই ব্যাধির বোঝা বহন করতে হয়। তবে বাংলাদেশে এইচআইভি/ এইডস এর প্রাদুর্ভাব বরাবরই কম। জাতীয় পর্যায়ে ২০১৬ সালে ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী ও পুরুষের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্তের হার ০.০৪ শতাংশ (<০.১ শতাংশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য) ২০১৭ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.০১ শতাংশে (ইউএনএইডস-২০১৭)। তবে ব্যাপকতার হার কম হবার পেছনে উঁচু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে নেয়া কিছু নিবৃত্তিমূলক পদক্ষেপ দায়ী যেমন বিশেষত সীমান্তের শহরে,ড্রাগ ব্যবহারকারী নারী যৌনকর্মী অরক্ষিত যৌনসঙ্গী এবং বিদেশ থেকে আগত অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তঃক্ষেপ করা।

## সূচক ৩.৩.২ প্রতি ১০০,০০০ জনে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা

বাংলাদেশ যক্ষ্মার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যক্ষ্মা এমন এক সংক্রামক রোগ যথাযথ চিকিৎসা না হলে যা প্রাণনাশক হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার বৈশ্বিক (গ্লোবাল) টিবি রিপোর্ট ২০১৬ অনুযায়ী, বিশ্বের প্রথম ৩০টি যক্ষা আক্রান্ত দেশের একটি হলো বাংলাদেশ যেখানে প্রতি বছরে ৩৬২,০০০ টি যক্ষার নতুন ঘটনা ঘটে। এই সংক্রমণের শিকার হয়ে বছরে মারা যায় প্রায় ৭৩,০০০ মানুষ। এদেশে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে 'মাল্টি ড্রাগ রেজিসট্যান্স টিবি' (এমডিআর টিবি)–যার কারণে প্রতি বছর আনুমানিক ৯,৭০০ মানুষ এমডিআর ঘটনা ঘটে। যে সকল কারণে যক্ষা বিস্তার লাভ করে তার মধ্যে আছে জনসংখ্যাবহুল ও কম বায়ুচলাচল যুক্ত এলাকায় বসবাসকারী অস্থায়ী অভিবাসীদের মধ্যে, যক্ষ্মা সংক্রমণ ও অবাধে সহজলভ্য চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা এবং উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক পরিসেবাগুলোতে প্রবেশাধিকারের অভাব।

বাংলাদেশ জাতীয় টিবি প্রোগ্রাম (এনটিপি) তার সহযোগীদের সাথে নিয়ে যক্ষারোগ নির্ণয় এবং তা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় উৎকর্ষতা ধরে রাখছে। বাংলাদেশ এই অঞ্চলের প্রথম দেশ যে এমডিআর টিবি'র সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করেছে এবং এমডিআর টিবি রোগীদের মধ্যে উচ্চ নিরাময়ের হার অর্জন করেছে (৭৫%)। ২০১৮-২০২২ এর জন্য যক্ষা নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা উন্নতকরণ প্রক্রিয়া চলছে । বিনামূল্যে যক্ষারোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ সেবা সারা দেশে সহজলভ্য করা হয়েছে এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার সাথে সমন্বিত করা হয়ছে। ২০১৫ সালে সকল ধরণের যক্ষা রোগের আনুমানিক ঘটনার হার প্রতি ১০০০ জনে ছিল ২২৫জন এবং একই বছরে প্রতি ১ লাখে ৪৫ জন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে (এনটিপি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭)

## সূচক ৩.৩.৩ প্রতি ১০০০ জনে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রধান ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দেশগুলোর একটি হিসাবে বাংলাদেশ বিবেচিত হয়ে আসছে। ম্যালেরিয়া দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট একটি উদ্বেগের বিষয়। এখানে ২০১৫ সালে প্রতি ১০০০ জন মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ছিল ৪.৩ জন। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং এনজিওগুলোর সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সমন্বিত পদক্ষেপের কারণে এ রোগের হার অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, যদিও দেশের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব জেলা সমূহের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব একটা হ্রাস পায়নি।।

## সূচক ৩.৪.১ হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগে মৃত্যুর হার (৩০ থেকে ৭০ বছর বয়সী)

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও দ্রুত গতিতে অ-সংক্রামক (এনসিডি) রোগের বোঝা বাড়ছে। এর পেছনে প্রধানত দায়ী খাদ্যাভাস, পরিবেশগত অবনতি, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও বার্ধক্য। হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ রোগ বোঝা বৃদ্ধির প্রধাণ অনুঘটক। এনসিডির কারণে ৩০-৭০ বছর বয়সে মৃত্যুর সম্ভাবনা মানে ৩০ বছরের কতজন ৭০ বছর বয়সে পৌঁছার পূর্বেই মারা যায়। এই হার মোটামুটি একই আছ- ২০১৫ সালে ছিল ২১.৭ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ২১.৬ শতাংশ (ডব্লিউএইচ-২০১৭)।

## সূচক ৩.৪.২ প্রতি ১০০,০০০ জনে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার

বাংলাদেশে অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত মৃত্যুগুলোর মধ্যে আত্মহত্যা একটি সাধারণ ঘটনা। এ দেশে নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। যদিও অনেক ক্ষেত্রে সমাজে বিদ্যমান নানা ধরণের বিষণ্ণতা ও উদ্বেগজনিত মানসিক ব্যাধিগুলোই আত্মহত্যার পেছনে মূল কারণ, তবে পারিবারিক পর্যায়ে শারিরিক নির্যাতন ও সহিংসতা বাংলাদেশের নারীদেরকে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করে। আত্মহত্যায় মৃত্যুহার (প্রতি ১০০,০০০ জনে) হলো এমন একটি সংখ্যা যেখানে একটি বছরের মোট আত্মহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যাকে বছরের মাঝামাঝি সময়ের জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় এবং ১০০,০০ দ্বারা গুণ করা হয়। আত্মহত্যায় মৃত্যুহার ২০১৫ সালে ছিল ৫.৫ জন যা ২০০০ সালে প্রতি এক লাখে ছিল ৭ জন। আর সরকারি নিরাপত্তা বিভাগের এক তথ্য মতে, ২০১৫ সালে এই হার ছিল ৭.১ জন।

## সূচক ৩.৬.১ প্রতি ১০০,০০০ জনে সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুহার

বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনার আঘাত (আরটিআই) মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। বাংলাদেশে যানবাহন সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও নগরায়নের কারণে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু, দুর্ঘটনা জনিত অসুস্থতা এবং অক্ষমতার হার বেড়েই চলেছে। আরটিআই-এর কারণে এ দেশে ব্যক্তি, পরিবার ও জাতীয় পর্যায়ে বিরাট অংকের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার হলো প্রতি ১০০,০০০ জনে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মারাত্মক আহত ও নিহত হওয়া মানুষদের একটি হিসাব। ২০১৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের হার ছিল প্রতি ১০০,০০০ জনে ২.৪৯ (পিএসডি ২০১৫) যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য মতে এই হার আরো বেশি। এই তথ্য মতে ২০১৭ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৫৬ যা ২০১৩ সালে ছিল ১৩.৬।

### *সূচক ৩.৭.১ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা হয়েছে প্রজনন সক্ষম (১৫-৪৯ বছর) এমন নারীর অনুপাত*

নারী ও তার অন্তরঙ্গসঙ্গী পুরুষকে সন্তানের সংখ্যা ও নতুন জন্মদানের ব্যবধান সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা জরুরী। এর মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন যেমন সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি অপ্রত্যাশিত ও দ্রুত গর্ভধারণ রোধ করাও সম্ভব। ২০১৪ সালে প্রজনন বয়সী (১৪-৪৯) নারীদের মধ্যে ৭২.৬ শতাংশ নারী আধুনিক পদ্ধতির সন্তোষজনক পরিবার পরিকল্পনা সেবা পেতে সক্ষম হয়েছিল।

### *সূচক ৩.৭.২ প্রতি ১০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১০-১৪ বছর বয়সী, ১৫-১৯ বছর বয়সী সন্তান জন্মদানের হার)*

প্রজনন সক্ষম হওয়ার সাথে সাথে অল্প বয়সে যে সকল মেয়েরা গর্ভ ধারণ করে তারা গর্ভকালীন সময়ে এবং বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু ঝুঁকিসহ নানা ধরণের সমস্যায় পতিত হয়। কিশোরী মায়েদের শিশুরাও জন্মের পরপর নানা জটিলতার সম্মুখীন হয় যার প্রভাব প্রবাহিত হয় সারাটা জীবন। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সীমিত হয়ে আসে, শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, গৃহস্থালীর কাজকর্ম করাও চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। কৈশোরক জন্মের হার সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে: কোনো এক বছরে ১৫-১৯ বছর বয়স্ক নারীর জীবিত জন্মদানের সংখ্যাকে ওই বয়সের বন্ধনীতে থাকা মোট নারী জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। আবার ১০-১৪ বছর বয়সী মায়েদের জন্যও একই হিসেব প্রযোজ্য।

**সারণি ৩.৫ কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের হার (বয়স ১৫-১৯ বছর), প্রতি ১০০০ জন নারীতে**

| ১৯৯৯-০০ | ২০০৪ | ২০০৭ | ২০১১ | ২০১৪ |
|---|---|---|---|---|
| ১৪৪ | ১৩৫ | ১২৬ | ১১৮ | ১১৩ |

*উৎস: এনআইপিওআরটি, বিডিএইসএস. বিভিন্ন বছর*

সারণি ৩.৫ থেকে দেখা যায়, ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের হার সময়ের সাথে সাথে কমে আসছে। ১৯৯৯-০০ সালে প্রতি ১০০০ জনে যে জন্মহার ছিল ১৪৪ জন, ২০১৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১৩ জনে। যেহেতু বিডিএইচএস এর তথ্যানুসারে এই বিষয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য এখনো নির্ধারণ করা হয়নি, কাজেই প্রকৃত অবস্থা এই মুহূর্তে মূল্যায়ন করা যাবে না। তবে নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি এবং বাল্য বিবাহ রোধ করা গেলে এই বয়সী মায়েদের জন্মহার ভবিষ্যতে কমবে বলে আশা করা যায়।

### *সূচক ৩.৯.১ খানা ও চারপাশের বায়ু দূষণে সংঘঠিত মৃত্যুহার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)*

রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত দূষিত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে খানার বাইরের ও ভেতরের পরিবেশ নষ্টের কারণে মৃত্যুর হার বাড়ছে। বাংলাদেশে বায়ু দূষণের প্রেক্ষিতে মৃত্যুহার গণনা করা হয় মোট মৃতের সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা বিভাজন করে ১০০,০০০ দ্বারা গুণ করার মাধ্যমে। এই হিসাব মতে, ২০১২ সালে ছিল ৬৮.৬ (ডব্লিউএইচও-২০১২)। অবশ্য এই সূচকটির জন্য কেবল একটি তথ্যবিন্দু রয়েছে। লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এবং তার ওপর মন্তব্য করার জন্য আরো তথ্যবিন্দু দরকার।

### *সূচক ৩.৯.২ দূষিত পানি, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবন রীতির অভাব জনিত মৃত্যুহার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)*

অপর্যাপ্ত পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির ঘাটতির কারণেও মৃত্যু ঘটে যা এই সংক্রান্ত সেবা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহজেই মোকাবেলা করা যায়। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যদিও স্বাস্থ্যবিধি সেবা আরো অনেক বেশি গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে, এ দেশে অনিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারের ফলে মৃত্যুহার প্রতি ১০০,০০০ জনে ৫.৯৬ বলে ধরা হয়েছে। পূর্বের মতোই এই সূচকটির জন্যও কেবল একটি তথ্যবিন্দু রয়েছে। লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এবং তার ওপর মন্তব্য করার জন্য আরো তথ্যবিন্দু দরকার।

## সূচক ৩.৯.৩ প্রতি ১০০,০০০ জনে অনিচ্ছাকৃত বিষপ্রয়োগজনিত বায়ু দূষণে মৃত্যুহার

অনিচ্ছাকৃত বিষপ্রয়োগজনিত মৃত্যু এ দেশে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারের অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলাকেই নির্দেশ করে। এর সাথে আছে কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভাব। তবে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই মৃত্যুকে রুখে দেওয়া সম্ভব। ২০১৫ সালের হিসেব অনুযায়ী অনিচ্ছাকৃত বিষপ্রয়োগজনিত বায়ু দূষণে মৃত্যুহার (প্রতি ১০০,০০০ জনে) ছিল ০.৩ (ডব্লিউএইচও, ২০১৭)। এই সূচকটির জন্য কেবল একটি তথ্যবিন্দু রয়েছে। লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এবং তার ওপর মন্তব্য করার জন্য আরো তথ্যবিন্দু দরকার।

## সূচক ৩.ক.১ ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী বর্তমানে তামাক সেবনের পরিমাণ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অ-সংক্রামক রোগে অসুস্থতা ও মৃত্যুর একটি বড় কারণ হলো তামাকের ব্যবহার। তামাক ব্যবহার বলতে মনে করা হয় ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারী ১০টি দেশের একটি হলো বাংলাদেশ, যদিও ২০০৩ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল' চুক্তিতে সই করে। ২০১৫ সালের তথ্য মতে, ১৫ বছর এবং তার বেশি বয়সী পুরুষদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের ৫৮ এবং নারীদের মধ্যে ২৮(ডব্লিউটিও,২০১৭)। গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (জিএএস) হিসেব অনুযায়ী ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমানে তামাক ব্যবহারের বয়স প্রমিতকরণে ব্যাপকতা বেশ কমেছে: ২০০৯ সালের ৪৩.৩ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে কমে দাঁড়ায় ৩৫.৩ শতাংশে। বাংলাদেশ তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার রোধে সচেতনতা তৈরিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তামাকমুক্ত দেশ হতে চায়। এই সূচকটির জন্যও কেবল একটি তথ্যবিন্দু রয়েছে। লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এবং তার ওপর মন্তব্য করার জন্য আরো তথ্যবিন্দু দরকার।

## সূচক ৩.খ.১ টেকসই ভিত্তিতে ও সাশ্রয়ীমূল্যে ঔষধ ও টিকা সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত

১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) সম্প্রসারিত প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি কার্যকর জাতীয় প্রতিরোধ কর্মসূচি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এই কর্মসূচি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ববাহী হয়ে ওঠে ১৯৮৫ সালে যখন বাংলাদেশ জাতিসংঘে ১৯৯০ সালের মধ্যে কর্মসূচী বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। যে ছয়টি শিশুরোগ নিয়ে এই কর্মসূচি গঠিত সেগুলো হলো; পোলিও, হাম, ঘুংড়ি কাশি, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া এবং যক্ষা। দীর্ঘ মেয়াদে সাশ্রয়ী ওষুধ ও ভ্যাকসিন প্রাপ্তির ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ৭৮ শতাংশে (বিডিএইসএস, ২০১৪)। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের তথ্য মতে, ১২ মাস বয়সী শিশুদের ভ্যাকসিন প্রাপ্তির অনুপাত ৮২.৩ শতাংশ এবং ২৩ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৮৬.৮ শতাংশ। এই সূচকটির জন্য কেবল একটি তথ্যবিন্দু রয়েছে বিধায় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তার ওপর মন্তব্য করার জন্য আরো তথ্যবিন্দু দরকার।

## সূচক ৩.বি.২ চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্যখাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার (ওডিএ) নীট পরিমাণ

স্বাস্থ্য গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্যখাতে মোট নীট সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ২০১২ সালে ছিল ২৭৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৫ সালে যার পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১৭৭.৪ মিলিয়ন । ২০১৭ সালে এই সহায়তার পরিমাণ আবার বেড়ে দাঁড়ায় ২৫২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ মোট নীট সরকারি উন্নয়ন সহায়তার ওঠা নামায় একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

**সারণি ৩.৬ মেডিকেল চিকিৎসা গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্যখাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার (ওডিএ) নীট পরিমাণ ২০১২-২০১৬ (মিলিয়ন ইউএস ডলার)**

| ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৭৪.১ | ২২৪.১ | ২৪২.৭ | ১৭৭.৪ | ২০৬.২ | ২৫২.৫ |

*উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ*

## সূচক ৩.গ.১ প্রতি ১০,০০০ জনে স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব এবং বন্টন (চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ)

স্বাস্থ্যের জন্য সম্পদ সংগ্রহ (এইসআরএইস) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি মূল উপাদান। গুনগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকল্পে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাফল্য মূলত নির্ভর করে স্বাস্থ্যকর্মীর গুণের ওপর যেমন, চিকিৎসক, নার্স এবং ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক ব্যক্তি, দন্ত চিকিৎসক এবং ওষুধ প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর্মীর বিরাট ঘাটতি রয়েছে অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্যকর্মীদের বিতরণেও রয়েছে ত্রুটি। ২০১৬ সালের হিসাব

মতে এখানে প্রতি ১০,০০০ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘনত্ব ৭.৪। ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদের অনুপাত এখানে ১: ০.৫: ০.২ যা কর্মশক্তির ভারসাম্যহীনতাকেই নির্দেশ করে। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘনত্ব আগের চেয়ে বেড়েছে। ২০১৭ এর তথ্য অনুসারে প্রতি ১০,০০০ জনে বর্তমান ঘনত্ব ৮.৩ এবং বন্টন অনুপাত ১: ০.৫৬: ০.৪০ (এইচআরডি ইউনিট, এইচআর এইচ কান্ট্রি প্রোফাইল, ২০১৭)। সুতরাং ২০২০ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে ঠিক পথেই এগোচ্ছে বলা চলে।

### *সূচক ৩.ঘ.১ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি সংশ্লিষ্ট (আইএইসআর) সক্ষমতা এবং জরুরী স্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি*

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়মন (আইএইচআর) ২০০৫ ১৯৪টি দেশের প্রত্যেকের জন্য কোর ক্যাপাসিটি রিকোয়ারমেন্ট সংজ্ঞায়িত করেছে। দেশগুলো আইএইচআর-এর অংশ হিসাবে নিশ্চিত করতে চায় যে ঘটনা সনাক্ত, পর্যালোচনা, অবহিতকরণ এবং ঘটনার প্রতিবেদন তৈরিতে এবং প্রয়োজনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগ সৃষ্টিকারি গণ-স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং জরুরি অবস্থায় প্রতিক্রিয়া দিতে তারা প্রস্তুত। এই ১৩টি মৌলিক ক্ষমতা রয়েছে। (১) জাতীয় আইন, নীতি এবং অর্থায়ন; (২) সমন্বয় এবং জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট যোগাযোগ; (৩) নজরদারি; (৪) প্রতিক্রিয়া; (৫) প্রস্তুতি; (৬) ঝুঁকি যোগাযোগ; (৭) মানব সম্পদ; (৮) পরীক্ষাগার; (৯) প্রবেশ পথ; (১০) পশুবাহিত রোগের ঘটনা; (১১) খাদ্য নিরাপত্তা; (১২) রাসায়নিক ঘটনা; এবং (১৩) রেডিওনিউক্লিয়ার জরুরী অবস্থা। এই সূচকটি পরিমাপ করা হয়েছে নির্ধারিত একটি সময়ে মৌলিক ১৩টি সক্ষমতার কত শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে তার মাধ্যমে। ২০১৬ সালে এই সূচকের মান ছিল ৮৭.৫ শতাংশ (ডব্লিউএইচও, ২০১৬) এবং ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এই সূচকের সবগুলো লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।

## ৩.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা

বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য ১৯৯৮ সাল থেকে খাতবিস্তৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এ পর্যন্ত তিনটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং চতুর্থ কর্মসূচি অর্থাৎ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাত কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। চতুর্থ কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) হলো তিনটি আনুক্রমিক সফল কর্মসূচির মধ্যে প্রথমটি, যা ২০৩০ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হবে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাত কেন্দ্রিক এসডিজির লক্ষ্যগুলো পূরণে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস।

বর্তমান কর্মসূচির তিনটি উপাদান রয়েছে এক) স্বাস্থ্যখাতের শাসন তত্ত্বাবধান এবং নেতৃত্ব; দুই) অধিকতর শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা; এবং তিন) মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা। এর মধ্যে প্রথম উপাদানটি ওষুধ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ, মানসম্মত ওষুধ ব্যবস্থাপনা, আইন এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যেমন বিএমডিসি, এসএমএফ ও এনজিওগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে।

দ্বিতীয় উপাদানের কাজ হবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। বিশেষ করে– পরিকল্পনা, বাজেট নির্ধারণ, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য খাতের প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন, সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা, আন্ত:বিভাগ যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এই উপাদান কাজ করবে।

তৃতীয় উপাদান কাজ করবে স্বাস্থ্য সেবার অগ্রাধিকার ভিত্তিক গুণগত মান উন্নয়নে, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত এসডিজির লক্ষ্যগুলো অর্জন করা ত্বরান্বিত হবে। প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রসূতী মায়ের সেবা, শিশু ও কিশোর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, সংক্রামক ও অ-সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ, বিকল্প চিকিৎসবা সেবা এবং আচরণগত পরিবর্তন হবে এর প্রধান কর্মক্ষেত্র।

### *সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিস্তার পদ্ধতি (ইউএইসসি)*

২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিস্তার (ইউএসসি) এর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য চতুর্থ এইসপিএনএসপিকে যুক্ত করা হয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্য হলো সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সহায়তায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার নিশ্চিত করা। সম্পদের অপচয় কমিয়ে এনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা আনয়ন ও এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম স্তরের সুবিধা হিসেবে সারা দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কর্মসূচিগুলোর মধ্যে একটি যা বিশ্বব্যাপী "পিএইচসি" মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এখানে দিনে গড়ে প্রায় ৪০ জন রোগী সেবা পেয়ে থাকে, যাদের মধ্যে ৯০ ভাগই হলো নারী ও শিশু।

### *অপরিহার্য পরিষেবা প্যাকেজের বিধান (ইএসপি)*

স্বাস্থ্য অধিকার এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাগুলোতে সকলের যথাযথ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ইএসপি বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারকেই প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৯৮ সালে এই প্রোগ্রাম প্রথম চালু করা হয় এবং রোগের ধরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্যাকেজটিকে

হালনাগাদ করা হয়। সকলের জন্য মানসম্মত সমতা এবং ইউএইচসি অর্জন নিশ্চিত করতে সরকার ধারাবাহিকভাবে এই কৌশল অনুসরণ করে যাচ্ছে। অতি দরিদ্রদের জন্য ইএসপি এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার এই কৌশলসমূহ অবলম্বনের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ধনী ও গরিবের ব্যবধান কমে আসছে। একই রকম উন্নয়ন ঘটেছে নারী স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও।

### *জেন্ডার, সমতা, মতামত ও জবাবদিহীতা (জিইভিএ)*

জিইভিএ একটি খাতভিত্তিক প্রোগ্রামের ভিত্তিপ্রস্তর, যার মূল লক্ষ্য হলো নারীদের মানসম্মত সেবা প্রদান বৃদ্ধি করা এবং নারী ও কিশোরীদের মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তাসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। নারীবান্ধব হাসপাতালগুলো বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হয়ে বেঁচে যাওয়া নারীদের বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শসহ আইনগত সহায়তা প্রদান করে। ভবিষ্যতে এসকল হাসপাতালগুলোর সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

### *টিকা সম্প্রসারণ কর্মসূচী (ইপিআই)*

মাতৃ ও নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে টিকা সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাংলাদেশ সরকারের একটি সফল কার্যক্রম। বাংলাদেশ এর মাধ্যমে ১ বছর বয়সী প্রায় ৮০ শতাংশ শিশুকে পরিপূর্ণ টিকা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে (এনআইপিওআরটি, ২০১৬)। পরিবেশগত দূষণের দিক বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা খাতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বাংলাদেশ এই বিষয়েও সচেতন। এই সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সরকার একটি স্বাস্থ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এইচসিডব্লিউএমপি) প্রস্তুত করেছে।

### *সড়ক নিরাপত্তা*

সরকার সড়ক নিরাপত্তা কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম "জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা ১৯৯৭-৯৯" গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ৮ম কর্ম পরিকল্পনা (২০১৭-২০১০) প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে ২০৩০ সালের এজেন্ডায় আলোচিত সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ এবং সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদ ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে সড়ক পরিবহন আইনের একটি খসড়া অনুমোদন করেছে। বিলটি আগামী মাসে সংসদে আইন হিসেবে পাশ হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এই আইন পাশ হলে বাংলাদেশের রাস্তাগুলোতে নিরাপদে চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের শাস্তি বর্তমানের তুলনায় আরো কঠিন হবে।

## ৩.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে সকলের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা অর্জনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে জোর প্রচেষ্টা চলছে। রোগব্যাধি ও মৃত্যুহার বৃদ্ধিতে নানা ধরণের অ-সংক্রামক রোগ যেমন– ডায়েবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খাত বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ যেমন– আগুনে পোড়া ও এ্যাসিড দগ্ধ, পানিতে ডুবে যাওয়া, সড়ক দুর্ঘটনা, হেপাটাইটিস বি ও সি, বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, জীবানু-সংক্রান্ত বিপর্যয়, আর্সেনিকোসিস এবং বার্ধক্যজনিত রোগ প্রভৃতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটের বিপরীতে স্বাস্থ্য খাতের নিম্নলিখিত কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়েছেঃ

- ***জনমিতিক রূপান্তর***

  জনমিতিক রূপান্তরের মধ্যে আছে গ্রামীণ এলাকা থেকে শহুরে এমন এলাকায় জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ এলাকার মতো সংগঠিত নয়। উপজেলা পর্যায়ে নগর এলাকার বিস্তার, নগর অভিবাসন এবং ক্রমবর্ধমান শহুরে জনসংখ্যা নগর এলাকায় কাযর্কর পিএইসসি পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। শহুরে এলাকায় পিএইচসি পরিষেবা সুবিধাসমূহের অনুপস্থিতি বা ঘাটতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বস্তিবাসীরা যা নগরে বাসরত বস্তিবাসীর স্বাস্থ্যগত অবস্থান থেকে বোঝা যায়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও মাধ্যমিক বা টারশিয়ারি স্বাস্থ্যসেবাগুলো নিশ্চিত করে ফলপ্রসূ শহুরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এমওএইচএফডব্লিউ এবং এমওএলজিআরডিসি মন্ত্রণালয় দু'টির মধ্যে সমন্বয় সাধন অপরিহার্য, যা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ।

- *এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রানজিশন*

এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রাঞ্জিশনের ফলে সমাজ এখন দুই রোগের প্রকোপের সম্মুখীন হচ্ছে। নগরায়ন এবং বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ মৃত্যুহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো অ-সংক্রামক রোগ। এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রাঞ্জিশন রোগীদের বিশেষ করে দরিদ্রদের আর্থিক সক্ষমতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য বাজেটের ওপরও এই শ্রেণির রয়েছে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ।

- *শাসন এবং ন্যস্ত দায়িত্ব*

বেসরকারি খাতের বিস্তৃত ও প্রভাবশালী ভূমিকার (সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ৮৬ ভাগ দখল করে আছে) পাশাপাশি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর ব্যাঙের ছাতার মতো বৃদ্ধি এবং সরকারের সীমিত তত্ত্বধায়ন স্বাস্থ্য খাতকে অনিয়ন্ত্রিত করে তুলছে। বেসরকারি খাত কর্তৃক প্রদত্ত সেবার গুণগত মান এবং পরিষেবাগুলোর জন্য ধার্যকৃত উচ্চমূল্য জনমনে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করছে।

**এছাড়াও স্বাস্থ্য খাতে সচরাচর নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয়ঃ**

১. ইউএইচসি অর্জনের লক্ষ্যে রোগী কর্তৃক সরাসরি নিজের পকেট থেকে ব্যয় হ্রাস করা;

২. শহুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা;

৩. মাতৃ মৃত্যহার কমানোর লক্ষ্যে দক্ষ জন্মসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

৪. কম ওজন এবং খর্বাকৃতিসহ সামগ্রিক পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন করা;

৫. সেবার মান, মানদণ্ড এবং সেবার গুণগত মানের জন্য স্বীকৃতি উন্নয়ন;

৬. এইচডব্লিউ কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষতা সম্পন্ন মানব সম্পদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

৭. দরিদ্রদের মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত এবং সমাজের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিসহ নতুন পদ্ধতি তৈরি করা;

৮. ইউএইচসি অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন এবং সমতা বৃদ্ধি;

৯. স্বাস্থ্যকর্মীর তীব্র ঘাটতি এবং দক্ষতায় ভারসাম্যহীনতা; এবং

১০. অপর্যাপ্ত কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা।

## ৩.৫ ভবিষ্যত করণীয়

*মাতৃমৃত্যু ও নবজাকতের স্বাস্থ্যসেবা (এমএনএইচ) উন্নত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে ডাক্তার, নার্স, কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারী এবং ধাত্রী নিয়োগ দিয়েছে। ভবিষ্যতে পারিবারিক কল্যাণ সেবা নিশ্চিতকরণে বিপুল সংখ্যক পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শনকারী নিয়োগ দেওয়া হবে। তাছাড়া, তুলনামূলক দুর্গম এলাকা এবং পিছিয়ে পড়া এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাসমূহ পৌছানোর জন্য যথেষ্ট কর্মী সরবরাহ করা হবে।*

*এরইমধ্যে কিশোর স্বাস্থ্যসেবা জাতীয় পরিকল্পনা (২০১৭-৩০) অনুমোদিত হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে। কিশোরী নারী এবং সদ্য বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবার চাহিদা তৈরি করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকসহ সকলের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।*

## ৩.৬ সারাংশ

এসভিআরএস ২০১৭ এর তথ্য মতে, শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচক বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার (ইউ৫এমআর); (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩১ জন) এবং নবজাতক মৃত্যুহার (এনএমআর) (প্রতি হাজারে ১৭ জন) সময়ের আগেই ২০২০ সালের মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেছে। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে প্রশিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা, বিবাহিত নারীদের আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন এবং কিশোরী মায়েদের (১৫-১৯ বছর বয়সী নারী) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ২০২০ সালের লক্ষ্যগুলোও অর্জনের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। ২০২০ এর মধ্যে প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কাঙ্ক্ষিত ঘনত্ব নিশ্চিত করণেও কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বাচ্চা জন্মদানের সময় প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের উপস্থিতি ১৯৯৪ সালের ৯.৫ শতাংশ ২০১৪ সালে ৪২.১ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।

এইচআইভি/এইডস এর প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে বেশ কম কিন্তু যক্ষার ঝুঁকি এ দেশে খুব বেশি। বাংলাদেশ বিশ্বের ৩০টি যক্ষা ঝুঁকিবহুল দেশের একটি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে অন্যতম প্রধান ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দেশের তালিকায়ও রয়েছে বাংলাদেশের নাম। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারী ১০টি দেশের একটি হলো বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য ১৯৯৮ সাল থেকে খাতবিস্তৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এখন পর্যন্ত তিনটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং চতুর্থটি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাত কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়। চতুর্থ কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) হলো তিনটি সফল কর্মসূচির মধ্যে প্রথমটি, যা ২০৩০ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হবে। এই কর্মসূচির তিনটি অংশ আছে: শাসন, দায়িত্ব ও নেতৃত্ব, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসোব এর লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতের লক্ষ্যমাত্রা এবং এসডিজির স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সূচক অর্জন করা।

এ দেশের স্বাস্থ্যখাতে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন ও সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এনসিডির বর্ধিত বোঝা, বিভিন্ন আঘাতের প্রাদুর্ভাব, ডুবে যাওয়া, বার্ধক্য ও জেরিয়াট্রিক রোগ, সংক্রামক রোগের বিস্তার, ভূ–জলবায়ু বিপর্যয় এবং আর্সেনিকের বর্ধিত প্রভাব চ্যালেঞ্জগুলো এর মধ্যে অগ্রগণ্য।

# ৪

# অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাসম্পন্ন গুণগত শিক্ষা

**সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি**

## ৪.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ২০১৪ সালে বিশ্বব্যাপী ৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়স্ক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল। সমাজের সর্বোচ্চ ধনী ২০ শতাংশ পরিবারের শিশু এবং দরিদ্রতম ২০ শতাংশ পরিবারের শিশুদের পড়াশোনা করার দক্ষতায় ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ ও শহুরে শিশুদের মধ্যেও এই পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার বিবেচনায় ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর বেদনাদায়ক ব্যবধানও দৃষ্টি এড়ায় না। এমন পরিস্থিতিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেয়, মানসম্মত শৈশব উন্নয়ন ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই ছেলে ও মেয়েদের প্রবেশগামীতা নিশ্চিত করে, প্রযুক্তিগত, কারিগরি, ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং শিক্ষার বৈষম্য দূর করে সর্বস্তরের শিক্ষায় সকলের বিশেষ করে– পিছিয়ে পড়া, অক্ষম ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। শিক্ষায় সুযোগ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি প্রাপ্ত বয়স্ক ও যুব জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভালো মানের চাকুরী ও দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির পরিবেশ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো প্রয়োজন। সংখ্যালঘু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা ও অক্ষরজ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতও বাড়ানো প্রয়োজন। শিশু, অক্ষম এবং জেন্ডার সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই উন্নয়ন ও এর সুবিধা নিশ্চিত করণে শিক্ষা প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। তবে একথাও ঠিক যে, যথাযথ প্রশিক্ষিত শিক্ষক সরবরাহ নিশ্চিত করা ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। সেজন্য শিক্ষকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা বৃত্তির হার বাড়াতে হবে।

## ৪.২ সূচকের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ অগ্রগতি পর্যালোচনা

### *সূচক ৪.১.১ ন্যূনতম পাঠ এবং গণিতে দক্ষতা অর্জনে জেন্ডারভেদে শিশু ও যুবসমাজের অনুপাত*

এই সূচকগুলো অনুসারে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সর্বনিম্ন স্তরের পাঠ দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। ২০১৫ সালে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বাংলা পড়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দক্ষতা অর্জন করে; যার মধ্যে ৫৫ শতাংশ ছেলে এবং ৫৪ শতাংশ মেয়ে। ইংরেজির ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ১৯ শতাংশ, যার মধ্যে ২২ শতাংশ ছেলে এবং ১৮ শতাংশ মেয়ে। যাই হোক উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেদের দক্ষতার হার বেশি দেখা যাচ্ছে। আশঙ্কার কথা হলো, ছাত্র-ছাত্রীদের খুব অল্প অংশই এ দেশের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। যোগ্য শিক্ষকের অভাব এই খারাপ অবস্থার পেছনে একটি প্রধান কারণ। একই বছরের হিসেব মতে গণিতে সর্বনিম্ন দক্ষতা রয়েছে ৫৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর, যার মধ্যে ৬২ শতাংশ ছেলে এবং ৫২ শতাংশ মেয়ে। মোট কথা শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক নিজেদের মাতৃভাষা ও গণিতে সর্বনিম্ন দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়া নির্দেশ করে এই খাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয়। পর্যাপ্ত নতুন তথ্য না থাকায় সর্বনিম্ন দক্ষতা অর্জনের সামগ্রিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সম্ভবপর নয়।

### *সূচক ৪.২.২ সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য বয়সের এক বছর আগে)*

স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হওয়ার পরপরই শৈশবকালীন শিক্ষাকে এ দেশে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং শৈশবকালীন শিক্ষা প্রসারে জোর দেওয়া হয়। আবার অতি সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০'সহ সবগুলো শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে স্কুল কেন্দ্রিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দিয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বহু আগ থেকেই ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিশুশ্রেণি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হলো শিশুদেরকে স্কুল পরিবেশে অভ্যস্ত করে তোলা যাতে তারা পরবর্তীতে স্কুল ছেড়ে না দেয়। আনুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি সংস্থা ও এনজিও বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্নমুখী কর্মসূচি চালু করেছে। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়ে নিতে ২০০৫ সালে সরকার, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (বিইএন) নামে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন অবস্থানের শিশুদের স্কুল অন্তর্ভুক্তিকরণ, ধারণ এবং জ্ঞানগত উন্নয়নে ভালো ফলাফল দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এ থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে অতি দরিদ্র অবস্থান থেকে উঠে আসা শিশুরা।

**সারণি ৪.১: মোট অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুপাত, প্রাক-প্রাথমিক, ২০০০-২০১৬**

| | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৩ | ২০১৫ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ছেলে | ১৬.৯ | ১০.৯ | ১২.৭ | ৩১.৭ | ৩১.০ | ৩৩.৭ |
| মেয়ে | ১৭.৩ | ১১.১ | ১২.৬ | ৩১.৭ | ৩১.৫ | ৩৪.৯ |
| সর্বমোট | ১৭.১ | ১১.০ | ১২.৬ | ৩১.৭ | ৩১.২ | ৩৪.৩ |

*উৎস: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্ব ব্যাংক*

সারণি ৪.১ থেকে দেখা যায়, ২০০৫ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট অন্তর্ভুক্তির অনুপাত বেড়ে চলেছে। ২০১৬ সালেও এই বৃদ্ধির উর্ধ্বগামী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১৬ সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট অন্তর্ভুক্তির হার (জিইআর) প্রায় তিনগুণ বেড়েছে এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে জিইআর বেশি। জিইআর ওপরে ওঠার ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি প্রধান পদক্ষেপ কাজ করেছে: এক, একটি জাতীয় পাঠ্যক্রম ওবিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাড়তি ৩৭,৭২৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান। দুই, তৃণমূল পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি 'স্কুল শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা' (এসএলআইপি) কাজ করছে। সম্ভবত এই উদ্যোগের কারণে ২০১৩ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির হার বার্ষিক ১.৪৫ শতাংশ পয়েন্ট হারে বাড়ছে।

## *সূচক ৪.৫.১ শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা সূচক*

শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট বা নিট হিসেবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির আনুপাতিক হারকে জেন্ডার সমতা সূচক (জিপিআই) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যখন জিপিআই এর মান '১' হবে, তখন ছেলে ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির হার সমান বলে ধরে নিতে হবে। জিপিআই এর মান ১ এর চেয়ে কম (বেশি) অর্থ হলো, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির অনুপাত কম (বেশি)। জেন্ডার সমতা সূচকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই জিপিআই এর মান ১ এর চেয়ে কম যার মধ্যে ৯০ দশকের প্রথম দিকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এর মান সবচেয়ে কম ছিল ।

**সারণি ৪.২ শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা সূচক, ১৯৯০-২০১৬**

| শিক্ষার স্তর | ১৯৯০ | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১১ | ২০১৩ | ২০১৫ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রাইমারী | ০.৮৪৩ | ০.৯৬ | ১.০৪৬ | ১.০৫৯ | ১.০৪৪ | ১.০৮ | ১.০৬ |
| মাধ্যমিক | ০.৫১ | ১.০২৯ | ১.০৬৬ | ১.১৫২ | ১.০৮৩ | ১.১২৯ | ১.১০৫ |
| উচ্চমাধ্যমিক | ০.১৯৪ | ০.৪৯১ | ০.৫২১ | ০.৬৯৩ | ০.৭৩৭ (২০১৪) | ঘঅ | ০.৭০১ |
| কারিগরি | প্রযোজ্য নয় | ০.৩২০ | ০.৩৫০ | ০.২৯৭ (২০১০) | ০.৩৯৪ | ০.৩১৫ | ০.৩১৫ |

*উৎস: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্ব ব্যাংক*

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে জিপিআই হিসেব করা হয়েছে ব্যানবেইস কর্তৃক বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৭ (বিএএনবিইআইএস) প্রদত্ত তথ্য থেকে। নতুন শতাব্দীর শুরুতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জিপিআই '১' ছাড়িয়ে গেছে এবং বার্ষিক কিছু ওঠা-নামা সত্ত্বেও '১' এর ওপরেই রয়ে গেছে। টারশিয়ারি বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন শতাব্দীর শুরুতে ১৯৯০ সালের চেয়ে জিপিআই প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। এত উন্নতি সত্ত্বেও ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই স্তরের শিক্ষায় জিপিআই এখনো '১' এর নিচেই রয়ে গেছে। ২০১৬ সালের জিপিআই থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা তিনটি স্তরেই জিপিআই কিছুটা কমেছে। এর মানে হলো এই সময়ের মধ্যে আগের বছরের তুলনায় মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের স্কুল অন্তর্ভুক্তি হয়েছে বেশি পরিমাণে। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে জিপিআই ২০০০ সালে দাঁড়ায় ০.৩২০। ২০১৬ সালে এসেও কিছু বার্ষিক ওঠা-নামা মিলিয়ে এই কারিগরি শিক্ষার জিপিআই তার আগের মানের কাছাকাছিই রয়ে গেছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে সকল শ্রেণির পেশার মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং বর্ধিত আয়ের প্রভাবে বেড়েছে শিক্ষার চাহিদা। শিক্ষা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন দরিদ্র শিশুদের বেশি পরিমাণে

স্কুলগামী করতে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি–যেমন, সরাসরি স্কুলে প্রবেশের সুবিধা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, প্রাথমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নগদ সহায়তার বিনিময়ে শিক্ষা, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে উপবৃত্তি এবং শিক্ষা দান প্রোগ্রাম ইত্যাদি মেয়েদের স্কুল অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে জিপিআই মান উন্নীত করতে কারিগরি শিক্ষায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবংপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা বজায় রাখতে সরকারি উদ্যোগ চালু রাখতে হবে। এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, জিপিআই শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য পরিমাপ করে মাত্র, তবে এটা শিক্ষার মান সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত প্রদান করে না।.

### *সূচক ৪.৬.১ জেন্ডারভেদে ব্যবহারিক (ক) স্বাক্ষরতা ও (খ) জ্ঞান-দক্ষতায় ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী একটি নির্দিষ্ট বয়সের জনগোষ্ঠীর শতকরা হার*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো লাখ লাখ স্কুল বয়সী শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে। এই শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না নিলে এরা প্রাপ্ত বয়সেও অশিক্ষিতই থেকে যাবে। সরকার নিরক্ষরতা, অদক্ষতা এবং স্বল্প আয়ের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে বয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য শুধু শিক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে আয়নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের সাথে সাথে বিভিন্ন এনজিও, নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন সংগঠন প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে।

**সারণি ৪.৩ ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার**

| | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট প্রাপ্তবয়স্ক | ৫৩.৫ | ৫৮.৬ | ৬৪.৬ | ৭২.৩ | ৭২.৯ |
| পুরুষ | ৫৮.৩ | ৬২.৯ | ৬৭.৬ | ৭৫.২ | ৭৫.৭ |
| নারী | ৪৮.৬ | ৫৫.৪ | ৬১.৬ | ৬৯.৫ | ৭০.১ |

*উৎস: রিপোর্ট অন স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটিসটিকস, বিভিন্ন বছর*

১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৭ সালে প্রাপ্ত বয়স্কদের স্বাক্ষরতার হার ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৯ শতাংশে, যার মধ্যে ৭৫.৭ শতাংশ ছেলে এবং ৭০.১ শতাংশ মেয়ে। নারী ও পুরুষের স্বাক্ষরতার হারের মধ্যে পূর্বে বিদ্যমান বিরাট ব্যবধান সময়ের সাথে সাথে কমে এসেছে। প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার সম্প্রসারণে অবদান রেখেছে এমন মূল কারণগুলো হলো- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ এবং সরকার ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ (চৌধুরী এবং রহমান, ২০১৫)।

### *সূচক ৪.ক.১ মৌলিক পরিষেবা ও সুবিধাসমেত স্কুলের অনুপাত*

সকল শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে একটি নিরাপদ ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কিছু মৌলিক পরিষেবা ও সুবিধা প্রয়োজন। এর মধ্যে আইসিটি, ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার সুবিধা উপভোগ করার জন্য বিদ্যুৎ, অভিযোজিত অবকাঠামো, অক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য বই, স্কুল চলাকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য সুপেয় পানি, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন এবং হাত ধোয়ার জন্য সাবান ও পানি অন্তর্ভুক্ত। সকল স্কুলে এই ধরনের পরিষেবা ও সুবিধা থাকা উচিত। যদিও এই সূচক এদের মান কেমন হবে তা নির্দেশ করে না তবে এর মাধ্যমে কেবল এসব সুবিধার অস্তিত্ব গণনা করা যায়। এইধরনের পরিষেবা আছে এমন স্কুল সমূহের মধ্যে বিরাট তারতম্য লক্ষ্য করা যায় যেমন প্রায়, ৮২ শতাংশ স্কুলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকলেও মাত্র ১ শতাংশেরও কম স্কুলে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সেবা রয়েছে। সারা দেশে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যালয়গুলোতে পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে যদিও পানি ও স্যানিটেশনের মান এখনো উদ্বেগজনক।

### *সূচক ৪.গ.১ সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য ন্যূনতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এমন শিক্ষকদের অনুপাত*

একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন শিক্ষকগণ। আদর্শিকভাবে সকল শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত। তারা যে বিষয়গুলো পড়াবেন সেগুলোতে খুব ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। বর্তমানে প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত তথ্যগুলো শুধু মাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে যারা ডিপিইডি/ সি-ইন-এড শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের অনুপাতে ২০১৬ সালে সি-ইন-এড ডিগ্রি বেড়ে দাঁড়ায় মোট শিক্ষকদের ৭৫.৫ শতাংশে, আগের বছর ২০১৫ সালে যে হার ছিল ৭৩ শতাংশ।

### সারণি ৪.৪: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সি-ইন-ইডি (%)

| | ২০১৫ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| সি-ইন-ইডি শিক্ষকদের (%) | ৭৩ | ৭৫.৫ |

*(সূত্র: বিভিন্ন বছরের বার্ষিক প্রাথমিক স্কুল জরিপ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়)*

## ৪.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা

শিক্ষাখাতের বিস্তৃত অভীষ্ট হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার মান এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নয়ন, বৈষম্য কমানোর পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন করা। সরকার শিক্ষাখাতের লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি)" সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। পিইডিপি-৪ অনুমোদন করেছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য, যার লক্ষ্য হলো ২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় গ্রেড ৬-১২ অর্জন করা এবং এর পাশাপাশি গ্রেড-১২ এর ওপরে প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। শিক্ষাখাতের সংস্কারগুলোকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর মান টারশিয়ারি স্তরে উন্নত করার অভিপ্রায়ে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## ৪.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

অতীতে শিক্ষার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যদিও সকলের জন্য জীবনব্যাপী সমতাপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত মানের শিক্ষা সুযোগ তৈরিতে এখনো যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

**অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা:** প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের স্কুল অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ট বাড়লেও এখনো দেশে প্রায় ৪ মিলিয়ন স্কুলবয়সী শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশু, শিশু শ্রমিক, প্রতিবন্ধী শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু, দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী বাচ্চারা এবং বস্তিবাসী-অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বাঁধা রয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিশু অন্তর্ভুক্তির হার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে প্রাথমিক স্তরের একটি বড় অংশ মাধ্যমিক বিদ্যায়গুলোতে প্রবেশ করার আগেই ঝরে পড়ে। অন্যদিকে ১১-১৫ বছর বয়সী শিশুদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যও চোখে পড়ে; সামনে আসে অর্থনৈতিক, গ্রামীণ ও নগরকেন্দ্রিক বৈষম্য। যেমন, দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্কুলে গমনের হার ৭৬.৮ শতাংশ, যেখানে অ-দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ৮৬.৯ শতাংশ (এইসআইইএস-২০১৬)। আবার গ্রামীণ (৭৯.০ শতাংশ) এবং শহুরে (৬৮.১ শতাংশ) দরিদ্র শিশুদের মধ্যেও স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান, যাতে দেখা যায় শহুরে দরিদ্র পরিবারগুলো শিশুদেরকে স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে গ্রামের চেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে। অধিকন্তু, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ মাধ্যমিকের পড়াশোনা শেষ করতে পারে না। তাছাড়া তৃতীয় স্তরের (টারশিয়ারি) শিক্ষায় প্রবেশের হার আরো কম এবং এক্ষেত্রেও রয়েছে অর্থনৈতিক এবং জেন্ডার বৈষম্য।

**গুণগত মান এবং প্রাসঙ্গিকতা:** প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে গুণগত মান একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরের শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পড়াশোনা এবং গণিতে সর্বনিম্ন দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। ফলে ঝরে পড়ার হার বাড়ে। নবম শ্রেণির ছাত্র যারা বাংলা, ইংরেজি এবং গণিতে অষ্টম শ্রেণি স্তরের দক্ষতা অর্জন করেছে, তাদের অনুপাত হলো যথাক্রমে ৪৪, ৪৪ এবং ৩৫ শতাংশ। এটা স্পষ্ট যে, প্রাসঙ্গিক দক্ষতা অর্জনে ছাত্রদের অনুপাত পঞ্চম শ্রেণির চেয়ে বেশি (বাংলাতে ২৫ শতাংশ এবং গণিতে ৩৩ শতাংশের তুলনায়)। নিম্নমানের শিক্ষার্থীদের নবম শ্রেণিতে ওঠার আগেই ঝরে পড়ার পেছনে এটা অন্যতম একটি কারণ। যাইহোক, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়েছে: (১) প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের ব্যাপক অভাব বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে; (২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাজুড়ে পাঠসূচীতে বর্ণমালা, সামঞ্জস্য এবং শিক্ষা উপকরণের বোঝা; (৩) শিক্ষক নিয়োগ, নিবন্ধন এবং তাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; (৪) শিক্ষায় মান ঘাটতি; (৫) শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জামের অভাব।

বলাই বাহুল্য, দক্ষ শ্রমবাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য উচ্চশিক্ষার মান এবং প্রাসঙ্গিকতা বেশ অপর্যাপ্ত। এর পেছনে প্রধান কারণগুলো হলো: (১) পশ্চৎপদ পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষণ-শিক্ষার উপকরণ; (২) অপর্যাপ্ত শিক্ষণ সুবিধা- যেমন আধুনিক ল্যাব এবং অন্যান্য সরঞ্জাম; (৩) শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের সীমিত সুযোগ; (৪) যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে ছাত্রদের নিয়োগ দিতে পারবেন এমন নিয়োগকর্তার অভাব। এর কারণ শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের প্রাসঙ্গীকতার অভাব।

**শিক্ষা প্রদানের গুণগত মান:** সরকারের ভর্তুকি সহায়তায় মাধ্যমিক শিক্ষার বেশির ভাগই (৯৬ শতাংশ) প্রদান করা হয় বেসরকারি স্কুলগুলোর মাধ্যমে। এই সকল স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের একটি বড় অংশের পেশাগত প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং শিক্ষা প্রদানমূলক দক্ষতার অভাব রয়েছে।

**জীবনব্যাপী শিক্ষা:** ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান তৈরি করতে হলে উচ্চ এবং উচ্চতর যোগ্যতা, জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ প্রয়োজন। এর অর্থ হলো, দেশের উন্নয়নে এবং কল্যাণে অবদান রাখার জন্য মানুষকে তার জীবদ্দশার প্রতিটি পর্যায়ে জ্ঞান ও দক্ষতার স্তর উন্নত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা যেন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে সেদিকে নজর দিতে হবে। এ জন্য বাংলাদেশকে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষণ কর্মসূচী, কর্মক্ষেত্রে শিক্ষণ, ধারবাহিক পেশাগত উন্নয়ন, নতুনদের জন্য বিভিন্নমুখী কোর্স-কার্যক্রম, পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান, মুক্ত শিক্ষণ, দূর-শিক্ষণ এবং ই-শিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

## ৪.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশ প্রাপ্ত বয়স্কদের স্বাক্ষরতা এবং সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক বিকাশ ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশ উচ্চ মাধ্যমিক আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে বিষয়গুলো ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জেন্ডার সমতা ও শিক্ষায় অতীতে যে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে তা টেকসই হতে হবে। সর্বস্তরের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

(১) শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ও মেধা উন্নয়নের জন্য সকল শিশুদেরকে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের শারিরিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। এতে করে শিশুদের জন্য প্রাথমিক ও উচ্চস্তরে শিক্ষার সুযোগ বাড়বে।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মূল দৃষ্টিপাত হবে নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর: (ক) বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, অঞ্চল, জাতি এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থানের সকল স্কুল বয়সী শিশুদের জন্য স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করণ; (খ) স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং (গ) যথাযথ পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদানের দক্ষতা, দক্ষ শিক্ষক নির্বাচন, চাকুরীর পূর্বে প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে উন্নত করণ।

(৩) স্কুল পর্যায়ে শিক্ষক ও স্কুল কর্মকর্তাদের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে হবে। এক্ষেত্রে, ধারাবাহিকভাবে ছাত্র-শিক্ষক ও স্কুলের কর্মদক্ষতার মান পরিমাপ, চাকুরীর পূর্বে এবং চাকুরীরত অবস্থায় শিক্ষকদের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, ছাত্র-শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জবাবদিহিতা ও অণুপ্রেরণা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৪) তৃতীয় স্তরের (টারশিয়ারি) শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন: (ক) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; (গ) মান উন্নয়নে পাঠ্যক্রম আপডেট করা; (ঘ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন কমিশন (ইউজিসি) পুর্নগঠন; (ঙ) পাঠ্যক্রম নকশায় বিশেষজ্ঞ, চাকুরীদাতা এবং বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তি; (চ) গবেষণা ও উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ইন্টার্নশিপসহ নানা উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একটি কার্যকর শিক্ষা- শিল্প সংযোগ স্থাপন; (ছ) গুণগত মান নিশ্চিয়তা পদ্ধতি বাস্তবায়ন; (জ) কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি পদ্ধতি তৈরি; এবং (ঝ) দক্ষতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন চালু করে টিভিইটিতে কার্যকর করা।

(৫) সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমানের গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন: (ক) গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সক্রিয় গবেষণা পরিবেশ; (খ) গবেষণার প্রয়োজনীয় এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থ-তহবিলের নিশ্চয়তা; (গ) আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণামূলক সহযোগিতা বৃদ্ধি; (ঘ) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশিদারিত্ব এবং (ঙ) প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে অংশিদারিত্ব।

(৬) জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রকৃতি এবং ভূমিকা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৭) শিক্ষা আইন (যা এখনো প্রক্রিয়াধীন) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হবে এবং মন্ত্রণালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা হবে।

## ৪.৬ সারাংশ

বাংলাদেশে জেন্ডার সূচক (জেন্ডার প্যারেটি ইনডেক্স-জিপিআই) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ১ অতিক্রম করেছে এবং গত প্রায় এক দশক ধরে ১ এর ওপরেই রয়েছে। তৃতীয় স্তরের (টারশিয়ারি) শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সূচক ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ০.৭৩৭ এ পৌছে। ২০১৬ সালে অবশ্য এই সূচক কিছুটা কমে ০.৭০১তে নেমে আসে। টারশিয়ারি শিক্ষার ক্ষেত্রে জিপি-আই এর দিক পরিবর্তনের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক বাংলা এবং গণিত পড়ার ক্ষেত্রে সর্ব নিম্ন দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি এবং ২০ শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী ২০১৫ সালে ইংরেজি পড়ার সর্বনিম্ন দক্ষতা অর্জন করেছিল। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মোট বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির অনুপাত ২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর ১.৪৫ শতাংশ পয়েন্ট হারে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি, শিক্ষার বৈষম্য হ্রাস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী দক্ষতার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ ও নানামুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী অগ্রগতি অর্জিত হলেও, এখনো নানা রকম চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। তবে সরকার ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা বাস্তবায়ন, সর্বস্তরে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাক্ষরতা এবং দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সচেতন। শিক্ষাখাতের অতীতের অর্জনগুলোকে ধরে রাখতে এবং উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় সব সময়ই মনযোগী হতে হবে

# ৫

# জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

## জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

## ৫.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

২০০০-২০১৫ সময়কালে বিশ্বব্যাপী জেন্ডার সমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছে। স্কুলে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং বিশ্বের অনেক দেশেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও নারী ও মেয়েদের মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য রয়েই গেছে। সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করতে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরন, তাদের প্রতি সকল সহিংসতা নির্মূলকরণ এবং নারী ও শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক সবধরনের কর্মকাণ্ড রোধের উপর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সর্বজনীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুযোগবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সম্পদ যেমন ভূমি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ এই অভীষ্টে পৌছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ করে আইসিটিতে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত আইন ও তার প্রয়োগ জরুরী। সর্বোপরি, সমতা উন্নয়ন, প্রয়োগ ও নজরদারি করার জন্য একটি আইনি কাঠামো স্থাপন করা দরকার।

## ৫.২ সূচকের মাধ্যমে অভীষ্ট ৫ অগ্রগতি পর্যালোচনা মূল্যায়ন

### *সূচক ৫.২.১ বিগত ১২ মাসে সহিংসতার ধরণ ও বয়স ভেদে বর্তমান বা প্রাক্তন স্বামী ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কর্তৃক শারিরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী বিবাহিত নারী ও মেয়েদের অনুপাত*

পুরুষ শাসিত সমাজগুলোতে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (বর্তমান বা প্রাক্তন) কর্তৃক নারীর প্রতি সহিংসতা বৈবাহিক এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ চিত্র, যার মাধ্যমে জেন্ডার অসমতার বিষয়টি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত করতে ২০১১ সালে এবং ২০১৫ সালে পৃথক দুইটি জরিপ পরিচালনা করেছে। ২০১১ সালের জরিপে দেখা যায়, বিগত ১২ মাসে বর্তমান ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দ্বারা কোনো না কোনো ধরণের সহিংসতার শিকার হয়েছিল শতকরা ৬৬.৯ শতাংশ নারী। এর বিপরীতে ২০১৫ সালে ৫৪.৭ শতাংশ বিবাহিত নারী ও মেয়েরা তাদের স্বামী কর্তৃক কোনো না কোনো ধরণের সহিংসতার শিকার হয়। তবে প্রাক্তন স্বামী বা সঙ্গীর দ্বারা সংগঠিত সহিংসতার বিষয়ে এই সময়ের কোনো তথ্য নেই। ২০১৫ সালের জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, দুই জরিপের মধ্যবর্তী সময়ের নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার ঘটনা কমেছে এবং নারীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু বিবিএস (২০১৬) এর এক হিসেবে দাবী করা হয়, উল্লেখিত পার্থক্যটি কেবল দু'টি জরিপের পদ্ধতিগত কারণে হয়েছে, প্রকৃত পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটেনি।

***সূচক ৫.২.২ বিগত ১২ মাসে বয়স ও সংঘঠনস্থল ভেদে স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক যৌন সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও মেয়েদের অনুপাত***

যৌন সহিংসতা বলতে বোঝায়, কোনো ধরণের ক্ষতিকারক বা অযাচিত যৌন আচরণ যা অন্য কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে এটিকে অপরাধী কর্তৃক জোরপূর্বক যৌন কর্মে বাধ্যকরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২০১৫ সালের বিগত ১২ মাসে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব নারী ও মেয়েদের মধ্যে ২.৫ শতাংশ নারী ও মেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে (বিবিএস, ২০১৬)।

### *সূচক ৫.৩.১ ১৫ বছর এবং ১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ বা কোনো প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অনুপাত*

১৫ বছর এবং ১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ বা কোনো প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৩.৮ শতাংশ (এমআইসিএস, ২০১২-১৩) এবং ৫৮.৬ শতাংশ (বিডিএইচএস, ২০১৪)।

***সূচক ৫.৪.১ বয়স, জেন্ডার এবং স্থান ভেদে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ব্যয়িত সময়***

অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ব্যয়িত সময় মানে হলো, নারী ও পুরুষেরা কী পরিমাণ সময় নিজেদের ঘর- গৃহস্থালি এবং পরিবার ও নিজের জন্য ব্যয় করে থাকে। সাধারণত নারীরা গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজের বিরাট অংশ নিজেরা বহন করে যার মাধ্যমে এইসকল কাজের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য ফুটে ওঠে। অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ২৪ ঘন্টায় দৈনিক গড়ে কত ঘন্টা পরিমাণ সময় ব্যয় করা হয় তা বিভাজনের মাধ্যমে এই সূচক হিসেব করা হয়েছে। ২০১২ সালে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত "টাইম ইউজ পাইলট সার্ভে"তথ্যগুলোর একমাত্র উৎস যেখানে দেখানো হয়েছে, এই সকল কাজে পুরুষরা গড়ে ৫ শতাংশ এবং নারীরা গড়ে তাদের সময়ে ২৫.৮ শতাংশ ব্যয় করে ।

### *সূচক ৫.৫.১ জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী আসনের অনুপাত*

জাতীয় সংসদ এবং সরকার প্রধান হিসেবে নারী নেতৃত্ব রয়েছে এমন দেশের একটি বড় উদাহরণ বাংলাদেশ। বর্তমানে জাতীয় সংসদের স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং সংসদ উপনেতা সকলেই নারী।

**সারণি ৫.১: সংসদে মহিলা সদস্যদের অনুপাত, ১৯৯১-২০১৫**

| | ১৯৯১ | ১৯৯৬ | ২০০১ | ২০০৮ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মহিলা সদস্য সংখ্যা | ৪২ | ৪৩ | ৪১ | ৬৪ | ৭০ | ৭১ | ৭১ | ৭২ |
| মোট সিট সংখ্যা | ৩৩০ | ৩৩০ | ৩৩০ | ৩৪৫ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ |
| শতকরা | ১২.৭৩ | ১৩.০৩ | ১২.৪২ | ১৮.৫৫ | ২০.০০ | ২০.২৯ | ২০.২৯ | ২০.৫৭ |

*উৎস: বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয় (বিপিএস)*

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে নারীর ক্ষমতায়ন পরিস্থিতি এবং জেন্ডার সমতা ভালো অবস্থানে রয়েছে। তবে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। যদিও এখনো কম মনে হচ্ছে, তথাপি স'ময়ের বিবর্তনে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৯১ সালের ১২.৭৩ শতাংশের তুলনায় ২০১৫ সালে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ২০.২৯ শতাংশ। গত সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। বর্তমান সংসদে ২০ জন সরাসরি নির্বাচিত নারী সাংসদ রয়েছেন। এছাড়াও ২০১৫ সালের উপ-নির্বাচনে আরো একজন নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৭ সালের উপ-নির্বাচনেও একজন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। যার ফলে সংসদে নারী সংসদ সদস্যের হার বেড়ে ২০.৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আইনই, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগসহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পদের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকতর অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

## ৫.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা

বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত আছে এবং দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই এই সমস্যা মোকাবেলা করে নারী উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। দেশের সংবিধানেও এই বিষয়ে জাতির অঙ্গীকার সন্নিবিশিত করা হয়েছে।

**বৈশ্বিক উদ্যোগে সরকারের অংশগ্রহণ:** নারী ও মেয়েদের অধিকার ও উন্নয়নে বাংলাদেশ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মলন ও চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালে নারীর বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য দূরীকরণ কনভেনশন অনুসমর্থন করে (সিইডিএডব্লিউ)। বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন (বিপিএফএ) অনুমোদন করে ১৯৯৫ সালে এবং ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও ২০১৫ সালে টেশসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে।

**নীতি ও আইনী কাঠামো:** দেশে নারী অধিকার সংরক্ষণ করতে সরকার বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ আইন- ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ বিধি- ২০১৩, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন- ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন- ২০১২, জাতীয় এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইন- ২০১০, পর্ণগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১২, শিশু নীতি- ২০১১, শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন- ২০১৭, ডিএনএ আইন- ২০১৪ এবং যৌতুক নিষিদ্ধ বিল- ২১৮ (সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছিল)। জাতীয় এবং বিভিন্ন খাতভিত্তিক নারী অধিকার সংরক্ষণে প্রয়োজনমাফিক পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণে মনযোগ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

**নারীদের মানবীয় সক্ষমতা উন্নয়ন:** এই ক্ষেত্রটি নারীদের স্বাস্থ্যসেবা, আয়ু, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা যার মাধ্যমে নারীরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুফল লাভ করতে পারে, তার ওপর গুরুত্বারোপ করে। সহিংসতা এবং অযাচিত বলপ্রয়োগ থেকে নারীর স্বাধীনতার বিষয়টিও এখানে অন্তর্ভুক্ত।

**নারীর অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি:** নারীদের উৎপাদনশীল সম্পদ, অন্যান্য সম্পদ, সেবা, দক্ষতা, সম্পত্তি, কর্মসংস্থান, আয়, তথ্য, প্রযুক্তি, আর্থিক সেবা এবং সামাজিক সম্পদ যেমন ভূমি, পানি ও বনসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা তৈরি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

**নারী উন্নয়নের জন্য একটি সক্রিয় পরিবেশ তৈরিকরণ:** সামাজিক- রাজনৈতিক পরিবেশ, আইনী ও নীতিগত সহায়তা এবং অন্যান্য সামাজিক নিয়মগুলো এই অংশে গুরুত্বপূর্ণ। আইনের প্রয়োগ, জেন্ডার-বিযুক্ত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ, জেন্ডার ইস্যু যথাযথভাবে বুঝতে পারা এবং বিভিন্ন জেন্ডার পরিকল্পনার উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও জেন্ডার পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন সামাজিক বিশ্লেষণ দক্ষতা অর্জনও এই অংশের মূল ক্ষেত্র।

**জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরি:** আনুষ্ঠানিক বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন জেন্ডার মাত্রা অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার সব ধরণের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতা উন্নয়ন করতে জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট (জিআরবি) চালু করে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি এবং সেগুলো জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে পর্যালোচনা নিশ্চিত করার জন্য বেশকিছু নির্দেশিকাও জারি করে। অর্থবছর ২০১৯ এ জিআরবিতে চলমান মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা অর্থবছর ২০১০ এর চেয়ে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩ এ দাঁড়িয়েছে । ২০১৯ অর্থবছরে নারী উন্নয়ন ব্যয় বেড়েছে মোট বাজেটের ২৯.৬৫ শতাংশ, যা জিডিপির প্রায় ৫.৪৩ শতাংশ। অর্থবছর ২০১০ এ এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মোট বাজেটের ২৪.৬৫ শতাংশ।

## ৫.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

*নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধকরণ*

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেতে থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে শারিরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার ঘটনা দেশে (৮২ শতাংশ) এবং দেশের বাইরে (১৮ শতাংশ) ব্যাপকহারে বেড়েছে। সহিংসতার উৎস এবং কারণ যেহেতু একাধিক, এগুলো নির্মূল করতে বহুমুখী পদক্ষেপেরও প্রয়োজন। এর মধ্যে পরিবারের অনুপ্রেরণা, সামাজিক সহায়তা বৃদ্ধি, আইনী বিধান প্রয়োগ, নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, কম খরচে আইনি সেবা, অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যদিও বাংলাদেশ সরকার এরই মধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু সমস্যার মাত্রা ও জটিলতার তুলনায় তা যে অপ্রতুল তা অস্বীকার করা যায় না।

*বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ*

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ এবং দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের কারণে বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার কমছে। শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন, জেন্ডার বৈষম্য, হয়রানি এবং সামাজিক চাপের কারণে সংঘটিত বাল্যবিবাহ রোধে বাংলাদেশ বরাবরের মতো বিভিন্ন আইন, নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ চালু রাখবে।

*কর্মক্ষেত্রে এবং জনসমাবেশে নারীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করণ*

কর্মক্ষেত্র এবং জনসমাবেশে নারীদের প্রতি কূটক্তিমূলক মন্তব্য, টিজিং ইত্যাদি অশোভন ক্রিয়াকলাপ বন্ধে উৎসাহ প্রদান এবং নির্মূল করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। নারীর প্রতি কূটক্তিমূলক মন্তব্য থেকে বিরত রাখতে সামাজিক সচেতনতা তৈরি এবং প্রেরণা প্রদান, যৌন হয়রানি মোকাবেলায় আইন প্রণয়ন, জনসমাবেশে কূটক্তির (ভিএডব্লিউ) শিকার হলে পূর্ণ আইনী সহায়তা প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রকাশ্য শাস্তির বিধান করতে হবে। এর মাধ্যমে নারী সহায়ক কর্মক্ষেত্র এবং জনপরিবেশ নিশ্চিত করার পথ সুগম হবে।

*জেন্ডার ডিজিটাল ডিভাইড*

জেন্ডার ডিজিটাল ডিভাইড এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এখনো নারীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকার মুখোমুখি হচ্ছে যা তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজির দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভাজন ব্যাপক। ইংরেজি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পুরুষদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ পুরুষ টিভি ব্যবহার করেন, ৮৮ শতাংশ মোবাইল ব্যবহার করেন এবং ৮১ শতাংশ ব্যবহার করেন ইন্টারনেট। এর বিপরীতে নারীদের উপরোক্ত পন্থা ব্যবহারের হার যথাক্রমে ৪৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ এবং ১৯ শতাংশ (টিয়ার্স, ২০১১)।

## ৫.৫ অগ্রগতির সারাংশ

১৫ এবং তদূর্ধ্ব বছর বয়সী নারী ও মেয়েরা তাদের বর্তমান বা প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এবং ঘনিষ্ঠ সঙ্গী নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়। ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের কর্তৃক সহিংসতার ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ২০১৫ সালের বিগত ১২ মাসে ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও মেয়েদের মধ্যে ২.৫ শতাংশ নারী ও মেয়ে সহিংসতার শিকার হয়েছে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা। পুরুষের তুলনায় নারীরা অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যার কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পরিমাণ ভার গ্রহণ করে। সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের অনুপাত ক্রমশ বাড়ছে এবং ২০১৭ সালে তা বেড়ে ২০.৫৭ শতাংশে দাড়ায়।

জেন্ডার বৈষম্য মোকাবেলায় জাতীয় প্রতিশ্রুতি সংবিধানে সন্নিবিশিত করা হয়েছে। জেন্ডার বৈষম্য সমাধানে বৈশ্বিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ, নীতিমালা প্রণয়ন ও আইনী কাঠামো প্রস্তুত, নারী মানবাধিকারের উন্নয়ন, তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি, নারী উন্নয়নের জন্য নারীবান্ধব সক্রিয় পরিবেশ, জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ এরই মধ্যে সরকার গ্রহণ করেছে। যাই হোক, দেশে জেন্ডার সমতা অর্জনে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল করা, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং জেন্ডার ডিজিটাল ডিভাইড মোকাবেলা করা।

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা এগিয়ে আছে, । নিচের সারণিতে সেই চিত্র তুলে ধরা হলো। দেখা যায়, বাংলাদেশ ০.৭২১ স্কোরসহ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং এ ৪৮তম স্থানে আছে, যা দক্ষিণ এশীয় প্রেতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় নারীর ক্ষমতায়নে উন্নততর অবস্থান নির্দেশ করে।

**সারণি ৫.২ দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের আপেক্ষিক চিত্র**

| মোট | বাংলাদেশ | মালদ্বীপ | ভারত | শ্রীলংকা | নেপাল | ভূটান | পাকিস্তান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| র‍্যাঙ্কিং | ৪৮ | ১১৩ | ১০৮ | ১০০ | ১০৫ | ১২২ | ১৪৮ |
| স্কোর | ০.৭২১ | ০.৬৬২ | ০.৬৬৫ | ০.৬৭৬ | ০.৬৭১ | ০.৬৩৮ | ০.৫৫০ |

*উৎস: বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৮*

# ৬

# নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন

## সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

## ৬.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য জরুরী হচ্ছে এর ব্যবহার ও ব্যবহাকারীসহ জলচক্রের (ওয়াটার সাইকেল) দিকে পুরোপুরি দৃষ্টি দেওয়া। দেশগুলোতে প্রথাগত খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও সম্পদ থেকে সড়ে আসতে হবে এবং এসডিজি ১১.৫ লক্ষ্যমাত্রায় দেয়া পানি সম্পর্কিত দুর্যোগের সাথে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে মিঠা পানির প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো একই অভীষ্ঠের আওতায় আনা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। আর তা করতে পারলে সেটা হবে খাত খন্ডনকরন এবং পানি সম্পদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানকল্পে আরও সুসংহ পদ্ধতি গ্রহণ যাতে বিভিন্ন প্রয়োজনকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মোকাবেলা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই কাজটাই এসডিজি- ৬ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেটা হচ্ছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের সুনির্দিষ্ট পানযোগ্য পানি ও মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে পানি, অপচয়িত পানি এবং বাস্তুতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা। এর ফলে একটা টেকসই পানি-ভবিষ্যত বিনির্মানে এসডিজি-৬ হবে বড় পদক্ষেপ (ইউএন ওয়াটার, ২০১৬)।

অভীষ্ট ৬ এর উদ্দেশ্য হলো বাস্তু ও জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলোকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা। গুণগত মানসম্পন্ন টেকসই পানি সম্পদ এবং পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা না গেলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দারিদ্র্য নিরোসনে এসডিজির অর্জনগুলোও বাধাগ্রস্থ হবে। জাতিসংঘের এসডিজি রিপোর্ট ২০১৭ (জাতিসংঘ, ২০১৭) অনুসারে ৭১ শতাংশ মানুষ "নিরাপদ ব্যবস্থাপনা" পানি পরিষেবা এবং ৩৯ শতাংশ মানুষ "নিরাপদ ব্যবস্থাপনা" পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা ব্যবহার করে।

বহুবছর ধরে বাংলাদেশ তার জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানির ব্যবহার এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষতার সাথে কাজ করে আসছে। আর্সেনিক আবিষ্কারের আগে দেশটি প্রায় সর্বজনীন পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছিল। খোলা জায়গায় মলত্যাগের ঘটনা এখন নেই বললেই চলে। এই ধরনের উন্নতির ফলে অভ্যন্তরীণ রোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

**পানি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল (এইচএলপিডব্লিউ)**

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ মহাসচিবের উপদেষ্টা পরিষদ (ইউএনএসজিএবি) পানি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সমন্বয়ে উচ্চ-স্তরের একটি জোট গঠনের সুপারিশ করেছেন। এই জোট পানির স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা ও অভিযোজনে বৈশ্বিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবে বলে ধারণা দেয়া হয়।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে দাভোসের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান জিম ইয়ং কিম পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি-৬) অর্জনের জরুরী পদক্ষেপ হিসেবে হাই-লেভেল প্যানেল অন ওয়াটার প্রতিষ্ঠায় তাদের আগ্রহের কথা ঘোষণা করেন।

২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘের সদর দফতরে দুই বছরের জন্য জল উচ্চস্তরের ওয়াটার প্যানেল (এইচএলপিডব্লিউ) চালু করা হয় এতে ১১টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এশিয়া থেকে এইচএলপিডব্লিউ এর উচ্চপর্যায়ের প্যানেলে গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২০০০-১৫ সময়কালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে এবং এইচএলপিডব্লিউ এর ১১টি দেশের মধ্যে শক্ত অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এইচএলপিডব্লিউ এর প্রধান কাজ হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এবং মধ্য থেকে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো অর্জন করা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এইচএলপিডব্লিউ সক্রিয়ভাবে একটি প্রাথমিক পরামর্শ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত আছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান জিম ইয়ং কিম যৌথভাবে এর সভাপতিত্ব করেন; দুইজন বিশেষ উপদেষ্টাসহ ১০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণকে নিয়ে ১০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং মরিশাস ও মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতিগণ এর সহ-সভাপতিত্ব করেন এবং কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে পানি বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করেন।

## ৬.২ সূচকের মাধ্যমে অভীষ্ট ৬ অগ্রগতি পর্যালোচনা

### *সূচক ৬.১.১ নিরাপদ খাবার পানির সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত*

আর্সেনিক দূষণ সমন্বয় করার পর বর্তমানে ৮৭ শতাংশ মানুষ নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহার করছে। এই অসাধারণ অগ্রগতি সত্ত্বেও এসডিজির যাত্রাকালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে এমন দেশের তালিকা বাংলাদেশ ছিল দ্বিতীয়। অপর দিকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহার করছে এমন দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভূটান এবং তারপরেই রয়েছে মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার অবস্থান।

চিত্র ৬.১ খাবার পানি সরবরাহের পরিমাণ (শতাংশ)

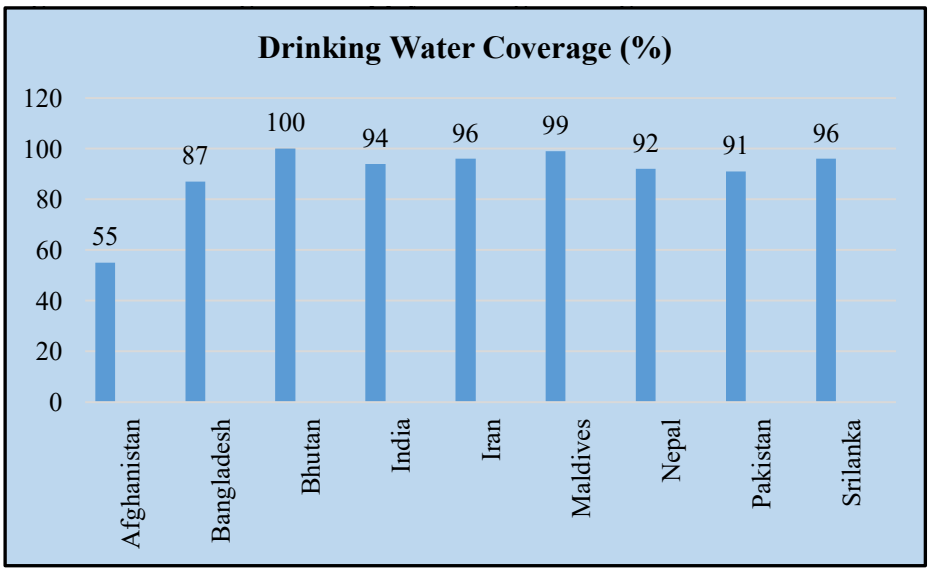


*সূত্রঃ বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ও ইউনিসেফের যৌথ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম ইউএনজেএমপি, ২০১৭*

### *সূচক ৬.২.১ সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন সেবা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত*

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের যৌথ পর্যবেক্ষণে পরিচালিত 'প্রোগ্রাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন' (জেএমপি) অনুযায়ী, নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা হলো জনসাধারণ কর্তৃক অন্য কোনো পরিবারের সাথে ভাগ না করে নিজস্ব উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সেবার ব্যবহার, যেখানে পয়ঃনিসৃত ময়লা নিরাপদে নিষ্পত্তি করা হয়। ২০১৫ সালের জেএমপি রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে মাত্র ১ শতাংশ মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেছে, ১০ শতাংশ ব্যবহার করছে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট, ২৮ শতাংশ অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে টয়লেট ব্যবহার করছে এবং ৬১ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যকর উন্নত টয়লেট ব্যবহার করছে (ইউনিসেফ ও ডব্লিউএইসও, ২০১৫)। বাংলাদেশে ২০০৩ সালে প্রথম বারের মতো দেশব্যাপী একটি ভিত্তিরেখা জরিপ পরিচালিত হয়েছিল, যেখান থেকে দেখা যায় দেশে উন্নত স্যানিটেশনের আওতায়রয়েছে মাত্র ৩৩ শতাংশ মানুষর ৪২ শতাংশ মানুষের ব্যবহারের জন্য কোনো ল্যাট্রিন নেই। এ থেকে বোঝা যায়, ২০০৩ সালের পরবর্তী সময়ে দেশে উন্নত স্যানিটেশন আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ শতাংশ।বিবিএস এবং ইউনিসেফ (২০১৪) অনুসারে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাসহ পরিবারে বাস করছে। শহুরে এলাকায় এই হার ৮৬.৩ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় ৭৪.৪ শতাংশ। তবে বিভাগ অনুযায়ী বরিশাল বিভাগের বাসিন্দারা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাভোগে তুলনামূলক খানিকটা পিছিয়ে রয়েছে, এই অঞ্চলে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহারের হার শতকরা ৫৮.৮ শতাংশ। উন্নত স্যানিটেশনের ব্যবহার সম্পদের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে শতকরা ৯৫.৮ শতাংশ মানুষ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করে যেখানে। দরিদ্র পরিবারের ব্যবহারের হার ৪৫.৬ শতাংশ। ব্যবহারের জন্য কোনো টয়লেট সুবিধা নেই এমন জনসংখ্যার হার সামগ্রিকভাবে যদিও খুব কম, তবুও রংপুর বিভাগের কিছু অতি দরিদ্র পরিবারের জন্য এটি এখনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান আছে।

বাংলাদেশ এরই মধ্যে 'দুর্গম এলাকার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন জাতীয় পরিকল্পনা ২০১২' প্রস্তুত করতে গিয়ে হাইড্রো-ভূতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্গম এলাকা এবং বাসিন্দা চিহ্নিত করেছে। গত চার বছর ধরে পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির (ওয়াশ) ওপর সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে। এর জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ২০১৪-১৫ এর চেয়ে ৫.০৬ বিলিয়ন টাকা বাড়িয়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪৬.১৯ বিলিয়ন টাকা। স্যানিটেশনের জন্য বরাদ্দ পানির বরাদ্দের তুলনায় ১০ গুণ কম । অন্যান্য বৈষম্য মোকাবেলার জন্যই স্যানিটেশন উন্নয়ন করা জরুরী। ভৌগলিকভাবে পৌছানো কঠিন যেমন- চর, হাওড়, উপকূলীয় এলাকা এবং পাহাড়ী অঞ্চলসহ এসব এলাকার জন্য (ওয়াশ ইনভেস্টমেন্ট অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম)। সাশ্রয়ী মূল্যে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য উপযুক্ত টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনো ব্যবধান রয়ে গেছে। বিশেষত জলবায়ুর পরিবর্তনের হুমকিতে থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন (ডিডিএইসই, ২০১৬বি)।

এদিকে আবার টেকনাফ এলাকায় প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থী হঠাৎ করেই খাবার পানি ও স্যানিটেশনের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভৌগলিকভাবে দুর্গম অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। টিউবয়েলের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া এবং ল্যাট্রিনের উপচে পড়া ময়লা শরণার্থীদের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করছে।

### *সূচক ৬.৩.১ নিরাপদে পরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত*

পরিবেশবিধি ১৯৯৭ প্রণয়নের পর থেকেই বাংলাদেশে বর্জ্যপানির নিরাপদ নিষ্পত্তি করার জন্য আইন রয়েছে। কিন্তু অনেক শিল্প কারখানাই এ আইন মোতাবেগ বর্জ্যপানির নিরাপদ ব্যবস্থাপনার কোনো পদ্ধতি নেই। শহুরে এলাকাগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র ঢাকা শহরে বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার সুবিধা রয়েছে, তাও মাত্র ২০ শতাংশ।

***ঢাকার হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরকরণ***

হাজারিবাগ থেকে ট্যানারিগুলো সাভারে পুনঃস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এ বছরেই। গত ৬০ বছর ধরে ট্যানারিগুলো ঢাকার হাজারিবাগে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল কিন্তু এই ট্যানারিগুলো থেকে নিঃসরিত বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে মিশে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করায় এই স্থানান্তর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। শিল্প দূষণ থেকে একটি নদীকে বাঁচাতে সম্পূর্ণ একটি শিল্প ইউনিট স্থানান্তরের ঘটনা দেশে এই প্রথম উদাহরণ তৈরি করল। সাভারে ট্যানারি শিল্পকে ঘিরে একটি কেন্দ্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট (ইটিপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে মেশার আগেই বর্জ্য ব্যস্থাপনা সম্ভব হবে।

### *সূচক ৬.৪.২ পানির উপর চাপের মাত্রা: বিশুদ্ধ পানি সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সুপেয় পানি উত্তোলনের অনুপাত*

জিইডি (২০১৫) অনুসারে, ২০১০ সালে বাংলাদেশের মোট পানি সম্পদ ব্যবহারের অনুপাত ছিল ২.৯ শতাংশ। বাংলাদেশ পানি সম্পদ সমৃদ্ধ একটি দেশ। এদেশে অভ্যন্তরীণ নবায়নযোগ্য পানি সম্পদের পরিমাণ ১০৫ ঘনমিটার/ বছর (জাতীয় পানি পরিকল্পনা ফেজ ২ এর ওপর ভিত্তি করে) যার মধ্যে ৮৪ ঘনমিটার পানি ভূ-পৃষ্ঠ এবং বৃষ্টিপাত থেকে প্রবাহিত এবং আনুমানিক ২১ ঘনমিটার পানি আসে ভূগর্ভস্থ প্রবাহ থেকে। দেশের সীমানার বাইরে থেকে আসা নদীর পানির প্রবাহের পরিমাণ বার্ষিক ১১০৫.৬৪ ঘনমিটার, যা দেশের মোট নবায়নযোগ্য পানি সম্পদের প্রায় ৯০ ভাগ যা আনুমানিক ১২১০.৬৪ ঘনমিটার । ২০০৮ সালে দেশের মোট পানি উত্তোলনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫.৮৭ ঘনমিটার, যার মধ্য থেকে ৩১.৫০ ঘনমিটার (৮৮ শতাংশ) ব্যবহার করা হয় কৃষিকাজে, ৩.৬০ ঘনমিটার (১০ শতাংশ) ব্যবহার করে নগর ও পৌরসভাগুলো এবং ০.৭৭ ঘনমিটার (২ শতাংশ) পানি ব্যবহৃত হয় শিল্পকারখানায়। দেশের মোট পানি উত্তোলনের ২৮.৪৮ ঘনমিটার বা ৭৯ শতাংশ আসে ভূগর্ভস্থ পানি থেকে এবং ৭.৩৯ ঘনমিটার বা ২১ শতাংশ পানি আসে ভূপৃষ্ঠ থেকে।

### *সূচক ৬.৫.২ পানি বিষয়ক সহযোগিতার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ আন্তঃসীমান্ত অববাহিকা অঞ্চলের অনুপাত*

বাংলাদেশের মোট ৫৭টি আন্তঃসীমানা নদী রয়েছে। এর মধ্যে ভারত থেকে এসেছে ৫৪টি এবং মায়ানমার থেকে এসেছে ৩টি নদী। এই নদীগুলোর মধ্য থেকে ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর জন্য কার্যকর হবে এমন একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে যা ২০২৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই চুক্তি মতে, প্রতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে সময়ের মধ্যে ভারত দশ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেবে, যাতে চুক্তিতে সম্মত পরিমাণ পানি বাংলাদেশে আসতে পারে। সে সময় ফারাক্কা পয়েন্টের নিচে পানির প্রবাহ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যৌথ কমিটির দায়িত্ব ছিল চুক্তি অনুযায়ী পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো ধরণের সমস্যা তৈরি হলে তার সমাধান এবং ফারাক্কা বাঁধের কার্যক্রম তদারকি করা। এই ব্যাপারে উত্থাপিত কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে যৌথ কমিটি যদি তা সমাধানে সক্ষম না হয়, তবে সেটা সরাসরি চলে যাবে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের নিকট। শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার স্বল্প পানি প্রবাহ সমস্যার সমাধানে দু'টি সরকার পারস্পারিক সহযোগতীর প্রয়োজনিয়তায় স্বীকৃতি দিয়েছে। একই সাথে সমতা, ন্যায্যতা এবং উভয় পক্ষের কারো কোনো ক্ষতি হবে না এমন শর্তে যৌথ নদীগুলোর পানি ভাগাভাগি সংক্রান্ত নীতিমালায় উভয় সরকারই সম্মত হয়েছে।

### *সূচক ৬.৬.১ সময়ের সাথে সাথে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন*

***হালদা নদী পুনঃনির্মাণ প্রকল্প ঃ***

চট্টগ্রামের হালদা নদী দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীভিত্তিক ইকোসিস্টেম। এটি বিশ্বের একমাত্র মিঠাপানির জোয়ার-ভাটা নদী যেখানে প্রধান প্রধান ভারতীয় কার্প মাছের ডিম প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাস্তুতন্ত্রের অবনতির কারণে মাছের ডিম সংগ্রহ ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রম বিশেষ করে, সেচের জন্য নদীর পানি ব্যবহার, অবৈধ মৎস আহরণ, নদী গর্ভস্থ বালি খনন, শিল্প দূষণ প্রভৃতির কারণে মাছের প্রজনন ব্যাপকভাবে ব্যহত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নদী পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও স্থানীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। নদী থেকে বালি উত্তোলন বন্ধ করা, যান্ত্রিক নৌ চলাচল, রাবার বাঁধ হ্রাস, মা মাছ সংরক্ষণে প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরণের পদক্ষেপের জন্য এ বছর (২০১৮) হালদা নদীতে মাছের ডিম সংগ্রহে সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছে।

## ৬.৩ ভবিষ্যত করণীয়ঃ বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনার প্রস্তুতি

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ অর্জন এবং বৈশ্বিক প্লাটফর্ম হাইলেভেল প্যানেল অফ ওয়াটার (এইচএলপিডব্লিউ) বাংলাদেশের মাননীয় সদস্যকে সহায়তা করার লক্ষ্যে মুখ্য সচিবকে শেরপা করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়, যেখানে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা এবং নামকরা বিশেষজ্ঞরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। শেরপা ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন, যার কাজ হলো পরবর্তী দুই বছর এইচএলপিডব্লিউতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করে তার মাধ্যমে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করা। উক্ত কর্মশালায় বুদ্ধিবৃত্তিক এবং যৌক্তিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সেন্টার ফর এনভাইরনমেন্টাল এ্যান্ড জিওগ্রাফিক সার্ভিস (সিইজিআইএস)কে নিযুক্ত করা হয়েছে। এসডিজি ৬ এর দুইটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ছয়টি ভিন্ন লক্ষ্য পূরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্তও গৃহিত হয়েছে।

### ৬.৩.১ *ধারণাপত্র প্রস্তুতির উদ্যোগ*

২০ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সমন্বয়কারী হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এর ওপরে ধারণাপত্র প্রস্তুত করতে একটি উদ্যোগসভার আয়োজন করে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব। যেখানে মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিভাগ, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষাবিদ এবং পানি ও পরিবেশ সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পাঁচটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ধারণাপত্র প্রস্তুতির কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি ছয়টি প্রধান লক্ষ্য পূরণের পদক্ষেপসমূহ সমন্বয় করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: (ক) জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর; (খ) পরিবেশ অধিদপ্তর; (গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; (ঘ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; এবং (ঙ) বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বিভাগ। ধারণাপত্র তৈরির সমুদয় কার্যক্রম তদারকি এবং নথিগুলো চূড়ান্ত করার জন্য জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিইজিআইএসকে।

বৈঠকে প্রস্তুতকালীন সময়ে ধারণাপত্র পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করতে সকল সমন্বয়কারী সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, ১৩ জন নামকরা শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং পেশাদার বিশেষজ্ঞকে সমন্বয়কারী বিভিন্ন এজেন্সি এবং সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

### ৬.৩.২ *লাইট হাউস উদ্যোগ*

***এইচএলপিডব্লিউ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ দু'টি লাইট হাউস উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপঃ***

নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করণ এবং স্থানী আবহাওয়া শীতল রাখতে পুকুর খনন ও পুনঃখনন

এই প্রকল্পে, প্রতিটি মৌজায় কমপক্ষে একটি পুকুরকে দূষণ থেকে রক্ষা করা হবে। এটা হবে খাবার পানি এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত নিরাপদ পানির উৎস। এই সুরক্ষিত পুকুরে বাইরে থেকে কোনো ময়লা পানি প্রবেশ করতে পারবে না। শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি এবং ভূগর্ভস্থ পানির অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এই পুকুরের পানির যোগান ঠিক থাকবে।

***বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক উন্নয়ন***

বাংলাদেশ সরকার দেশের স্কুলগুলোতে বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে একটি আদর্শ ওয়াশ ব্লক স্থাপন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) একটি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম (পিইডি) গ্রহণ করেছে, যার আওয়তায় 'ওয়াশ ব্লক' নামে একটি দারুণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েরা নিরবচ্ছিন্ন পানিসরবরাহ সহ আলাদা টয়লেট ব্যবহারের সুবিধা পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের প্রধান সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এই প্রকল্পের সহ-বাস্তবায়নকারী হিসেবে কাজ করছে।

## ৬.৪ অগ্রগতির সারাংশ

সহস্রাব্দ উন্নয় অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য খুব ভালোভাবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির অংশ হিসেবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এর জন্য এইচএলপিডব্লিউ সদস্য করা হয়েছে। এই সদস্যপদ এসডিজি ৬ এর অনেকগুলো ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করেছে এবং এমওডব্লিউআর দ্বারা একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে ৮৭ ভাগ জনগোষ্ঠীর নিরপদ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে (লক্ষ্য ৬.১) এবং ৬১ ভাগ মানুষের জন্য নিরাপদ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা হয়েছে (লক্ষ্য ৬.২)। এই সূচকগুলো সম্পর্কে হালনাগাদকৃত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য লক্ষ্যমান ৬.৩ (পানির মান উন্নয়ন) এবং লক্ষ্যমান ৬.৬ (জলবাস্ত সংরক্ষণ) সংক্রান্ত দুইটি প্রধান উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। ভয়াবহ দূষণের শিকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানির গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকার হাজারিবাগ থেকে ট্যানারিগুলোকে সাভারে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। হালদা নদীর ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার তাৎক্ষণিক ফলস্বরূপ বড় মাছের ডিম সংগ্রহে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

# ৭

# সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

## সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

## ৭.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই জ্বালানি সুযোগ লভ্যতা কেবলমাত্র একটি বৈশ্বিক অভীষ্টই নয়, এসডিজির অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনেও অত্যন্ত মৌলিক যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলা শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ, শিল্পায়ন এবং টেকসই পরিবেশ আওতায় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রেও এই অভীষ্ট একটি মৌলিক উপাদান। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। চীন ২০১৫ সালে পূর্ণ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে বিদ্যুতের আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত ২০০০ সালে ৭৭.৭৩ শতাংশ থেকে২০১৫ সালে ৮৭.০৩ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় বিদ্যুৎ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শতকরা ৭৭.৭৩ ভাগ এবং শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে শতকারা ৯৬.৫৮ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে। বিশ্বজুড়ে এখনো প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবা নিশ্চিত করতে চায়। সেই লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির বিপুল বিস্তার ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তি সুবিধা নিশ্চিত করণে জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরো বাড়ানো জরুরী। উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সম্পদ সহযোগিতার বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

## ৭.২ সূচকের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা

গতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত রূপান্তরের কারণে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সৃষ্টি হয়। ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার ফলে বিদ্যুতের অধিষ্টিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ৪০০৫ মেগাওয়াট থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১,৫৯২ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০৩৩ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ৭৮১৭ মেগাওয়াটে পৌছেছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত খানাগুলোর আনুপাতিক হার ২০০০ সালের মাত্র ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে ৮০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই অগ্রগতির পেছনে অন্যতম কারণ হলো ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন এবং সকলের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার নিরলস প্রচেষ্টা। এদেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীই রান্নাবান্নার কাজে বিভিন্ন জৈব জ্বালানি যেমন- কাঠ, গাছের পাতা, ফসলের উচ্ছিষ্ট, গোবর ও কাঠের গুড়া ব্যবহার করে থাকে। অনেকেই রান্নার জন্য কেরোসিন চুলার পাশাপাশি আলোর জন্য কেরোসিন বাতি ব্যবহার করে থাকে। এই জ্বালানি ব্যবহারের ফলে গৃহঅভ্যন্তরে বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। যোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য রক্ষায় অনেকেই জ্বালানি ও আলোক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অজৈব জ্বালানি যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস, এলএনজি, গ্রিড বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি (সোলার পিভি), স্টোরেজ সেল এবং ড্রাইসেল ব্যাটারি ইত্যাদি ব্যবহার করছে। এছাড়াও রান্নাবান্নার কাজে প্রযুক্তি নির্ভর পন্থা যেমন উন্নত কুকিং স্টোভসহ বিভিন্ন ধরণের পন্থা ক্রমেই পরিচিতি লাভ করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য (এসভিআরএস, ২০১৮) অনুযায়ী, ২০১৭ সালে মোট গ্যাস ব্যবহারের হার ছিল মাত্র ২০.৫ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে দাঁড়ায় ২৩.১ শতাংশ। এ ধরনের স্বল্প ব্যবহারের প্রধান কারণ হলো পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির সংকট। বাংলাদেশ সরকার নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও দেশের জ্বালানি শক্তিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য বিভিন্ন নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জলশক্তি উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ করছে, যদিও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের হার এদেশে এখনো অনেক কম।

### *সূচক ৭.১.১ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত*

বিদ্যুৎ জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে, খানা-ভিত্তিক উৎপাদন সহজতর করে এবং বিদ্যুৎ সেবা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চলমান রাখে। দেশে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন, ২০০০ সালে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার হার ছিল ৩১.২ শতাংশ, যা ২০১০ সালে এসে প্রায় ৫৫.২৬ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১৬ সালেও বিদ্যুৎ সুবিধা উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময় বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৭৫.৯২ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮৫.৩ শতাংশে পৌছায়। দেশীয় উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে তীব্রতর সরকারি প্রচেষ্টার ফলে ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালে বিদ্যুতায়নের বিস্তৃতি প্রায় ২০ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যা পরবর্তী বছরে আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে আছে: সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগসহ বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা, সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশিদারিত্ব (পিপিপি), রেন্টাল ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন (আরপিপি), ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্লান্ট (আইপিপি) এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার এর অধীনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখীতার জন্য বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি কয়লা, পারমানবিক শক্তি এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার, শুল্ক সমন্বয়, নতুন সংযোগে সীমিত বন্টন এবং সিস্টেম লস কমানোসহ বৈদ্যুতিক চাহিদা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। মোট কথা, অভীষ্ট ৭ অর্জনে সরকার ২০৩০ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনার জন্য 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৬' প্রস্তুত করা হয়েছে।

**সারণি ৭.১: বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত (%)**

| অঞ্চল | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | ৩১.২ | ৪৪.২৩ | ৫৫.২৬ | ৭৫.৯২ | ৮৫.৩ |
| শহর | ৮০.৪ | ৮২.৬১ | ৯০.১০ | ৯৪.০১ | প্রাপ্ত নয় |
| গ্রাম | ১৮.৭ | ৩১.১৯ | ৪২.৪৯ | ৬৮.৮৫ | প্রাপ্ত নয় |

*উৎস: বিবিএস, এইসআইইএস, বিভিন্ন বছর; তথ্য ২০১৭, শক্তি বিভাগ*

তবে লক্ষ্যণীয় হলো এই সূচক সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতার নীরিখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুনগত মানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে না। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট এখনও একটি সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল, কিন্তু এটি বায়ুদূষণের মাধ্যমে মারাত্মকভাবে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। চলেছে, তবে বাংলাদেশ সরকার রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা দূষণের মাত্রা কমাতে সক্ষম হবে। অধিকন্তু, সরকার ভবিষ্যতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ইকো বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

### *সূচক ৭.১.২ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ও প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত*

বাংলাদেশে রান্নার কাজে ব্যবহৃত জ্বালানি ব্যবহারে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নগরউপকণ্ঠ ও গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলো জ্বালানি হিসেবে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন জৈব জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল যেমন- কাঠ, গাছের ডাল ও পাতা, পশুর বিষ্ঠা (গোবর) এবং বিভিন্ন কৃষিজ উচ্ছিষ্ট যেমন- খড়কুটো, তুষ, আখের ছোবড়া, পাটকাঠি প্রভৃতি । শহর এলাকায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে তুলনামূলক বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন জ্বালানি যেমন বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও এলএনজি ব্যবহার করে থাকে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে শহর উপকণ্ঠ ও গ্রামাঞ্চলে দক্ষ বৈদ্যুতিক চুলা এবং এলএনজি'র ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ২০০০-২০১৫ সালের মধ্যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তি ব্যবহারে জনসংখ্যার অনুপাত প্রতি বছর ০.৬৩ শতাংশ পয়েন্ট হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ১.০৪ শতাংশ পয়েন্ট। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০২০ সালের মধ্যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে ও প্রযুক্তি ব্যবহারের হার হবে ২০.৯৩ শতাংশ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশ কম।

**সারণি ৭.২: রান্নায় পরিষ্কার জালানি ও প্রযুক্তিতে সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত (%)**

| ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ | ২০১৫ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|
| ৭.২৪ | ৯.৭৪ | ১২.৯ | ১৬.৬৮ | ১৭.৭২ |

*উৎস: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্ব ব্যাংক*

### *সূচক ৭.২.১ মোট জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ*

অনবায়নযোগ্য জ্বালানির একটি প্রধান উৎস হলো ঐতিহ্যবাহী জৈব-জ্বালানি, যা গ্রামাঞ্চলে রান্নাবান্না ও ধানসিদ্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ হ্রাস, আমদানীকৃত জ্বালানির মূল্যে উদ্বায়িতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইয়ের চিন্তা মাথায় রেখে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস উন্নয়ন এবং প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুর্গম গ্রামীণ এলাকায় ও জাতীয় গ্রিডে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সহজলভ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিভিন্ন উৎস যেমন- সৌরশক্তি, জৈববস্তুপুঞ্জিভূত গ্যাস, বর্জ্য বায়োগ্যাস, জলবিদ্যুৎ এবং বায়ু বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যেতে পারে। খুশীর কথা যে, দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা এবং দুর্গম গ্রামাঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ দিনদিন জনপ্রিয় হচ্ছে। ২০১৫ সালে মোট চূড়ান্ত জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের হার অনুমান করা হয়েছে ২.৭৯ শতাংশ বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তবে দু'টি প্রধান আন্তঃসম্পর্কীয় কারণে এই লক্ষ্য অর্জন বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে: একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সরবরাহ ধীর গতিতে বাড়ছে এবং অন্যদিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অনবায়নযোগ্য উৎস ব্যবহারের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

**সারণি ৭.৩: মোট জ্বালানি ব্যবহারে নবায়ণযোগ্য জ্বালানির অংশ (%)**

| ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|
| ২.৭৯ | ২.৮৫ | ২.৮৭ |

*উৎস: এসআরইডিএ*

### *সূচক ৭.৩.১ প্রাথমিক জ্বালানি ও জিডিপি অনুযায়ী জ্বালানির ঘনত্ব পরিমাপ*

জ্বালানির নিবিড়তা একটি দেশের জ্বালানি দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে, যে দক্ষতার সাথে উক্ত দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন সংঘটিত হবে। এটি পরিমাপ করা হয় এক একক স্থির পিপিপি ডলার জিডিপি (কন্সট্যান্ট পিপিপি ডলার জিডিপি) উৎপাদনে কত একক জ্বালানি (মেগা জুল) ব্যবহার করা হয় তার ভিত্তিতে। তবে এটি জ্বালানি দক্ষতার একটি অসম্পূর্ণ প্রতিনিধি, কারণ অর্থনীতি ও প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা যেমন- জলবায়ু, অর্থনীতির অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন ইত্যাদির মাধ্যমে এই দক্ষতা প্রভাবিত হতে পারে। এর মান কম হলে বুঝতে হবে যে, অর্থনীতির জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । ২০১৫ সাল থেকে প্রাথমিক জ্বালানি স্তরে জ্বালানির নিবিড়তায় নানা উত্থান-পতন ঘটেছে। তবে আগের বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে জ্বালানি দক্ষতার তুলনামূলক উন্নতি হয়েছে। তবুও ২০২০ সালের মধ্যে এই খাতের লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে, কারণ একক নির্ধারণে এসআরইডিএ যে পরিমাপ একক ব্যবহার করেছে তা এম এ্যান্ড ই কাঠামোতে ব্যবহৃত এককের সাথে তুলনীয় নয়।

**সারণি ৭.৪: প্রাথমিক জ্বালানির তীব্রতার স্তর (প্রতি বিলিয়ন বাংলাদেশী টাকায় তেল সমতুল্য কিলোটন (কোটি)**

| ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|
| ৩.৬৩ | ৩.৬৭ | ৩.৫৬ |

*উৎস: এসআরইডিএ*

## ৭.৩ সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারি প্রচেষ্টাসমূহ

নতুন শতকের প্রথম দশকে ক্রমবর্ধমান চাহিদার মুখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ ঘাটতি, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, সঞ্চালন ও বন্টনের ক্ষেত্রে নানা সংকটপ্রসূত বিদ্যুৎ ঘাটতি, ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং অস্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নাগরিক কল্যাণে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে এবং মধ্য থেকে দীর্ঘ মেয়াদী তরান্বিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করতে সরকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা মাস্টার প্ল্যান-২০১০ গ্রহণ করেছে যার মূল লক্ষ্য হলো, ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৯ হাজার মেগাওয়াট অধিষ্ঠিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিশ্চিত করা। সে অনুসারে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। বেসরকারি খাতকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে উৎসাহিত করতে সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিওসার (আরপিপি) এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) কে গুরুত্ব দিয়ে একটি নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম পণ্য, কয়লা এবং পারমানবিক জ্বালানি নির্ভরশীলতা হ্রাস করে প্রাথমিক জ্বালানির বহুমুখীকরণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎখাতের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে লোকসান কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ২০০৮ সালে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ঘোষণা করেছে যদিও ২০১৫ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ, ২০০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ এবং ১০০ মেগাওয়াট অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। সরকার ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করে দেশীয় চাহিদা সরবরাহ ঘাটতি পূরণ করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ নেপালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে ও ভারতের মধ্য দিয়ে তা আমদানির বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করছে। সঞ্চালন ও বন্টনের লোকসান কমানো, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সকলের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনে সঞ্চালন ও বন্টনের ওপর সমন্বিত বিনিয়োগ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বচ্ছ ও অধিক টেকসই জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উন্নত রান্নার চুলা (আইসিএস) ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এসব চুলা জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রথাগত জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে কম ধোয়া উৎপন্ন করে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নিজেদের জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলো অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে এই পরিকল্পনা কাজ করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০৩০ সালের মধ্যে

সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক জ্বালানি সেবা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

১. বৈদ্যুতিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে) ২৩,০০০ মেগাওয়াট, ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি করা;

২. সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ ২০১৫ অর্থবছরে ৩ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে বাড়ানো এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ;

৩. বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ/ হালনাগাদ করা, সাব-স্টেশন স্থাপন/ হালনাগাদ করা, স্টেশন স্থানান্তর, নদী পারাপারে সক্ষম টাওয়ার নির্মাণ, ট্রান্সফর্মারসমূহের প্রতিস্থাপন, প্রি-পেইড মিটারের ব্যবহার বৃদ্ধি, বিতরণ ব্যবস্থার পুর্নবাসন ও তীব্রতা বৃদ্ধি, গ্যাস বরাদ্দ নীতি তৈরি (এলপিজি এবং বায়োগ্যাস বিকল্পনীতি), দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান নীতি, দেশীয় কয়লা রপ্তানী নীতি, জ্বালানি ভর্তুকি নীতির উন্নয়ন, দেশীয় পরিবহন খাতে এলপিজি ব্যবহারে প্রচারণা, এলএনজি কৌশল আমদানি এবং কয়লা সুবিধা আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪. নতুন করে ৭০,০০,০০০ ভোক্তাকে সংযোগ প্রদান এবং ৩০,০০০ গ্রামে বিদ্যুতায়ন।

*২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ*

১. ৫০০ মেগাওয়াট সৌরশক্তি কর্মসূচী গ্রহণ (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ৩৪০ মেগাওয়াট এবং ১৬০ মেগাওয়াট সামাজিক খাতে;

২. বাণিজ্যিক প্রকল্প গ্রহণ যেমন- (ক) সোলার পার্ক (গ্রিড যুক্ত); (খ) সৌরভিত্তিক সেচ; (গ) সৌর মিনিগ্রিড/ মাইক্রো গ্রিড; (ঘ) সৌর ছাদ; এবং

৩. সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ যেমন- (ক) গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র; (খ) দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (গ) ইউনিয়ন ই-সেন্টার; এবং (ঘ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের ধর্মী স্থাপনা।

*২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি দক্ষতার সার্বিক বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গৃহিত হবেঃ (ক) জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ; এবং (খ) উন্নত রান্নার চুল্লিতে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থাকরণ।*

## ৭.৪ মূল চ্যালেঞ্জসমূহ

*বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ অর্জনে নিম্নোক্ত প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়ঃ*

- বিদ্যুৎ সুবিধা পায়নি এমন শিল্প, বাণিজ্য এবং পরিবারগুলোর বর্তমান চাহিদা এবং ভবিষ্যতের বর্ধিত চাহিদা পূরণে জ্বালানি শক্তির সরবরাহ দ্রুত হারে বৃদ্ধি করা।

- ২০২৩ সালের মধ্যে বিদ্যমান গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানীগুলো কর্তৃক উপকূলী এবং উপকূল-বহির্ভূত অঞ্চলে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ।

- সাধারণচক্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সমন্বিতচক্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রূপান্তরকরণ (উদাহরণস্বরূপ- ব্রয়লার থেকে নিঃশেষিত গ্যাস ব্যবহার করতে কো জেনারেশন সিস্টেম বাস্তবায়ন) এবং শিল্প ও পারিবারিক খাতে প্রি-মিটারিং এর মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করণ।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমূল্যে এলএনজি আমদানি বাংলাদেশর বিভিন্ন পরিণতি ডেকে আনে । বাংলাদেশের ভরযুক্ত গড়পড়তা গ্যাস শুল্ক প্রতি জিগাজুলে ১.৭ মার্কিন ডলার থেকে ৩.১ মার্কিন ডলারে যেতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি শিল্পখাতে উৎপাদন খরচ বাড়াবে, যা শিল্প প্রতিযোগীতাকে প্রভাবিত করবে বলে ধারণা।

- কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রক্ষেপিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর ৬০ মিলিয়ন টন কয়লার প্রয়োজন হবে। এই বিশাল পরিমাণ কয়লা সামাল দেয়া, বন্দর, রেল পরিবহন ও কয়লা মজুদ অবকাঠামোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

- জ্বালানির দাম (বিদ্যুৎ, তৈল এবং গ্যাস) এবং এইখাতে ভর্তুকি অর্থনীতির জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। যদি বিদ্যুতের দাম তেলের দাম ও দেশীয় গ্যাসের সুযোগ ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে তাহলে বিদ্যুৎ উপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে বিদ্যুতের দামও বাড়বে। জ্বালানিখাতে ভর্তুকি দেশের জিডিপির ২-৩ শতাংশ হতে পারে বলে হিসাব করা হয়েছে।

- সবশেষে, ভবিষ্যতে কয়লাভিত্তিক শক্তির ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি শক্তি ও জ্বালানি খাতের টেকসই শক্তিকে কিছুটা পশ্চাদগমন করতে পারে।

## ৭.৫ ভবিষ্যত করণীয়

সকলের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার অবিশ্রান্ত কাজ করে যাচ্ছে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান নীতি পরিবেশ অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে এবং নতুন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎখাত মূলত প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশি উৎপাদন শতক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। গ্যাসের মজুদ হ্রাস এবং দেশের কয়লা উন্নয়নে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে বাংলাদেশ জ্বালানি আমদানির দিকে ঝুঁকছে। আর এ জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ প্রান্তিক পর্যায়ে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার জাতীয় গ্রিডের সাথে অত্যন্ত দক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগের চেষ্টা করছে। যোগ্য একক চক্র বিদ্যুৎকেন্দ্র হালনাগাদ করা হচ্ছে সম্মিলিত চক্র বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য। অনেক পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্রে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। আসন্ন সকল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে সর্বাধুনিক আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি, সালফার নির্গমনে গ্যাস চিমনী এবং ইলেকট্রসটেটিক প্রেসিটিপেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এমন প্রমাণিত ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যুৎখাতে দক্ষতা অর্জনে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে। অন্যদিকে গ্যাসের চাহিদা মেটাতে সরকার এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা করছে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ফ্লোটিং স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউএস) নির্মাণাধীন রয়েছে।

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে শক্তিখাতের সেবাগুলো কর্তৃক গ্রিডভিত্তিক নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় কিছু প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে রয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন সুবিধা কার্যকর করতে নির্দিষ্ট লভ্যাংশের শর্তে বেসরকারি খাতে সহায়তা দিচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এনজিও ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হাওড়, উপকূলীয় অঞ্চল এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে নবায়নযোগ্য বায়ুশক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়া হবে।

- এসডিজি'র কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থায়ন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা প্রচলিত অর্থায়ন ছাড়াও উদ্ভাবনী অর্থায়ন অনুসন্ধান যেমন- এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সি (এসিএ) অর্থায়ন, আইপিপি প্রকল্পে বেসরকারি খাতের অর্থায়ন, যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প অর্থায়ন এবং জি টু জি অর্থায়ন কার্যক্রম চালু রাখা হবে।

- বাংলাদেশ বিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন এবং ভোগ বৃদ্ধিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ও জনগণের বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সফল হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে। একই সাথে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বন্টন, বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ, সীমান্ত পেড়িয়ে জ্বালানি বাণিজ্যে জড়ানো, সঞ্চালন ও বন্টনের ক্ষেত্রে লোকসান কমানো এবং বাজারে চাহিদা ব্যবস্থাপনাও এই লক্ষ্য পূরণে কাজ করেছে এবং আশা করা যায় এই কৌশল চালু থাকবে। প্রসঙ্গত, এখানে দু'টি বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন: (ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাওয়া; এবং (খ) বিদ্যুৎ খাত পরিচালনায় অব্যাহত ঘাটতি।

- বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কার্যক্ষমতার ক্ষতি রোধ করতে নিয়মিত দক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। অপরিকল্পিত উত্থান-পতন ছাড়া স্থিতিশীল ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নে সহায়তা করতে হবে। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তক হিসেবে তৈলভিত্তিক জেনারেটর থেকে নিজেদের খরচে বিদ্যুৎ উৎপদানের জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।

- সরকারকে জাতীয় জ্বালানি নীতি হুড়ান্তকরণ এবং সার্বিকভাবে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, অথবা একটি জ্বালানি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ক) গ্যাস বন্টন নীতি; (খ) দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান নীতি; (গ) দেশীয় কয়লা ব্যবহার; (ঘ) জ্বালানি আমদানি; (ঙ) চাহিদা ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি সংরক্ষণ ; (চ) উন্নত কুকিং স্টোভ; এবং (ছ) জ্বালানি ভর্তুকি ও মূল্য নির্ধারণ ।

## ৭.৬ সারাংশ

আনন্দ চিত্তে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ পরিবারের বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে; এই লক্ষ্য ২০১৭ সালেই ৮৫.৩ শতাংশে পৌছে গেছে। কিন্তু অন্যান্য জ্বালানি সূচকে দেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। দেশে পরিচ্ছন জ্বালানি ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী খানার অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে পৌছাবে ২০.৯৩ শতাংশে, যা অভীষ্ট লক্ষ্যের তুলনায় কম। নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধিতে ধীরগতি এবং অনবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত বৃদ্ধির সমন্বিত প্রভাবে মোট চূড়ান্ত জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ খুবই ধীরগতিতে বাড়ছে। এর ফলে ২০২০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি ভোগে শতকরা ১০ ভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে আশার কথা হলো, দেশে জ্বালানি দক্ষতার উন্নতি অব্যাহত রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ অর্জনের পরিপূরক প্রচেষ্টা হিসেবে সকল খানার জন্য নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার অন্য একটি প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি ৭ এর লক্ষ্যগুলো অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এসডিজি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে সর্বজনীন মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিতকরণ, মোট জ্বালানি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ বৃদ্ধি এবং দেশের জ্বালানি খাতের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ।এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জগুলো হলো- অর্থায়ন, মূল্য নির্ধারণ ও ভর্তুকি, মিশ্র জ্বালানি, গ্যাস অনুসন্ধান এবং জ্বালানির দক্ষতা অর্জন। এই সকল সমস্যা সমাধানে জাতীয় জ্বালানি মহাপরিকল্পনা (এনার্জি মাস্টার প্ল্যান) প্রণয়ন করা হয়েছে।

# ৮

# শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

**সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন**

## ৮.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৭ সালে বৈশ্বিক প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হিসাব করা হয়েছে প্রায় ৩.৯ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী মাথাপিছু প্রকৃত দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হারও বেড়েছে ২০০৫-২০০৯ সালে ০.৯ শতাংশ থেকে ২০১০-২০১৫ সালে ১.৬ শতাংশ (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)। তবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বেকারত্ব এবং শোভন কাজের ঘাটতি প্রকট আকারেই থেকে গেছে। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার রেকর্ড করা হয়েছে ৫.৭ শতাংশ, যেখানে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৯২ মিলিয়নেরও বেশী সকল বয়স/গোষ্ঠী ভেদে পুরুষের চেয়ে নারীদের বেকারত্বের হার বেশি। বিশ্বব্যাপী ১৫ এবং তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই শ্রমশক্তিতে যোগদানের হার হ্রাস পাওয়া অব্যাহত রয়েছে।

শ্রমশক্তিতে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণের হারের হ্রাস ধীর গতির হলেও আগের চেয়ে আরও বেশি নারী আজ শিক্ষিত এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করছে। আবার, বিশ্বব্যাপী নারীদের আয় পুরুষের চেয়ে গড়ে ২৪ শতাংশ কম (জাতিসংঘের এমডিজি রিপোর্ট, ২০১৫)।

শিশু শ্রম এখনো একটি গুরুতর উদ্বেগের কারণ হিসেবে রয়ে গেছে; যদিও কর্মরত শিশুর সংখ্যা (৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী) ২০০০ সালের ২৪৬ মিলিয়ন থেকে ২০১৬ সালে ১৫২ মিলিয়নে নেমে এসেছে (আইএলও, ২০১৭)।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮ এমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর গভীর দৃষ্টি দেয় যা হবে টেকসই এবং একইসাথে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কর্মরত ও বেকার ব্যক্তিদের গড় প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। বর্ধিত বহুমুখীতা এবং অব্যাহত প্রযুক্তিগত উন্নতি ও নবধারার মাধ্যমে আরও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং শ্রম নিবিড় উৎপাদন খাত তৈরির পথ সুগম হবে। সব বয়সী নারী, পুরুষ ও শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক খাতে আরো উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নত কর্ম পরিবেশ তৈরি করা হবে। এর ফলে বেকারত্বের হার, মজুরী ফারাক (ওয়েজ গ্যাপ) এবং শোভন কাজের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

## ৮.২ সূচকের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা

### *সূচক ৮.১.১ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার*

দারিদ্র্য বিমোচনের মতো দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সর্বদাই আলোচ্যসূচির শীর্ষে ছিল। বস্তুত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যে স্তম্ভগুলো ঘিরে রচিত তার মধ্যে আছে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ চিত্তাকর্ষক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে যা জুলাই ২০১৫ সালে নিম্ন থেকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরেও অবদান রেখেছে এবং ২০১৮ সালের মার্চে প্রথম ত্রৈবার্ষিক বিবেচনায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভে সক্ষম করে তুলেছে।

২০১৫ ভিত্তি বছরে মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপির বৃদ্ধি ছিল ৫.১৪ শতাংশ যা ২০১৭ সালে দাঁড়ায় ৫.৯৬ শতাংশ। এই বৃদ্ধির পেছনে প্রধান কারণ ছিল প্রকৃত জিডিপির ব্যাপক বৃদ্ধি (৭.২৮ শতাংশ) এবং তার সাথে যুক্ত একটা সফল জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতি। দ্বিতীয় কারণটির জন্য ২০১৬ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় বার্ষিক ১.৩৭ শতাংশে; একই সাথে ১৫-৪৯ বছর বয়স্ক নারীদের মোট প্রজনন হার (টিএফআর) দাঁড়ায় ২.১। বস্তুত, মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার আগের বছরগুলোর চেয়ে ত্বরান্বিত হয়, যেমন, ২০০১-২০১০ সময়কালে ৪.৩ শতাংশ থেকে ২০১১-২০১৩ সময়কালে ৫ শতাংশ। মাথাপিছু জিডিপির এই দ্রুততর বৃদ্ধি মার্কিন ডলারের পরিমাপে মাথাপিছু জিডিপি ২০১০ সালের চলতি হিসাবে ৭৫৭ মার্কিন ডলার থেকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালের জুনে দাঁড়ায় ১৫৪৪ ডলার। এসডিজির সময়কালে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি এই আশা জাগায় যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধরে নেয়া ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধির হার বাংলাদেশের নাগালের ভেতর রয়েছে।

### *সূচক ৮.২.১ প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার*

ন্যায্য ও সমতাপূর্ণতার ভিত্তিতে টেকসই এবং শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের সম্ভাবনা মূল্যায়নের ক্ষেত্রেএই সূচকটি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে শ্রম উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ প্রতি একক শ্রম বৃদ্ধি করলে কী পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তা পরিমাপ করা যায়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করতে শ্রম উৎপাদনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। উৎপাদনশীল পূর্ণ কর্মসংস্থান তৈরি ও সকলের জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টিতেও এটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৫ সালের ৪.৪৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৪.৯৯ শতাংশ। সবচেয়ে আশার কথা হলো যে, এই সূচকের ক্ষেত্রে ২০২০

সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ২০১৭ সালের মধ্যেই অর্জিত হয়ে গেছে। ২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী মানুষের মধ্যে কর্মে নিযুক্ত অথবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০.৮ মিলিয়ন (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫.৮ ভাগ),যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২.১৮ ভাগ বেশি। কর্মসংস্থানে নিয়োজিত মোট মানুষের মধ্যে প্রায় ৩৩.৯ শতাংশ নারী এবং এদের মধ্যে আবার ২৯.৫ ভাগ ১৫-২৯ বছর বয়সী এবং ৩০-৬৪ বছর বয়সী ৬৬.৫ ভাগ। বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে, শ্রম উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি আরো বাড়াতে শ্রম ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভৌত ও মানব পুঁজির বর্ধনশীল ব্যবহার প্রয়োজন।

**সারণি ৮.১: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (%)**

| | ২০১০ | ভিত্তি-বছর | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ৫.৭৭ | ৬.০৫ |
| ৮.১.১ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার | ৪.২০ | ৫.১৪ | ৫.৭৭ | ৬.০৫ |
| ৮.২.১ কর্মজীবী প্রতি মাথাপিছু জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার | | ৪.৪৯ | ৪.৯৯ | ৫.০ |

*উৎস: বিবিএস*

## *সূচক ৮.৩.১ জেন্ডারভেদে অ-কৃষিকাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত*

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তিতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান একটি বড় জায়গা দখল করে আছে। বলা হয়ে থাকে যে, এটা আমাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সূচক একটা বিষয়। এই বিপুল পরিমাণ অনানুষ্ঠানিক শ্রম বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের পক্ষে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ, এইসব অনানুষ্ঠানিক কাজের অধিকাংশই অনিয়মিত, অস্বীকৃত এবং অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল। এ সকল কাজের সামাজিক, আইনী ও শ্রম সুবিধা সাধারণত কম। যাই হোক, এই অনানুষ্ঠানিক কাজ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সুযোগ পায় না অথবা বিভিন্ন কারণে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ থেকে ছিটকে পড়ে এমন বিপুল পরিমাণ মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় এসব অনানুষ্ঠানিক কাজে।

অতি সাম্প্রতিক ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, দেশে মোট কর্মসংস্থানে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান হলো প্রায় ৮৫.১ শতাংশ; যার মধ্যে ৮২.১ শতাংশ পুরুষের এবং ৯১.৮ শতাংশ নারীর। শিল্প ও সেবাখাত মিলিয়ে এবং আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৫৯.৪ ভাগ অকৃষি খাতে । অকৃষি খাতে অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তির হার ২০১৫ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে এসে সামান্য পরিমাণে বেড়েছে– ২০১৫ সালের ৭৭.৫ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে ৭৮ শতাংশ। অনানুষ্ঠানিক খাতে ১৫-২৯ বছর বয়সী যুবজনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে অংশ হলো ৩১ শতাংশ, যা ২০১৫ সালের ৩৫.৬ শতাংশ থেকে কমেছে। অপরদিকে, ৩০-৬৪ বছর বয়সী মানুষের এই খাতে কর্মসংস্থান ২০১৫ সালের ৬২.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ৬৪.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বয়স কাঠামোতে শ্রমশক্তির এই পরিবর্তন সম্ভবত ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে: শ্রমিকরা শ্রমবাজারেও দেরীতে প্রবেশ করছে এবং একইসাথে আত্মীভূত হতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় নিচ্ছে।

## *সূচক ৮.৫.১ পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে (প্রতিবন্ধী) নারী ও পুরুষ কর্মীর ঘন্টাপ্রতি গড় উপার্জন*

দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের গড় আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বিবিএস এর সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভিত্তি বছরের ১২,৮৯৭ টাকার চেয়ে গড় মাসিক আয় একটু বেড়েছে, যদিও গত চার বছরে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই গড় প্রকৃত মজুরি কমেছে। অর্থবছর ২০১৬-১৭ সালে মাসিক গড় মজুরি ছিল ১৩,২৫৮ টাকা যা ২০১৩ সালে ১৪, ১৫২ টাকা বলে হিসাব করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে পুরুষের তুলনায় নারীদের প্রকৃত মজুরির হার দ্রুত কমে যাওয়ায় জেন্ডারভেদে মজুরি বৈষম্যের অবনতি ঘটেছে। ২০১৬ সালে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মজুরি হ্রাসের হার হিসাব করা হয়েছে ৩.৮ শতাংশ, যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে এই হ্রাসের হার ১.৯ শতাংশ (২০১৩)। এটা দেখায় যে, একই ধরণের কাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাট মজুরি বৈষম্য রয়েছে। ২০১৬ সালে পুরুষ ও নারীদের গড় মজুরি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১৩,৫৮৩ টাকা এবং ১২,২৫৪ টাকা; ২০১৩ সালে তা ছিল যথাক্রমে ১৪,৩০৯ টাকা এবং ১৩,৭১২ টাকা কর্মীদের উপার্জন স্তর উন্নীত করতে এবং এসডিজি লক্ষ্য ৮.৫ পূরণে যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে উৎপাদনশীল এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান- বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের নেতৃত্বে আছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে করে দেশী এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা যায়।

## *সূচক ৮.৫.২ পেশা, বয়স ও অসামর্থতা ভেদে বেকারত্বের হার*

অর্থনীতির কৃতিত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে ধারণা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, যদি কেউ কাজে নিয়োজিত না থাকে এবং সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজতে থাকে, তাকে বেকার বলে বিবেচনা করা হয়। যাই হোক মোট শ্রমশক্তির কতজন মানুষ বেকার সেই হিসাবে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সালে বেকারত্বের হারে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই সময়ের মধ্যে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ থেকে ৪.৩ শতাংশে ওঠানামা করেছে। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেকারত্ব পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি ঘটেছে যেমন, ২০১০ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৬ শতাংশ, ২০১৭ সালে যা একটু কমে ৪.২ শতাংশে নেমে এসেছে। এ দেশে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। নারী বেকারত্বের হার পুরুষ বেকারত্বের হারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। তবে আশার কথা হলো, ২০১৩ সাল থেকে নারীদের বেকারত্বের হার ক্রমহ্রাসমান। পুরুষদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার ২০১৩ সালের ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৩.১ শতাংশে পৌছায়। সব বয়সী মানুষের তুলনায় ১৫-২৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি; ১৫-২৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব ২০১৫-১৬ সালে ছিল ২০.৬ শতাংশ, যদিও ২০১৩ নাগাদ নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। যা ২০১৭ সালে অনেকটা কমে ১২.৩ শতাংশে নেমে আসে।

বাংলাদেশে বেকারত্বের হার সুদীর্ঘ সময় ধরে ৪ শতাংশের কাছাকাছি কিন্তু এ বিষয়টি নীতিসংক্রান্ত তেমন কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়, ২০২০ সালের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৫-২৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে নারীর বেকারত্ব দূরীকরণ ও শোভন কাজের সুযোগ নিশ্চত করতে সরকারী প্রচেষ্টা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

**সারণি ৮.২: বেকারত্বের হার, অ-কৃষিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও উপার্জন**

| | ২০১৩ | ভিত্তি-বছর ২০১৫ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|
| ৮.৫.১ জেন্ডারভেদে অকৃষি খাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত (শতাংশ) | ৭৮.৮৬<br>(পুরুষ:৭৮.৩৮<br>নারী:৮০.৩২) | ৭৭.৮<br>(পুরুষ:৭৫.২,<br>নারী:৮৮.৭)<br>(কিউএলএফএস, ২০১৫-১৬) | ৭৮.০<br>(পুরুষ:৭৬.০<br>নারী:৮৫.৫)<br>(কিউএলএফএস, ২০১৬-১৭) |
| ৮.৫.১ পেশা, বয়স, এবং শারীরিক সীমাবদ্ধতা ভেদে নারী ও পুরুষ কর্মচারীর ঘন্টা ভিত্তিক উপার্জন (টাকা/মাস) | গড়ে প্রতিমাসে আয়:<br>টাকা: ১১৪৯৩<br>(পুরুষ: ১১৬২১<br>নারী: ১১১৩৬) | গড়ে প্রতিমাসে আয়:<br>টাকা: ১২,৮৯৭<br>(পুরুষ: ১৩,১২৭<br>নারী: ১২,০৭২)<br>১৫-২৪: ১০,৮৬২<br>২৫-৩৪: ১২,৮০১<br>৩৫-৪৪: ১৪,০৫৩<br>৪৫-৫৪: ১৪,৮৫৭<br>৫৫-৬৪: ১৩,১৬০<br>৬৫+: ১০,৮৪৪<br>(কিউএলএফএস, ২০১৫-১৬) | টাকা: ১৩২৫৮<br>(পুরুষ: ১৩৫৮৩<br>নারী: ১২২৫৪<br>১৫-২৪: ১০৮৩১<br>২৫-৩৪: ১৩২০৪<br>৩৫-৪৪: ১৪১৪৩<br>৪৫-৫৪: ১৫৪৪৬<br>৫৫-৬৪: ১৪৫১১<br>৬৫+: ১১৫৮০<br>(কিউএলএফএস,২০১৬-১৭) |
| ৮.৫.২ জেন্ডার, বয়স এবং শারীরিক সীমাবদ্ধতা ভেদে বেকারত্বের হার | ক) জেন্ডার: উভয়: ৪.৩<br>(পুরুষ: ৩.০;<br>নারী: ৭.৩) | (ক) জেন্ডার: উভয়:৪.২<br>(পুরুষ: ৩.০; নারী: ৬.৮)<br>(খ)বয়স<br>১৫-১৭:১০.৫<br>১৮-২৪:১০.১<br>২৫-২৯:৬.৭<br>৩০-৬৪:১.৯<br>৬৫+:৪.২<br>(কিউএলএফএস,২০১৫-১৬) | ক) জেন্ডার :উভয়:৪.২<br>(পুরুষ:৩.১; নারী:৬.৭<br>(খ)বয়স<br>১৫-২৪:১২.৩<br>২৫-৩৪:৫.৭<br>৩৫-৪৪:১.২<br>৪৫-৫৪:০.৮<br>৫৫+ :০.৬<br>(কিউএলএফএস,২০১৬-১৭) |

*উৎস: বিবিএস, এলএফএস ২০১৩ এবং কিউএলএফএস ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭*

## *সূচক ৮.৬.১ শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় (এনইইটি) ১৫-২৪ বছর বয়সী এমন যুবকদের অনুপাত*

এই সূচকটি শ্রম বাজারে যুবকদের আগমনের ক্রান্তিকালে বিভিন্ন জটিলতা ও ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মোট তরুণ জনসংখ্যার অনুপাতে, শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে কিংবা কোনো কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের (এনইইটি) সাথে যুক্ত নয় এমন তরুণদের সংখ্যাকে এই সূচকটি প্রতিনিধিত্ব করে। যে সকল তরুণের শ্রম বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের মোট সংখ্যা প্রদত্ত সূচকের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত উচ্চ এনইইটি ও যুব বেকারত্বের নিম্ন হার দিয়ে বোঝা যায় যুব সমাজ ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত। ভিত্তি বছরে প্রায় ২৯.৮ শতাংশ যুবক (১৫-২৪ বছর বয়সী) কোনো শিক্ষা বা পেশায় যুক্ত ছিল না যা পরবর্তী বছরে প্রায় ৩০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ সালে এনইইটিতে যুব পুরুষের হার ১০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল যেখানে যুব নারীর হার প্রায় ৫০ শতাংশ!

**সারণি ৮.৩: শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে নেই এমন তরুণ-তরুণীর অনুপাত (এনইইটি)**

| | ভিত্তি-বছর ২০১৫ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|
| ৮.৬.১ শিক্ষা, কর্মসংস্থান অথবা প্রশিক্ষণে নেই তরুণ-তরুণীর (১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স) অনুপাত (শতাংশ) | ২৮.৮৮<br>(পুরুষ: ৯.৯,<br>নারী: ৪৬.৯) | ২৯.৮<br>(পুরুষ -১০.৩;<br>নারী-৪৯.৬) |

*উৎস: বিবিএস, কিউএলএফএস ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭*

## *সূচক ৮.৭.১ জেন্ডার ও বয়সভেদে শিশু শ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা*

শিশুর বয়স ও কাজের ধরন ভেদে শিশুদের জন্য উপযোগী কর্মঘন্টার চেয়ে বেশি পরিমাণে কাজ করাকে শিশুশ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যে কোনো ধরণের শিশুশ্রমই ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচ্য যা দূর করা অবশ্য প্রয়োজন। এরইমধ্যে শিশুদের জীবনে অর্থবোধক পরিবর্তন আনায়নে এবং শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজসহ সব ধরনের ঘৃন্যতম কাজ থেকে শিশুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার ২০১০ সালে জাতীয় শিশুশ্রমনীতি প্রণনয়ন করেছে। শিশুশ্রম নির্মূল করতে ২০১২-১৬ সময়ের মধ্যে দেশে জাতীয় শিশুশ্রম পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বিভিন্ন খাতে শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি (২০১২-২০১৬), শিশু অধিকার রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তি প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিশুশ্রম বন্ধ করতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা করে আসছে। এর ফলশ্রুতিতে প্রায় ৭৫ হাজার কর্মরত শিশু বিভিন্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগ শিশু শ্রম বন্ধ করতে "দেশভিত্তিক সংশ্লিষ্টতা এবং শিশুশ্রম হ্রাসে সহায়তা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহয়োগিতা করে যাচ্ছে।

"শিশুশ্রম জরিপ-২০১৩" বাংলাদেশে পরিচালিত অতি সাম্প্রতিক জরিপ। জাতিসংঘ কনভেনশনের ওপর ভিত্তি করে এই জরিপে শিশু শ্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- কর্মরত শিশু, শিশুশ্রম এবং বিপজ্জনক/ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু। এই জরিপ অনুযায়ী, ৩৯.৬৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী কর্মরত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৮.৭ শতাংশ (৩.৪৫ মিলিয়ন), ৪.৩ শতাংশ (১.৭ মিলিয়ন) হলো শিশু শ্রম এবং ৩.২ শতাংশ (১.২৮ মিলিয়ন) শিশু জড়িত আছে ঝুঁকিপূর্ণ/ বিপজ্জনক কাজে।

শিশুশ্রম জরিপ ২০০২-০৩ অনুযায়ী, ৫-১৭ বছর বয়সী ৪২.৪ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে প্রায় ১৭.৫ শতাংশই বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মে জড়িত, যার মধ্যে শুধু কাজ করে এমন শিশুদের হার ১১.৪ শতাংশ এবং স্কুলের পাশাপাশি কাজ করে এমন শিশুদের হার ৫.৭ শতাংশ। এদের মধ্যে ২১.১ শতাংশ হলো ছেলে শিশু এবং ৯.৯ শতাংশ মেয়ে শিশু।

## *সূচক ৮.৮.১ জেন্ডার ও অভিবাসীর অবস্থান ভেদে পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হওয়ার ঘটনার হার*

এই সূচকের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়, যা শোভন কাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায়, পেশাগত কারণে কর্মক্ষেত্রে আহত হওয়ার ঘটনা অনেকটাই কমেছে ২০১৫ সালে কর্মক্ষেত্রে মারাত্মক আহতের সংখ্যা ছিল ৩৮২, যা ২০১৬ সালে কমে ৭৫ এ নেমে এসেছে (লক্ষ্য ২০৩০)। অন্যদিকে, মারত্মক নয় এমন আহতের সংখ্যা বেড়েছে ২০১৫ সালে সাধারণ আহতের সংখ্যা ছিল ২৩০, ২০১৭ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮৮ জনে।

**সারণি ৮.৪: মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় পেশাগত আঘাত**

| | ভিত্তি-বছর ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|
| ৮.৮.১ জেন্ডার এবং অভিবাসন ভেদে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আঘাতের সংঘটন | ক) মারাত্মক ক্ষতি: ৩৮২<br>(পুরুষ: ৩৬২<br>নারী: ২০)<br>খ) মারাত্মক ক্ষতি নয়: ২৪৬<br>(পুরুষ: ১৭৭<br>নারী: ১৯) | ক) মারাত্মক ক্ষতি: ১০৩<br>(পুরুষ: ১২৪<br>নারী: ০৮)<br>খ) মারাত্মক ক্ষতি নয়: ৯০<br>(পুরুষ: ৬২<br>নারী: ৩৯) | মারাত্মক ক্ষতি: ৭৫<br>(পুরুষ: ১০৫<br>নারী: ২৭)<br>মারাত্মক ক্ষতি নয়: ৪৮৮<br>(পুরুষ: ২৮৫<br>নারী: ২৪৮) |

*উৎস: এমওএলই*

## *সূচক ৮.১০.১ (ক) প্রতি ১০০,০০০ বয়স্ক জনে এটিএম বুথ ও (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা*

এই সূচকের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রবেশগম্যতা মূল্যায়ন করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা বা প্রবেশাধিকার সকলের জন্য বিশেষ করে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ সংকটে ভুগছে, তাদের জন্য ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করে। ২০১৬ সালে প্রতি ১০০,০০০ বয়স্ক জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা বেড়েছে ৮.৪৪ । ২০১৫ সালে যা ছিল ৮.৩৭ এবং ২০১০ সালে ছিল ৭.৪৪ । সাম্প্রতিক সময়ে এটিএম বুথের সংখ্যাও বেড়েছে। ২০১০ সালে প্রতি ১০০,০০০ বয়স্ক জনে এটিএম বুথ ছিল ২.০৫ , ২০১৫ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৭৯ এবং ২০১৬ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৭৭।

## *সূচক ৮.১০.২ ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা মোবাইলে অর্থসেবা প্রদানকারী সংস্থায় হিসাবধারী বয়স্ক মানুষের (১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব) অনুপাত*

**সারণি ৮.৫: আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সূচক**

| | ২০০৫ | ২০১০ | ভিত্তি-বছর ২০১৫ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|
| ৮.১০.১ (ক) প্রতি ১০০,০০০ প্রাপ্ত-বয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক বাংকের শাখা এবং<br>(খ) প্রতি ১০০,০০০ প্রাপ্ত-বয়স্কের জন্য সংয়ক্রিয় টেলার মেশিন (এটিএম) | (ক) ৬.৮৬<br>(খ) ০.১৯৬ | (ক) ৭.৪৪<br>(খ) ২.০৫ | (ক) ৮.৩৭<br>(খ) ৬.৭৯<br>(আইএমএফ, ২০১৫) | (ক) ৮.৪৪<br>(খ) ৭.৭৭<br>(বিশ্ব ব্যাংক, ২০১৭) |

*উৎস: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্ব ব্যাংক*

আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তি সকল মানুষের বিশেষ করে দরিদ্রদের, সম্পদ লাভ ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি করে যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তি বাড়লে পরিবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা যেমন ঋণ গ্রহণ, অর্থ সঞ্চয় ও জমা, হিসাব পরিচালনা, বিল পরিশোধ, ভোগ ও বিনিয়োগ ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

## *সূচক ৮.ক.১ বাণিজ্য সহায়তার অঙ্গীকার ও বিতরণকৃত মোট সহায়তার পরিমাণ*

এইড ফর ট্রেড (এএফটি) এমন একটি নীতি যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বিভিন্ন বিস্তৃত কার্যক্রম। প্রচলিত বাণিজ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি গ্রহণ ও বাণিজ্য উন্নয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা বৃদ্ধিও এর অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে বাণিজ্য উদারিকরণের ক্ষেত্রে পরিবার ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটে এবং বাণিজ্য উৎপাদনশীলতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ২০১২-২০১৪ সালে অঙ্গীকারকৃত ১৩৪০.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশ ৮২৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য সহযোগীতা লাভ করে। অঙ্গীকার এবং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পার্থক্যটা এখান থেকেই বোঝা যায়।

## ৮.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮ এর লক্ষ্য হলো সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই কর্মসংস্থান ও শোভন কাজের নিশ্চয়তা বিধান করা। এই লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশের সামনে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছেঃ

১. স্কুলে গড় বছর বৃদ্ধির মাধ্যমে আগত বিপুল শ্রমশক্তির জন্য আরো বেশি পরিমাণে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উৎপাদনশীল কাজের পরিধি বিস্তৃত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এদেশের শ্রমশক্তির বড় অংশই অনানুষ্ঠানিক কাজে জড়িত। যুব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার এখনো অনেক বেশি।

২. দক্ষতার চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে এখনো অসামঞ্জস্যতা রয়ে গছে। আনুষ্ঠানিক খাতে জড়িত শ্রমশক্তির অনুপাত মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১৫ ভাগ যেখানে অর্ধেকের বেশি চাহিদা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার চেয়ে কম শিক্ষিত শ্রমিকদের । বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমের চাহিদা রয়েছে বিশেষ করে- শিক্ষা, আর্থিক খাত এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটরা পেশা হিসেবে প্রশাসনিক পদ পেতে চায়, কিন্তু শ্রমবাজার অনুযায়ী এক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অধ্যায়নের বিষয়, দক্ষতা ও শ্রম বাজারের চাহিদার ক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্যতা দক্ষ শ্রম বাজার কাঠামো সৃষ্টির পথে প্রবীণ অন্তরায় (বিশ্বব্যাংক, ২০১৩)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাও দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমশক্তির দক্ষতা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। দক্ষ শ্রমিক খুঁজে বের করা শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে একটি বড় বাঁধা (এডিবি এবং আইএলও, ২০১৬)।

৩. স্বল্পদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব অনেক কিন্তু বিদেশ গমনের অত্যধিক ব্যয়, প্রতারণা, চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দেওয়া এবং কাজের জন্য অগ্রহণযোগ্য বিভিন্ন শর্ত ও বসবাসের জটিলতা বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথে অন্তরায়।

৪. উচ্চ মাধ্যমিক এবং তার ওপরের স্তরে নারী শিক্ষা ব্যাপক হলেও আন্তর্জাতিক মানে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ (এফএলএফপি) খুব নিম্নে। শিক্ষিত পুরুষের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত নারীদের বেকারত্বের হার বেশি। দেশের শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। নারী কর্মসংস্থানের উপযোগী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সহায়তা এখানে অনেক কম। যেমন- শ্রমজীবী নারীদের বাচ্চা শিশু দেখাশোনার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুবিধার সংকট, কর্মক্ষেত্র ও তার বাইরে নারীদের প্রতি নানা সহিংসতার আশঙ্কা এবং নারীবান্ধব নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থার সংকট এখনো প্রবল।

৫. প্রবৃদ্ধি ও শোভন কাজের লক্ষ্য অর্জনসহ এসডিজির অভীষ্ট অর্জনে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ও বৈদেশিক সম্পদের অন্যান্য উৎস খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের বার্ষিক প্রবাহ তুলনামূলক কম। যাও বা আসছে, তা মাত্র অল্প কয়েকটি খাতে যেমন বস্ত্র ও পোশাক, টেলিযোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের মধ্যেই সংকুচিত হয়ে আছে। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও দেশের বেসরকারি খাতে এখনো অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়ে গেছে। দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশ আরো উন্নত করা প্রয়োজন। সেই সাথে বিনিয়োগ সংস্থাগুলোর শক্তি বৃদ্ধিসহ এফডিআই আগমন ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলোর সহজীকরণও জরুরী। এই কাজগুলো ঠিকঠাক সম্পন্ন করতে পারলেই কেবল একটি সুসংহত বিনিয়োগ সেবা সরবরাহ ব্যবস্থপনা নিশ্চিত হতে পারে।

## ৮.৪ ভবিষ্যৎ করণীয়

**১। প্রবৃদ্ধি বাড়ানো এবং অর্থনীতির বহুমুখীতা অর্জনঃ**

আপাতদৃষ্টে মনে হয় ক্রমবর্ধমান শ্রম শক্তির চাহিদা মেটাতে বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার যথেষ্ট নয়। দেশে শ্রমশক্তির বর্ধিত চাহিদা পূরণে প্রতি বছর অন্তত ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা প্রয়োজন। যেহেতু প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হলো ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, তাই আগামী ১৫ বছরে বার্ষিক ১২-১৫ শতাংশ হারে এই খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে (এডিবি এবং আইএলও, ২০১৬)। একই সাথে অর্থনীতির উৎপাদন কাঠামোকে বহুমুখী করে তুলতে হবে। বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বিশেষ করে, শ্রমনিবিড় বস্ত্র ও পোশাক শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। এই ধরনের আরো বিভিন্ন শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমুখীতা অর্জন করা জরুরি। গত চার দশক ধরে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বস্ত্র ও পোশাপ শিল্প ছাড়া আর কোনো খাত যথেষ্ট সফলতা লাভ

করতে পারেনি। এ ধরনের প্রবৃদ্ধির জন্য আমদানি ও রফতানির ক্ষেত্রে উদ্দীপক কাঠামোকে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং এর মধ্যে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য থাকা চলবে না (এডিবি এবং আইএলও, ২০১৬) । একইসাথে প্রবৃদ্ধি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বহুমুখীতার ক্ষেত্রে সরবরাহ সংক্রান্ত বাঁধাগুলো দূর করে সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। বিশেষভাবে দৃশ্যমান অবকাঠামো, বন্দর ও পরিবহনের অতিরিক্ত খরচ, দক্ষ শ্রম শক্তির অভাব, প্রযুক্তি উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা এবং ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব অন্তর্ভুক্ত।

### ২. শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রম বাজারের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করাঃ

শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রম বাজারের মধ্যকার সংযোগ কয়েকটি উপায়ে জোরদার করা যায়। প্রথমত, প্রকারভেদ ও গুণগত মান বিচারে শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। শ্রম বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগকারীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য চাকুরী ব্যবস্থা করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মতান্ত্রিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। নিয়োগকর্তাগণ তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। যেহেতু ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই শ্রম বাজারকে উভয় দিকের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দিতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোতে উৎপাদন ও সেবাখাতের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম পরিমার্জন, নতুন বিভাগের সূচনা এবং অনুষদের উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে।

### ৩. নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধিঃ

শ্রম শক্তিতে নারীদের সংশ্লিষ্টতার হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিভিন্ন রকম বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। বাল্য বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার আইনী কাঠামো গড়ে তুলেছে। তবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো কঠোরতা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি খাতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। নারীদের কাজকে আরো এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে এমন নীতি ও বিভিন্ন পদক্ষেপ চালু রাখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে–নারী শিক্ষার অগ্রগতি, জন্মহার হ্রাসকরণ, সরকারি চাকুরীতে নারী কোটার ব্যবস্থা রাখা এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি।

### ৪. বর্তমান শ্রম শক্তির দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদানঃ

নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রধান উপকারভোগী। কিন্তু বর্তমান কর্মজীবীদের একটি বৃহৎ অংশই দশকের পর দশক ধরে অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করতে এই সকল শ্রমজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে সাময়িক নয় বরং জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে।

### ৫. সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করাঃ

দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ধীর গতিতে বাড়লেও এই খাত থেকে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এখনো কম। যা-ও বা বিনিয়োগ হচ্ছে, তা অল্পকিছু খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এফডিআই এর মাধ্যমে শুধু যে সরাসরি আর্থিক বিনিয়োগ আসছে, তা নয়। এর মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনাও আসছে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে যার একটি স্পিল ওভার ইফেক্ট রয়েছে। বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আরো বেশি পরিমাণে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।

## ৮.৫ সারাংশ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (অর্থবছর ২০১৫-১৭) বাংলাদেশ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭ শতাংশের বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সময়ে ছিল ৬-৭ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হওয়ায় মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে এবং ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দেশটি প্রায় প্রস্তুত (অন ট্র্যাক)। আনন্দের সাথে লক্ষণীয় যে, মাথাপিছু প্রতি কর্মীজনে গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ সালের মধ্যেই ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রায় পৌছে গেছে। বাংলাদেশে বেকারত্বের আনুমানিক হার দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় ৪ শতাংশের কাছাকাছি এবং নিকট ভবিষ্যতেও একই ধারা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিশুশ্রমের ওপর ২০১৩ সালের পর থেকে কোনো সরাসরি তথ্য নেই, তবে আশা করা যায়, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অতি দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি উন্নত শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে অদূর ভবিষ্যতে শিশুশ্রম অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। আর্থিকখাতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন ঘটেছে, যা প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে। সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিকখাতে অন্তর্ভুক্তির এই ক্রমবর্ধমান হার পরিবার এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো যে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে আর্থিক সেবা সুবিধা পাচ্ছে, তা-ই নির্দেশ করে।

শ্রমবাজারের কিছু বিষয় বর্তমানে যথাযথ নেই। প্রকৃত মজুরির বর্তমান নিম্নগামিতা টিকে থাকলে প্রকৃত মজুরির ক্ষেত্রে ২০২০ সালের লক্ষ্য- প্রকৃত মজুরির ২০ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন সম্ভব  নাও হতে পারে। সকলের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করা এবং নারী ও ১৫-২৯ বছর বয়সী যুবজনগোষ্ঠীর বেকারত্বের উচ্চহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ২০২০ লক্ষ্য অর্জনে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। ভিত্তি বছরের হিসেবে প্রায় ২৯ শতাংশ যুবক শিক্ষা ও কাজের বাইরে (এনইইটি), পরবর্তী বছরে যা আরো বেড়ে প্রায় ৩০ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৬/১৭ সময়ে শিক্ষা ও কাজের বাইরে রয়েছে এমন যুব পুরুষদের অনুপাত হলো প্রায় ১০ শতাংশ এবং যুব নারীদের অনুপাত প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। উভয় ক্ষেত্রেই আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার বেশি যা তাদেরকে বিপথগামী করে তুলতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮ অর্জনে বেশকিছু চ্যালেঞ্জে সামনে এসে দাঁড়ায় যার মধ্যে আছে চাকুরীর বাজারে অনানুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি, উচ্চ যুব বেকারত্ব, দক্ষতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান বৈষম্য, শ্রমশক্তিতে নারীর কম অংশগ্রহণ, বৈদেশিক সম্পদ যেমন ওডিএ, এফডিআই ইত্যাদির কম আন্তঃপ্রবাহ, কর্মক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনা, শিশুশ্রম এবং বিদেশে শ্রমশক্তি রফতানিজনিত সমস্যা। সরকারের প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান তৈরির বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচিকে পুর্নগঠন করে আরো জোরদার করে বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে; যেমন– অর্থনীতিকে বৈচিত্রমুখীকরণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের বহুমুখী উন্নয়ন, নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম এবং বৈদেশিক সম্পদ আকর্ষণ ইত্যাদি।

৯

# অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ

## অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

## ৯.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

টেকসই উন্নয়নের জন্য অভীষ্ট ৯ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে চিহ্নিত করেছে যথা– স্থিতিস্থাপক বা অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন এবং গবেষণা ও উদ্ভাবন। অবকাঠামো বলতে সাধারণত বোঝায় মৌলিক কাঠামোগত সুবিধা (ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিস) এবং বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির সুযোগ করে দেয়া যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন অভিঘাত যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান আঘাত এবং এর সুতীব্র প্রভাব মোকাবেলায় অবকাঠামোকে অভিঘাতসহনশীল করে তুলতে হবে।অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচন, শোভন কর্মসংস্থন সৃষ্টি এবং সর্বপরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার পেছনে একটি অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন খাতে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে অসমতা টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। উদ্ভাবন বলতে বোঝায়– নতুন পণ্য, নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং ব্যবসায়িক নতুন মডেলের উদ্ভাবন; যা পরিবেশগত ধারণক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধিকে তরান্বিত করে। যাইহোক, এই অভীষ্টের মূল লক্ষ্য হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নেওয়া। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি সহায়তা, গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং বর্ধিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

## ৯.২ সূচকের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯ এর অগ্রগতি মূল্যায়ন

### *সূচক ৯.১.১ক প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে রাস্তার ঘনত্ব*

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক অভিঘাত হ্রাস করতে অবকাঠামো খাত বিশেষ করে পরিবহণ, জ্বালানী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, ভবন, বাঁধ এবং ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে সরকার মনে করে। রাজধানী শহর ঢাকা ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে সমগ্র দেশের গ্রামীণ ও নগর এলাকার যোগাযোগ রক্ষার জন্য দেশব্যাপী বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ জলপথ, স্থল বন্দর এবং বিমান বন্দরেও একই ধরণের সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তিন ধরণের পাকা সড়ক– জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ফিডার রোড ( যে সড়কের মাধ্যমে খুব সহজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াত করা যায়) এর মাধ্যমে প্রশাসনিক কেন্দ্র সমূহ, শহর এলাকা, ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং সমুদ্র ও স্থল বন্দরের সাথে সারা দেশের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিজস্ব প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করতে বেশ কিছু রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। সরকারের সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ (আরএইচডি) সড়ক অবস্থা জরিপের মাধ্যমে অতীতে সড়কের অবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে।

সারণি ৯.২ দেশের রাস্তা ঘনত্বের চিত্র দেখায়। ঘনত্ব হিসাব করা হয় দেশের মোট সড়কের দৈর্ঘ্যকে দেশের মোট ভূমি এলাকা দিয়ে ভাগ করে এবং ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করার মাধ্যমে।

**সারণি ৯.১ প্রতিবর্গমাইলে রাস্তার ঘনত্ব**

| ২০০০ | ২০১০ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|
| ১৪.০৯ | ১৪.৪১ | ১৪.৪৮ | ১৪.৪৫ | ১৪.৬১ |

***উৎস: আরএইচডি এবং বিবিএস এর তথ্য থেকে হিসাবকৃত***

প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। ২০০০ সালে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে পাকা রাস্তার ছিল ১৪.০৯ কিলোমিটার, ২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৬১ কিলোমিটার। এই সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত লেন তৈরির মাধ্যমে বিদ্যমান রাস্তাগুলোও সংস্কার করা হয়েছে।

### *সূচক ৯.২.১ জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং– এর মূল্য সংযোজন*

তুলনামূলক উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের ক্ষেত্রে খাত হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং আরো গতিশীলতা পেয়েছে। ২০০০-০১ সাল থেকে জিডিপির অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে এবং ২০১৪-১৬ সালের মধ্যে ১৯.৪৭ শতাংশে পৌছে গেছে। এসডিজি সময়কালের মধ্যেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশেই জিডিপির অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের হার নিম্নগামী। মুষ্টিমেয় কিছু দেশ এই খাত থেকে মোট জিডিপির ২০ শতাংশ অর্জন করতে

পেরেছে এবং বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। যখন উন্নত দেশগুলোতে অবকাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অগ্রিম শিল্পবিমুখতার কারণে এই খাতের অবদানের হার কমছে, সেই সময় বাংলাদেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের শেয়ার বৃদ্ধি একটি লক্ষ্যণীয় ঘটনা। এটা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক ব্যাপার যে, বাংলাদেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যকাচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মাইল ফলক ২০১৭ অর্থবছরের মধ্যেই অর্জিত হয়ে গেছে।

**সারণি ৯.২ জিডিপি তে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের অবদান, ২০০১-০২ থেকে ২০১৬-১৭ (%)**

| ২০০১-০২ | ২০০৫-০৬ | ২০১০-১১ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.৭৬ | ১৬.১৩ | ১৭.৭৫ | ২০.১৬ | ২১.০১ | ২১.৭৪ |

*উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ, বিভিন্ন বছর*

### *সূচক ৯.২.১ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মাথাপিছু মূল্য সংযোজন (স্থির ২০১০ মার্কিন ডলার)*

শ্রমশক্তি জরিপকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মোট নিয়োগকৃত শ্রমিকের সংখ্যা দ্বারা ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজন ধ্রুবক ২০১০ মার্কিন ডলারকে ভাগ করে শ্রমিক প্রতি ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজন হিসেব করা হয়েছে। ২০১৩ সাল বাদে ১৯৯৯-২০০০ সময় থেকে ২০১৫-১৬ মধ্যবর্তী সময়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে ।

**সারণি ৯.৩ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রতি জনে মূল্য সংযোজন (স্থির ২০১০ ইউএস ডলার), ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১৫-১৬**

| ১৯৯৯-২০০০ | ২০০২-০৩ | ২০০৫-০৬ | ২০১০ | ২০১৩ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৩৮০ | ২৪৭৯ | ২৬৩৫ | ২৭৭৪ | ২৬০৭ | ৩৮৭৭ | ৪২১০ |

*উৎস: বিশ্বব্যাংকের জিডিপি তথ্য এবং বিবিএস এর কর্মসংস্থান তথ্য ব্যবহার করে হিসেবকৃত, শ্রমশক্তি জরিপ, বিভিন্ন বছর*

### *সূচক ৯.২.২ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান*

বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ধারাবাহিক প্রসার লাভ করছে। এই খাতের প্রভাবশালী উপাদানগুলো যেমন, টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক শিল্প, পাটজাত দ্রব্য এবং চামড়া প্রভৃতি অত্যন্ত শ্রম নিবিড়। সম্ভবত সেই কারণেই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে মোট কর্মসংস্থানেও এই খাতের কর্মসংস্থান অনুপাত বেশি, যদিও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের অংশ কিছুটা কমেছে। সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক খাতে শ্রম মূলধনের পরিবর্তে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর ফলে এই খাতে আগের চেয়ে কম শ্রম দরকার হচ্ছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় (সিপিডি, ২০১৫-১৬) দেখা গেছে, কর্মসংস্থানের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২০১২-১৬ সময়ের মধ্যে কমে এসেছে ৩.৩ শতাংশে, যা ২০০৫-১২ সময়ের মধ্যে ছিল প্রায় ৪.০১ শতাংশ। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অন্যতম প্রধান খাত তৈরি পোশাক খাতের এই প্রবণতার মাধ্যমে পরিবর্তনটা সহজেই ব্যাখা করা যায় যেমন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসংস্থান মোটামুটি স্থির রয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০ সালের মাইল ফলক অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। সারণি ৯.৪ এর মাধ্যমে এই ধরনের উন্নয়ন ব্যাখ্যা করা যায়। এই সারণি থেকে দেখা যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে– যার মানে হলো, একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে এখন আগের চেয়ে কম শ্রম প্রয়োজন হচ্ছে। সুতরাং জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান বাড়লেও মোট কর্মসংস্থানে এই খাতের কর্মসংস্থানের অংশ কমে যেতে পারে।

**সারণি ৯.৪ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান (%)**

| ১৯৯৯-২০০০ | ২০০২-০৩ | ২০০৫-০৬ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১৩ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭.৩ | ৯.৭১ | ১১.০৩ | ১৩.৫৩ | ১২.৪৬ | ১৬.৪ | ১৪.৪ | ১৪.৪ |

*উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ এবং ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ, বিভিন্ন বছর*

**সারণি ৯.৫ প্রতি মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে (পূর্ণকালীন) গবেষকের সংখ্যা**

| ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫.৫৬ | ৫.৬৬ | ৫.৬৯ | ৫.৯৮ | ৬.১৬ | ৬.৬৩ | ১৪.৪ | ১৪.৪ |

*উৎস: বাংলাদেশ সরকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়*

বাংলাদেশে গবেষণার জন্য বাজেটের পরিমাণ খুবই কম এবং খুবই অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী নিয়মিত গবেষণা কর্মের সাথে যুক্ত। তবে আশার কথা হলো, সময়ের সাথে সাথে প্রতি মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে গবেষকের সংখ্যা বাড়ছে। এই বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ২০১২ থেকে ২০১৫ সময়কালীন ২.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সময়ের মধ্যে ৫.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যার মাধ্যমে দেখা যায় এসডিজির সময়কালে এ ক্ষেত্রে অধিকতর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ।

## *সূচক ৯.ক.১ অবকাঠামোগত মোট সরকারি আন্তর্জাতিক সহায়তার (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও অন্যান্য সরকারি অর্থপ্রবাহ) পরিমাণ*

সরকার প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করে। অর্থনীতির প্রতিযোগীতামূলক অবস্থান নিশ্চিতকরণের জন্যও মান সম্পন্ন অবকাঠামো অপরিহার্য। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, সড়ক ও সেতু, রেলপথ, বন্দর ও গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নানা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকার ১০টি দ্রুত বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বা মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৭ অর্থবছরে এই প্রকল্পসমূহের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রায় ৪০ শতাংশ বরাদ্দ ছিল। অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। আর তাই দেশীয় সম্পদের পাশাপাশি বৈদেশিক সম্পদের সহায়তাও অপরিহার্য।

**সারণি ৯.৬ অবকাঠামোগত খাতে মোট আন্তর্জাতিক সহায়তার পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ২০১২ থেকে ২০১৬**

| ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮১৩.১ | ১১৬৭.৪ | ১৫৮০.২ | ১২৪৭.২ | ১৭৩৬.৫ | ৬.৬৩ |

*সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগ (ইআরডি)*

২০১৫ সালে অবকাঠামো খাতকে সহযোগীতা করার জন্য মোট আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রবণতা ছিল উর্ধ্বমুখী। সম্পদের বার্ষিক প্রবাহ অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল যেমন– সহায়তাপুষ্ঠ প্রকল্পসমূহের আকার, নতুন সহায়তা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তি এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি ইত্যাদি। বাংলাদেশ অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে ধারাবাহিক সমর্থন প্রত্যাশা করে।

## *সূচক ৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত*

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন চালু হয়, যা মানুষকে মোবাইল সেলুলার সেবা ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। ১৯৯২ সালে অধিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেকেন্ড জেনারেশন সেলুলার টেলিফোন টেকনোলজি বা ২জি সেবা চালু করা হয়। পরবর্তীতে ২জি এর স্থলে চালু করা হয় ৩জি। এর মাধ্যমে আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে তথ্য আদানপ্রদান করা এবং প্রথম ভিডিও কলিং সেবার সুবিধা চালু করা হয়। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফোর্থ জেনারেশন অব মোবাইল ফোন কমিউনিকেশন টেকনোলজি বা ৪জি সেবা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন' এর দিকে অনেকটা এগিয়ে যায়। ২০১৭ সালে প্রায় ১০০ ভাগ জনগনের নিকট ২জি সেবা পৌছে গেছে। ৩জি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ২০২০ সালের লক্ষ্য ২০১৭ সালের মধ্যেই অতিক্রম করে গেছে। এটি সুস্পষ্ট যে, মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির প্রসার অনুমিত হারের তুলনায় বেশ দ্রুত গতিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**সারণি ৯.৭ প্রযুক্তি দ্বারা মোবাইল নেটওয়ার্ক আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত (%)**

| প্রযুক্তি | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| টু-জি | ৯৯ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৯.৪ | ৯৯.৪৬ | ৯৯.৪৯ |
| থ্রি-জি | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ৭১ | ৯০.২ | ৯২.৫৫ |
| ফোর-জি | | | | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |

*সূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ওয়েবসাইট, ফোর-জি সেবার ক্ষেত্রে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি (২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮)*

## ৯.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯ অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টা

সরকার স্থিতিস্থাপক বা অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ভাবনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

*পরিবহন ও যোগাযোগ*

টেকসই উন্নয়নে দক্ষতার সাথে পরিচালিত, মূল্যসাশ্রয়ী এবং নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সরকার কৌশলগতভাবে সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা, জাতীয় ও আন্তঃজেলা সড়কগুলোর সাথে গ্রামীণ সড়কগুলোকে সংযুক্তকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ছয় লেনে উন্নীত করণ, অন্যান্য জাতীয় মহাসড়ক ও করিডোরকে ৪-৬ লেনে উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, সুড়ঙ্গ পথ, ফুটওভারব্রিজ ও ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং সড়ক দুর্ঘটনার হার কমাতে ব্যাপকভাবে আগ্রহী। সরকার ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে এরই মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

সাশ্রয়ী ও ব্যবহারবান্ধব পরিবহণ হিসেবে বাংলাদেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে রেলওয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কবল থেকে স্বাধীনতার সময়ে রেললাইন বিচ্ছিন্নকরণ এবং রেলওয়েতে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনীহা এই খাতের সেবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সরকার এটিকে পরিবহণের একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম হিসেবে পুনরুদ্ধার করতে চায়। সেই লক্ষ্যে এরই মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে যেমন– বিদ্যমান রেললাইন সংস্কার, চারী (লোকমটিভ) ক্রয়, ওয়ানগন ও নতুন কোচ ক্রয়, সিগন্যালিং সিস্টেম ও লেভেল ক্রসিং গেইট আধুনিকায়ন এবং ইঞ্জিন চালিত বৈদ্যুতিক বহুমুখী ইউনিট (ডেমু) চালুকরণ ইত্যাদি। চট্টগ্রাম বন্দর ও রামু দিয়ে কক্সবাজার সড়ককে মংলা বন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপনের কাজ চলছে। ভারতের সাথে রেলপথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের পাশাপাশি ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ও সার্ক নেটওয়ার্ক সংযোগের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

অতীতে নদীমাতৃক বাংলাদেশে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌ পরিবহন। পানি শুকিয়ে যাওয়া এবং পলি জমার কারণে নদীর নাব্যতা কমে গেছে। অন্যদিকে সড়ক পরিবহনের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে নৌ পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। নদী খননের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জলপথের নাব্যতা সারা বছর ধরে রাখা ছিল মূল লক্ষ্য। অবৈধভাবে নদী দখল, নদী দূষণ, অবৈধ নির্মাণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড থেকে নদীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নদী সুরক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর অধীনে একটি নদী সুরক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে।

*তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)*

বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে আইসিটির ব্যবহার, ই-পেমেন্ট, ই-কমার্স এবং ই-ট্রেড কার্যকর করা এবং ই-গভর্ন্যান্সসহ আইসিটির অন্যান্য ব্যবহার দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে একটি ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আইসিটির দ্রুত সম্প্রসারণ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন আইন, নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। এগুলো আইসিটি খাতের অবকাঠামো এবং সেবা সক্ষমতা উন্নয়নের পক্ষে কাজ করছে।

*বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি*

সরকার ২০১০ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি গ্রহণ করেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। এটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

*ম্যানুফ্যাকচারিং খাত*

প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং অর্থনীতিতে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মূল চাবিকাঠি হলো একটি গতিশীল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত। বৈশ্বিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারকগণ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি উন্নীত করতে উপযুক্ত নীতিমালার অনুসন্ধান করছে বহুদিন ধরে। বাংলাদেশ সরকারি খাতনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন নীতি থেকে রফতানীমুখী নীতিতে সরে এসেছে, যেখানে মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রয়েছে বেসরকারি খাত। সরকার এখনো রফতানী উন্নয়ন এবং দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর নীতির অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব নীতিমালা রফতানীযোগ্য পণ্যের উন্নয়ন, রফতানীকে প্রতিযোগীতামূলককরণ এবং অনুকূল বাজার তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করে। বাংলাদেশ সমন্বিত বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে টেকসই ও দ্রুত গতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যাপক/বিস্তৃত বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করেছে।

## ৯.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

*পরিবহন ও যোগাযোগ*

ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের কারণে সড়ক পরিবহন উন্নয়ন প্রক্রিয়া নানা ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের মধ্যে– সড়ক নির্মাণ প্রযুক্তি, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, যথাযথ তথ্য-উপাত্ত এবং ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন– পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সড়ক, সড়ক দুর্ঘটনার সঠিক উপাত্ত এবং ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ নজরদারিসহ সড়ক ব্যবহাকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

পরিবহন ও যোগযোগ খাতে যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ হলো সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, যার কারণে অধিকাংশ প্রকল্পই বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হয়ে যায়। এই বিলম্ব এবং অপর্যাপ্ত অর্থায়নের কারণে খরচ বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগের সুফল প্রাপ্তির হার কমে যায়। অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত সেবা ওপর নির্ভরশীলতা ও এর গুণগত মানকে প্রভাবিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

## ৯.৫ ভবিষ্যত করণীয়

*অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ*

বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই নানা ধরণের প্রাকৃতিক অভিঘাত, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্ণেডো, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি ও নদীভাঙন ইত্যাদি ঝুঁকিতে রয়েছে। এর ভয়াবহ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সড়ক, রেলপথ, সেতু এবং বাঁধসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহের ওপর। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে সংঘটিত এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুধু অবকাঠামোগত ক্ষতিসাধনই নয়, বরং এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা, গৃহস্থালীর সম্পদসহ ফসল ও মৎস সম্পদেরও বিরাট ক্ষতিসাধন করে। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশে প্রায়ই নানা ধরনের মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় যেমন–ভবন ধ্বস এবং অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। সুতরাং সুপারিশ এই যে, পরিবেশগত পরিবর্তনের ঝুঁকি ও এর প্রভাব মোকাবেলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথাযথ মূল্যায়ন করে কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। আশার কথা হলো, এমন কিছু প্রকল্প এরই মধ্যে দেশে শুরু হয়েছে এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতায় এসকল প্রকল্প আরো সমন্বিত ও বিস্তৃত করা হবে।

*অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন*

নিকট অতীতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রধান চালিকা শক্তি শ্রমনিবিড় বস্ত্র ও পোশাক শিল্পখাত ২০১৬ সালে প্রায় ৪.৪ মিলিয়ন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই হলো তরুণ ও অদক্ষ নারী শ্রমিক। অন্যান্য উপ-খাত যেমন পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য এবং হিমায়িত চিংড়ি খাতও পোশাক খাতের মতোই শ্রমনিবিড় শিল্প। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থানের হার কমেছে। তৈরি পোশাক খাতের বিদ্যমান প্রাধান্য সত্ত্বেও অন্যান্য শ্রমনিবিড় শিল্প যেমন খাদ্য দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, ইলেকট্রনিকস পণ্য এবং পর্যটন শিল্পেরও বিস্তৃতি প্রয়োজন (এডিবি, আইএলও, ২০১৬)।

শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখানো বেশ কিছু শিল্প দূষণ নির্গত করে চলেছে। এর প্রধান কারণ তাদের কোনো বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট নেই। পরিবেশগত পরিণতির কথা বিবেচনা না করেই গার্মেন্টস, টেক্সটাইল এবং ডাইং এ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাক্টরিগুলো যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও সিমেন্ট, কাগজ, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যালস, ট্যানারী, ইটভাটা এবং জাহাজভাঙা শিল্প মারাত্মক দূষণকারী শিল্প। যদিও কিছু কিছু কারখানার বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট রয়েছে, তারপরও তারা বিভিন্ন রাসায়নিক বর্জ্য খোলা জায়গায় এবং পানিতে ফেলে রাখে। শিল্পগুলোর এ ধরণের আচরণ টেকসই উন্নয়নের পরিপন্থী। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিশোধনের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল সামাজিক, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারগণ সকলকে যুক্ত করা হবে।

## ৯.৬ সারাংশ

প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে রাস্তার ঘনত্ব ২০১৭ সালে ১৪.৬১ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে, ২০১০ সালে যা ছিল ১৪.৪১ কিলোমিটার। সড়ক অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিদ্যমান সড়ক সমূহে অতিরিক্ত লেন সংযুক্তকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের অংশ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং ২০১৭ সালের মধ্যেই ২০২০ সালের মাইল ফলক ছাড়িয়ে গেছে। একইভাবে প্রতি কর্মীজনে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজন বাড়লেও এক্ষেত্রে ২০২০ সালের লক্ষ্য এখনো নির্ধারিত হয়নি। মোট কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কর্মসংস্থানের অবদান ২০১৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত দুই বছরে একই অবস্থানে রয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়ার শুরু যেখানে কর্মসংস্থানের অংশ হ্রাসের সাথে সাথে মূল্য সংযোজনের অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার ওপরে চূড়ান্ত মন্তব্য করতে হলে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

কিছু ওঠা-নামা সত্ত্বেও অবকাঠামো খাতে আন্তর্জাতিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ছে। টু-জি প্রযুক্তিতে মোবাইল ব্যবহাকারী জনগোষ্ঠীর হার প্রায় ১০০ শতাংশে পৌছেছে। থ্রি-জি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মাইল ফলক ২০১৭ সালের মধ্যেই অর্জিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৯ অর্জনে সরকারের নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একদিকে অবকাঠামো, সব ধরণের যোগাযোগ মাধ্যম এবং আইসিটি অবকাঠামো নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা দিচ্ছে। অর্থায়ন, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং ভূমি অধিগ্রহণ হলো এই খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বর্ধিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এর পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধিকেও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই হতে হবে।

১০

# অসমতা হ্রাস

## অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

## ১০.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় আন্তঃদেশীয় বৈষম্য কমছে। অভ্যন্তরীণ আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে বিরাজ করছে মিশ্র অবস্থা। তবে যেসকল দেশ দীর্ঘস্থায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে তাদের ক্ষেত্রে আয় বৈষম্য ঠিকই হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধনী ব্যক্তিদের মাত্র ১০ শতাংশের আয় বিশ্বের মোট আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ, যেখানে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষের আয় মাত্র ২-৭ শতাংশ। এই বৈষম্য যে কোন দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১০-এ যথাযথ আইন প্রণয়ন, বৈষম্যমূলক নীতি-আইন রহিতকরণ এবং যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেন্ডার, বয়স, অক্ষমতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্য কমিয়ে এনে সকলের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং সেইসাথে আয়স্তরের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা ৪০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিকরণের কথা বলা হয়েছে। রাজস্ব, মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিসমূহ গ্রহণের উপরও অধিকতর সমতা অর্জন বহুলাংশে নির্ভরশীল।

এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আন্তর্জাতিক অর্থবাজার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ উন্নত করতে হবে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভূমিকা জোরালো করতে হবে। আন্তঃদেশীয় শ্রম অভিবাসন নিরাপদ করতে হবে, যাতে করে অভিবাসী শ্রমিকদের বঞ্চনা ও মানাবাধিকার লংঘিত না হয়। শ্রমিকদের সুবিধা বৃদ্ধি করতে রেমিট্যান্স প্রেরণের খরচ তিন শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের করমুক্ত অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে, প্রয়োজনমাফিক প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তাসহ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। এসডিজি-১৭সহ অন্যান্য এসডিজির সকল প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

## ১০.২ অভীষ্ট ১০ সূচক অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

এক দশক ধরে (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫) বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বার্ষিক ৬.২ শতাংশ হারে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৭.১১ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.২৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৭.৮৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল (আইএমএফ) এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুকের তথ্যানুসারে, গেল দশ বছরে (২০০৮-২০১৭) সারা বিশ্বে উঁচু প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যাই হোক, অব্যাহত প্রবৃদ্ধিরসাথে হ্রাসমান আয়বৈষম্যের কোনো সংযোগ ছিল না। সম্পূর্ণ বিপরীতে পর্যায়বৃত্ত ওঠানামা নিয়ে বৈষম্য উর্দ্ধমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করছে। গিনি সহগ, যা আয় অথবা ভোগ বিতরণ বিন্যাসে বৈষম্যমাত্রা পরিমাপ করার একটা সাধারণ সূত্র ১৯৯১-৯২ সালের ০.৩৩৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে দাঁড়ায় ০.৪৬৭ এবং ২০১০ সালে প্রান্তিক কমে ০.৪৫৮-এ পৌঁছায়। তবে, ২০০০-২০১০ সময়কালে গিনি সহগটি প্রায় ০.৪৫-এ স্থিতিশীল ছিল। নতুন শতকের প্রথম দশকে গিনি সহগের এই স্থিতিশীলতা ইংগিত করে যে, সরকার সূচিত দরিদ্র-বান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নীতিমালার ইতিবাচক প্রভাব আয় বৈষম্য বৃদ্ধি বিরত রেখেছে।

অতি সাম্প্রতিক খানার আয় ও ব্যয় জরিপ (২০১৬)অনুযায়ী ২০১৬ সালে গিনি সহগ ০.৪৮৩ মান নিয়ে তার দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতায় প্রত্যাবর্তন করে ইংগিত দিচ্ছে যে, গেল ছ'বছরে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উর্দ্ধমুখী অসমতার অর্থ দাড়ায় এই যে, অর্থনীতিতে যে সমস্ত শক্তির বলে বৈষম্য বেগবান হয় সেসব শক্তি মোকাবেলায় সরকারি নীতিমালা অপর্যাপ্ত ছিল। বস্তুত, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দারিদ্র্য হ্রাসে প্রবৃদ্ধির প্রভাবকে দুর্বল করেছে; বৈষম্যের বৃদ্ধি না ঘটলে দারিদ্র্যের প্রকোপ কিছু শতাংশ পয়েন্ট কম হতে পারত। তাছাড়া, জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের ও সবচেয়ে দরিদ্রের ৪০ শতাংশের মধ্যকার আয়ের অনুপাত (পামা অনুপাত) থেকেও বৈষম্যের উর্দ্ধমুখী প্রবণতা প্রতীয়মান যেমন, পামা অনুপাত আশির দশকের ১.৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে নব্বই-এর দশকে ২.১ এবং বিংশতে এসে আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫ (ওসমানি ও অন্যান্য ২০১৫)।

তবে লক্ষ্যণীয়ভাবে, দেশে ভোগ গিনি সহগের মান আয় গিনির চেয়ে কম। ২০০০-১৬ সময়জুড়ে ভোগ গিনি মোটামুটি ০.৩২ এ স্থির রয়েছে। যাতে বোঝা যায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগ ব্যয় গড়পড়তা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে বেড়েছে এবং সেটা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে (যেহেতু দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয় ভোগ ব্যয় নীরিখে- আয়ের নীরিখে নয়)।

### *সূচক ১০.৭.১ গন্তব্য দেশ থেকে অর্জিত বার্ষিক আয়ের অংশ হিসেবে কর্মচারী কর্তৃক ব্যয়কৃত নিয়োগ খরচ*

বিশ্বের বর্তমান মোট ১৬১টি দেশে প্রায় ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশী কাজ করছে এবং রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। খণ্ডকালীন শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশ বিদেশ যেতে পারত, রেমিট্যান্স পাঠাতে সক্ষম হতো, কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল নিয়োগ খরচের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সরকার অভিবাসীদের বার্ষিক আয়ের অনুপাতে নিয়োগ খরচ হ্রাস করতে সিদ্ধান্ত নেয়। এর উৎস হচ্ছে, ২০১৬ সালের ১৭টি দেশের অভিবাসন আয় ও নিয়োগ খরচের গড়। এই হিসাবকে ভিত্তি রেখা ধরেপ্রত্যেক দেশের জন্য ২০২০ মাইলফলক নির্ধারন করা হয়।। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে, প্রবাসী শ্রমিক কর্তৃক বহনকৃত

খরচ (তাদের বার্ষিক আয়ের অংশ হিসেবে) ভিত্তিমান (বেইজ লাইন ভ্যালু) থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য যে, ভিত্তি বছরে বার্ষিক আয়ের অংশ হিসেবে শ্রমিক নিয়োগের খরচ কাতারে ১০ ভাগ এবং মিশরে ৬৭ ভাগ।

### *সূচক ১০. ক. ১ শূন্য শুল্কসহ উন্নয়নশীল দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক হারের অনুপাত*

***স্বল্পোন্নত দেশ থেকে শূন্য শুল্কে আমদানির অনুপাত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা রাউন্ডের আলোচনা মোতাবেক একই রকম রয়েছে।***

### *সূচক ১০. খ. ১ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মোট সম্পদ প্রবাহের ধরন (প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য প্রবাহ)*

সরকারি উন্নয়ন সহায়তার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রবণতা এসডিজি সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বার্ষিক ওঠানামা নিয়ে সরসারি বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৬ সালে দেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ২০১৭ সালে পরিমাণ আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪৫৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

**সারণি ১০.১: প্রবাহের ধরন অনুযায়ী উন্নয়নখাতে সম্পদ প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)**

| | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) | ২০৫৭.২ | ২৭৬০.৮ | ৩০৪৬.৮ | ৩০০৫.৫ | ৩৫৩১.৭ | ৩৬৭৭.২৯ |
| সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) | ১১৯৪.৯ | ১৭৩০.৬ | ১৪৩৮.৫ | ১৮৩৩.৯ | ২০০৩.৫ | ২৪৫৪.৮ |

*উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)*

## ১০.৩ অসমতা দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য-বান্ধব উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করছে। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হলো আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম উৎপাদনশীলতা ও মজুরী বৃদ্ধি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, অনুন্নত অঞ্চল সমূহের উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় ও এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রসার, এসএমই ঋণ বৃদ্ধি, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং ব্যক্তিগত আয়করের গতিশীলতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আয়কর কাঠামো পূর্নব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সরকারি ব্যয়ের অংশ হিসাবে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয় ২০১১ সালে মাত্র ২.৫৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ১৫.২৫ শতাংশে (সারণি ১.৭)। পরবর্তী ০২ বছরে এই হার কমে গিয়ে ২০১৯ অর্থবছরে ১৩.৯২ শতাংশ দাড়িয়েছে, যদিও সামাজিক নিরাপত্তা অবিমিশ্র ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়েছে (২০১৮ অর্থবছরে ৩২.৭ শতাংশ ও ২০১৯ অর্থবছরে ১৯.৩ শতাংশ)।

## ১০.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

দারিদ্র্য বিমোচন এবং আপেক্ষিক বঞ্চনার ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণ বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিকল্পিত নীতি বাস্তবায়নের ব্যর্থতা এর পেছনে অংশত দায়ী। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রগতি, শ্রম উৎপাদনশীলতা ও মজুরী বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ (এসএমই) বৃদ্ধি বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে। যাই হোক, কর পূর্নব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের আয়কে প্রগতিশীল করারোপনীতির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়ের অংশ বাড়েনি।

গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আনয়ণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে রেমিটেন্সনির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বিনিয়োগে উৎসাহিত করা উচিত। ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে আরো সুনির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো তদারকি প্রয়োজন। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রশিক্ষণ সুবিধা, ঝুঁকির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান (যেমন, বীমা)এবং ঋণ পরিশোধে সহায়তা প্রদান জরুরী যাতে তারা বহনযোগ্য নয় এমন ঋণে জড়িয়ে না পড়ে। সরকার এদের সবাইকে আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের মূল স্রোতে একীভূত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে যদিওএটা অনস্বীকার্য যে, এর ফলাফল এখনো দৃশ্যমান হয়নি।

## ১০.৫ ভবিষ্যত করণীয়

দেশে অসমতার উর্দ্ধমুখী প্রবণতা এবং উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে সরকার সর্বদাই অবগত। বৈষম্যের কারণে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে বড় প্রভাব ফেলার জন্য সরকারকে এই সমস্যা মোকাবেলায় আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আশার কথা হলো, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ সংক্রান্ত কিছু নীতি এরই মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। (২০১৬-২০২০)।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন**

বৈষম্য রোধের জন্য সকল শ্রেণি পেশার মানুষ বিশেষ করে, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য চক্র ভেঙে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে, তাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, আয় বন্টন উন্নত হবে, সর্বোপরি বৃদ্ধি পাবে প্রবৃদ্ধির হার। এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে যথাক্রমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির কমপক্ষে ৩.৫ শতাংশ ও ২ শতাংশ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে।

**গ্রামীণ অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়ন**

গ্রামীণ অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রামের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, সেচব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং পানির লবণাক্ততা নিরোধ প্রকল্পে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের চাষাবাদ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সহনীয় বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করাও জরুরি। এর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে, শ্রমিকদের গড় উৎপাদনশীলতা ও গ্রামীণ মজুরী বাড়বে এবং গ্রামীন মানুষের নগরকেন্দ্রিক কর্মসন্ধান প্রবণতা হ্রাস পাবে।

**ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ঋণ (এসএমই)**

ক্ষুদ্র ঋণ, সম্পদ সঞ্চয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করে। একইভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ ঋণ (এসএমই) গ্রামের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মূলধনের সংস্থান করে এবং স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

**সামাজিক নিরাপত্তা**

সরকার সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলেছে। সরকারি সার্ভিস পেনশন ছাড়া এই খাতে বরাদ্দ জিডিপির ১.৬ শতাংশ। অবশ্য এই কর্মসূচির মান ও দরিদ্র নির্বাচন নিয়ে কিছু উদ্বেগ রয়েছে। এই সমস্ত সুবিধা ও সেবা সবচেয়ে দরিদ্রদের কাছে পৌছাতে পারলে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও বৈশ্বিক ধাক্কা সামলাতে এবং সময়মতো সেবা দিতে পারলে নিশ্চিত করা যাবে যে প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক। এর মাধ্যমে দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটবে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক সংকটের কারণে সৃষ্ট সংকটসহ সব ধরণের সংকট মোকাবেলায় নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকতে সক্ষম হবে। ২০১৫ সালের ১ জুন মন্ত্রিসভায় জাতীয় সামাজিক সংরক্ষণ কৌশল (এনএসএস) অনুমোদন লাভ করে এবং এই লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের একটি পরিকল্পনাও গৃহিত হয়। এই কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো, একটি বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন যা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে (২০২১ পর্যন্ত) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনাটিতে কিছু সূচক দেয়া আছে যার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির গতিবিধি সনাক্ত করা যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে, এদেশে শ্রমিকদের মানসম্মত দক্ষতার ক্ষেত্রে নানা অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে মূলত এসব সমস্যা এবং বৈশ্বিক চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হবে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির সাথে সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হলে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও মজুরী বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে হবে।শ্রমিকদের ক্ষণস্থায়ী অভিবাসন: কর্মজীবিদের অভিবাসন এবং দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার। এর ধারাবাহিকতায় অভিবাসনকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা হবে।স্বদেশ ও বিদেশের পারস্পারিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে নারী অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ এবং অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে। শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিশ্চিতকরণ, অভিবাসন সংক্রান্ত আইনী অবকাঠামো হালনাগাদকরণ এবং শ্রমিকরা যেন বিদেশে কাজ করতে গিয়ে বঞ্চনার শিকার না হয় সেই লক্ষ্যে সচেতনতা তৈরি করা হবে।

**প্রগতিশীল করারোপ পদ্ধতি**

ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য মোকাবেলায় প্রগতিশীল (প্রোগ্রেসিভ) করারোপ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে সরকার জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সক্ষম হবে, যার মূল সুবিধাভোগী হবে দরিদ্র শ্রেণি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

তাছাড়া সরাসরি আয় বৈষম্য রোধের অন্যতম উপায়ও হলো এটি। বর্তমানে দেশের আয়করের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রগতিশীলতা দেখা গেলেও করফাঁকি ও ছলচাতুরীর কারণে সামগ্রিক করভিত্তি কমে যাচ্ছে। কর ব্যবস্থাপনকে এই সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম হতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যেন সকলের ওপর নির্ধারিত আরোপিত কর যথাযথভাবে আদায় করা হয়।

**সুশাসন এবং দক্ষ প্রতিষ্ঠান**

অর্থ পাচার, ঋণ খেলাপী ও সরকারী সম্পদ ব্যবহারে দুর্নীতি ও সরকারী ভূমি দখলদারিত্ব মোকাবেলায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ সুশাসন ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান আয় বন্টন সুষম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## ১০.৬ সারাংশ

প্রবৃদ্ধি প্রসারণ ও দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস সম্মিলনে সরকার একটা দরিদ্র-বান্ধব উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করে আসছে। প্রবৃদ্ধি প্রসারণে ও দারিদ্র্য হ্রাসের নীতিমালাগুলো অনেকাংশে কার্যকর হলেও আয় বিতরণের অসমতাকে বিপরীত দিকে ফিরাতে পারেনি। অতি সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী (খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬), আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও ভোগ বৈষম্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ছিল।

আন্তঃদেশীয় আয় বৈষম্য অনেকাংশে কমেছে। বাংলাদেশ ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ অনুমোদন করেছে যার লক্ষ্য হলো, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা এবং প্রবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা প্রদান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা রাউন্ডের আলোচনা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে শূন্য শুল্কে আমদানির অনুপাত একই রকম রয়েছে। স্মর্তব্য যে ২০০১ সালে দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

এসডিজির সময়কাল পর্যন্ত সরকারি উন্নয়ন সহায়তার বর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, যার বার্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি ২০১৭ সালে পৌঁছে ২৪৫৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

যাই হোক, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন এবং আপেক্ষিক বঞ্চনার ওপর বর্ধিত বৈষম্যের প্রভাব সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো আছেই। অন্যদিকে সব ধরনের আয় প্রগতিশীল করের (প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স) আওতায় নিয়ে আসার সক্ষমতা অর্জনও একটি বড় সমস্যা। এর কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বরাদ্দ ঘাটতি দেখা দেয়। এই সকল সমস্যা রোধে আরো সুনির্দিষ্ট নীতি এবং কর্মসূচি গ্রহন করতে হবে। সুশাসন ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধ, ঋণ খেলাপী, দুর্নীতি, ভূমি দখল এবং সরকারী সম্পদের যথেচ্ছ অপচয় মোকাবেলা করা সম্ভব।

১১

# টেকসই নগর এবং জনপদ

## অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

## ১১.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সারাবিশ্ব নগরায়নের ক্ষেত্রে প্রভূত প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। ২০১৫ সালে প্রায় ৪ বিলিয়ন মানুষ, অর্থাৎ মোট বিশ্ব জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ, শহরে বাস করতো। তবে এই দ্রুত নগরায়ণ ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে অন্যতম শহরে বস্তির বিস্তার অপর্যাপ্ত শহরে সেবা ও অবকাঠামো এবং বায়ুদুষণ। অভীষ্ট ১১ শহর এবং মানব স্থাপনাকে অন্তর্ভুক্তিমুলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনীয় এবং টেকসই রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। তবে এটা করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সকলের জন্য নিরাপদ এবং মূল্যসাশ্রয়ী গৃহায়ণ এবং মৌলিক সেবায় পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং বস্তিগুলো উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। বিশেষ করে, অরক্ষিত জনগণের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই অভীষ্ট আরও গুরুত্ব বিধানের দাবী করে, নিরাপদ, সামর্থ্যের ভিতর এবং সহজলভ্য পরিবহণ পদ্ধতির সংস্থান। আরও আছে, টেকসই নগরায়ন এবং অংশীদারিত্বমূলক এবং সংহতভাবে টেকসই পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষার কথা। উক্ত অভীষ্টে আছে বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার মতো লক্ষ্যও। বলা বাহুল্য যে, শহরগুলোকে নিরাপদ করতে হলে শহরের পরিবেশগত প্রতিকূল প্রভাব এবং দুর্যোগের ফলে মৃতের সংখ্যা যথাসম্ভব দ্রুত কমাতে হবে। বিশেষ করে নারী এবং শিশু, বয়স্ক ও দৈহিকভাবে অসমর্থ মানুষের জন্য যদি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সর্বজনীন সুবিধা সৃষ্টি করা যায়; তা হলে জীবনমান উন্নীত করা যায়।আর এই সমস্ত, বহুবিধ ও বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পাওয়ার প্রয়োজন আছে যাতে তারা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল নির্মাণ গড়তে পারে।

## ১১.২ বাংলাদেশে এসডিজি ১১ অবস্থান

নগরায়ণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটা অবশ্যম্ভাবী পরণতি বলে ধরে নেয়া হয়। একটা আদর্শিক স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই নগর পরিবেশ বলতে নগরের বিভিন্ন রকম সেবার সুযোগে সহজসাধ্য প্রবেশগম্যতার আলোকে সংজ্ঞায়িত করা যায় (হক ও অন্যান্য ২০১৪):

- পরিবহণ – বাস, ট্রেন অথবা ট্রাম থামে এমন জায়গার দূরত্ব ৫০০ মিটারের কম। হুইল চেয়ার যেতে পারে এমন প্রশস্ত পাকা ফুটপাত রয়েছে এবং গণবাহনের উপর চাপ কম থাকার সময় কমপক্ষে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর নিয়মিত সেবা পাওয়া যায়।
- খাদ্য এবং পণ্য–দোকানের দূরত্ব ৫০০ মিটারের নীচে।
- সবুজ জায়গা–পার্কের দূরত্ব ৫০০ মিটারের নীচে।
- প্রবেশগম্যতা বা সুযোগ–কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের নিমিত্তে নিরাপদ হাঁটা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে যাবার জন্য সাইকেলের পথ – সব মিলিয়ে গণপরিবহণে আধা ঘন্টার নীচে।
- আবাসন–পরিবেশ নীতি অনুসরণের জন্য, বসত বাড়ি নির্মাণে আবাসনের দাম ও রকমের মিশ্রণ ভিতর ও বাহিরে বায়ুর গুনগত মান বিবেচনায় নেয়া।
- সামাজিক সংযোগ – আশপাশে জনপদ আছে এমন একটা ধারণা; নিরাপদ এবং সহিষ্ণু পরিবেশ

যাই হোক, আপাতদৃষ্টে বাংলাদেশে নগরায়ণের মাত্রা (মোট জনসংখ্যার তুলনায় শহরের জনসংখ্যা) অপেক্ষাকৃত এক হিসাবে দেখা যায়, ২০১৬ সালে জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ শহরে বাস করতো। তবে শহরে বাসরত জনসংখ্যার সংখ্যাগত হিসাবে এটা বেশ বড় অংক এবং অবিমিশ্র অর্থে এই সংখ্যাটা ৫৬.২৮ মিলিয়ন যা দক্ষিণ কোরিয়ার মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

অন্যদিকে ভৌগলিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের নগরায়ণ স্তরে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান যেমন: সাতক্ষীরা জেলায় ৭.২ শতাংশ হতে ঢাকা জেলায় ৯০ শতাংশের উপর পর্যন্ত। বাংলাদেশে মোট ৫৭০টি শহর কেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে ঢাকা একটা মেগাশহর এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট হলো মেট্রোপলিটন এরিয়া। এর মধ্যে ২৫টি শহরের জনসংখ্যা ১ লাখের উপর আর বাকীগুলো ছোট নগর।

**নগর আবাসন**

বাংলাদেশে সকল শহর ও নগরের মূল সমস্যা পর্যাপ্ত আবাসনের অভাব। শহরে আবাসন ঘাটতি ২০০১ সালের ১.১৩ মিলিয়ন ইউনিট থেকে ২০১০ সালে ৪.৬ মিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছেছে। ঐ সময়কালে শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৪৪ শতাংশ বাস করতো কাঁচাগৃহে এবং ২৯ শতাংশ বাস করতো আধপাকা গৃহে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, শহুরে খানার একটা বিরাট অংশ এমন বাড়িতে বাস করে যার গুণগত মান খুব

নিচের দিকে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে এইচআইইএস ২০১৬ কিছুটা স্বস্তিদায়ক সংবাদ দিচ্ছে আর তা হলো,সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবাসনের মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে যে প্রায় ৫৭ শতাংশ শহুরে খানা ইট সিমেন্ট মিশ্রিত দেয়ালের বাড়িতে বাস করে। সাম্প্রতিক কালে ঢাকা শহরে জমির দাম আকাশচুম্বী হওয়ার কারণে নিম্ন থেকে মধ্যবিত্ত আয়ের গোষ্ঠীর কাছে আবাসন অনেকটা সোনার হরিণ হয়ে থাকছে (আহমেদ ২০১৭)।

গ্রাম থেকে শহরে দরিদ্র মানুষের অব্যাহত অভিবাসন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের জন্য আশ্রয়স্থলের অভাবে শহরে বস্তির সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে দেশে বিদ্যমান মোট বস্তির-২৪.৩৫ শতাংশ ছিল ঢাকাতে, তারপর চট্টগ্রামে ১৫.৯০ শতাংশ। বস্তিতে বাসরত খানার ৯৬ শতাংশের কাছাকাছি পাকা নয় এমন খুব নিম্নমানের বাড়িতে বাস করে।

**নগর পরিবহন**

শহরের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং গড়পড়তা আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবহন সেবার চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে এবং স্বভাবতই এই চাহিদা মেটানোর জন্য নানা ধরণের যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শহরের রাস্তায় দেখা যায় (জিইডি ২০১৫)। এর ফলে শহরের পরিবহন জগতে তীব্র যানজট একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই সমস্যা রাজধানী শহর ঢাকাতে বেশ প্রকট হলেও অন্যান্য শহর ও শহরকেন্দ্রেও তীব্র ও যানজট একটি সাধারণ সমস্যা। অবস্থা এতই শোচনীয় যে, ঢাকা শহরে যান্ত্রিক পরিবহণের গতি প্রায় হাঁটার গতিতে নেমে এসেছে – প্রতিঘন্টায় ৫ কিলোমিটার! একটা সাম্প্রতিক অধ্যয়ন (হোসেন ২০১৮) হিসেব করে দেখিয়েছে যে, যানজটের কারণে প্রতিদিন ঢাকা শহরে ৫ মিলিয়ন কর্ম–ঘন্টা নষ্ট হয়। এই দূরাবস্থার জন্য অনেক উপাদান দায়ী যার মধ্যে আছে পরিকল্পনার অভাব এবং দুরদর্শীতার অভাব এবং গণপরিবহনের ঘাটতি সম্পর্কে আগাম ধারণার অভাব এবং গণপরিবহন ব্যবস্থাপনার ঘাটতি। অন্যদিকে, নারীদের জন্য গণপরিবহনের অবস্থা আরও খারাপ – অনিরাপদ, অতিমাত্রায় ভিড় এবং অনেক সময় পরিবহনে যৌন নিপীড়নের শিকার হয় নারী।

**পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন**

সময়ের বিবর্তনে শহরাঞ্চলে নলের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির (পাইপড ওয়াটার) যোগান বেড়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু শহুরে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ওই অগ্রগতিটুকু খুব ছোট বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এইচআইইএস ২০১৬ সালের প্রাপ্ত তথ্য বলছে, শহুরে খানার মাত্র ৩৭.২৮ শতাংশের এই পানি ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। অবশ্য শহর থেকে শহরে এই সুযোগ প্রাপ্তিতে বড় তারতম্য লক্ষ্যণীয় যেমন: মেগাসিটি ঢাকাতে ঢাকা ওয়াসা তার সেবা এলাকায় ৯০ শতাংশ প্রয়োজন মেটায় অথচ জেলা শহরগুলোতে মাত্র ১৯ শতাংশ সেই সুযোগটি পায়। ঢাকা ছাড়া প্রায় সকল শহর-কেন্দ্রে পয়ঃপ্রণালী নেই এবং একটা বিরাট সংখ্যক খানা মলশোধনাগারের সাথে সংযুক্ত নয় (আহমেদ ২০১৭)। তারপরেও বলতে হয়, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে যেমন, ১৯৮১ সালে ৩২.৪ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ৭৬.৮ শতাংশ (বিবিএস ২০১৭)।

**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste)**

বেশিরভাগ শহর কেন্দ্রে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের সমস্যা বেশ প্রকট। ঢাকা শহরের কথাই যদি ধরা হয়, প্রতিদিন যে পরিমাণ বর্জ্য নির্গত হয় তার মাত্র ৬০ শতাংশ সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করে। অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা ভাল সিলেট এবং চট্টগ্রামে যেখানে যথাক্রমে ৭৬ ও ৭০ শতাংশ বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সর্বনিম্নে আছে রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশাল শহর (জিইডি ২০১৫)।

**দুর্যোগজনিত ক্ষতি**

বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুখোমুখি, যেমন: নদী-ভাঙ্গন, সাইক্লোন, খরা, টর্নেডো, শৈত্য প্রবাহ, বন্যা, হঠাৎ বন্যা এবং ভূমিকম্প। আরও আছে মানবসৃষ্ট দূর্যোগ যেমন: আগুন ও দালান ধ্বস। এর সাথে উদীয়মান প্রতিকূল পরিবেশ যেমন জলবায়ু পরিবর্তন এবং লবণাক্ততা নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসে দাঁড়ায়। বিশেষত জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সংঘটন ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, এমনিতেই দুর্যোগের কারণে বছরে জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ হারিয়ে যায় এবং সেই ক্ষতি জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে আরও বেগবান হবার সম্ভাবনা বেশি থাকছে (জিইডি ২০১৫)। তবে এটা ঠিক যে, ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালের বিধ্বংসী সাইক্লোনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত হয়ে বাংলাদেশ দুর্যোগজনিত নাজুকতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এমনকি জীবন-জীবিকা রক্ষাকল্পে দীর্ঘমেয়াদী তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগের মাধ্যমে উপকূল অঞ্চলে অভিঘাতসহনশীল কাঠামো সৃষ্টি করে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এসমস্ত প্রচেষ্টা সত্বেও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে জনগণের নাজুকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় ঢাকা শহরের কথা। ভূমিকম্পে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর হচ্ছে ঢাকা এবং এর স্থাপনাগুলো চরম ঝুঁকিপূর্ণ। উঁচু জনঘনত্ব এবং দ্রুত নগরায়ণ সেই ঝুঁকিকে তীব্রতর করে তুলছে মাত্র। ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি আর্থ-কোয়েক ডিজ্যাস্টার রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্বের মধ্যে ভূমিকম্পের দিক থেকে ঢাকা হচ্ছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর। এই শহরের স্থাপনাগুলো খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলেই ভূমিকম্পের ঝুঁকি বেশি। প্রতিনিয়ত অপরিকল্পিত দালান নির্মাণ, রাস্তা ছোট করার অব্যাহত প্রচেষ্টা, নির্মাণে দাহ্য সামগ্রী ব্যবহার, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সচেতনতার অভাব ইত্যাদি বড় মাপের ঝুঁকি বৃদ্ধিতে ইন্ধন দিচ্ছে। শহরের দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে (ডিআরআর) বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশ আন্তরিকভাবে এ দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত। যাই হোক, গ্রামাঞ্চলে এসব কর্মকাণ্ড জটিল শহুরে পরিবেশে চাইতে অধিক কার্যকর। প্রসঙ্গত শহরভিত্তিক অভিঘাতসহনশীল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান বাধাগুলো উল্লেখ করতেই হয় যেমন, শহর শাসন এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক এবং শহুরে জনসংখ্যার দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং গতিময় সংগঠনের অভাব এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন। এছাড়া, শহুরে অংশীজনের মধ্যে যথাযথ সংযোগের এবং পদ্ধতি গ্রহণে সমকালীনতার অভাব এই ধরনের সংকট সৃষ্টিতে বেশ বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। সবশেষে, শহরের স্থানীয় সরকারগুলো যে অপর্যাপ্ত দায়িত্ব এবং শায়ত্বশাসন ও আর্থিক ক্ষমতার অভাবে থাকে সেকথা তো সবারই জানা (সেভ দি চিলড্রেন ২০১৭)।

## ১১.৩ টেকসই শহর ও জনপদ সৃষ্টিতে সরকারি প্রচেষ্টা

**আবাসন:** জনগণের জন্য আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে, গণখাতের কর্মচারীদের জন্য সরকার বাড়ি এবং ফ্ল্যাট বানায়; নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন করে। অতিসম্প্রতি জমির প্রবল স্বল্পতার প্রেক্ষিতে সরকার বহুতল ভবনেফ্ল্যাট তৈরি করে সামর্থ্য সাপেক্ষে বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে।

**বস্তি আবাসন:** বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Bangladesh-Pro-Poor Slums Integration Project-এর আওতায় ২০১৬ সালে সরকার আশ্রয় ও জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু পৌরসভায় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং নির্বাচিত এলাকাগুলো নিম্ন আয়ের অপ্রাতিষ্ঠানিক বসতি হিসাবে গণ্য করা হয়। এই প্রকল্পের মধ্যে আশ্রয় ও ঋণসহ মোট ৫টি অংশ আছে। বস্তিবাসীদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঢাকা বস্তিবাসীদের জন্য ১০,০০০ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ভাড়া-ভিত্তিক এই ফ্ল্যাটগুলো মিরপুর হাউজিং স্টেটে নির্মাণ করবে। এদিকে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য আবাসিক এ্যাপার্টমেন্টের কাজ এগিয়ে চলেছে।

বস্তি উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, ইউনিসেফের অর্থায়নে প্রথম প্রকল্প শুরু হয় ১৯৮২ সালে। এই প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল বস্তিতে অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো ও সেখানকার দারিদ্র্য হ্রাস করা। আর অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে নালা ও পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী নির্মাণ, ফুটপাথ, ল্যাট্রিনস, জঞ্জাল আধার, পানি সরবরাহ, বন্যা থেকে রক্ষা এবং রাস্তার বাতি ইত্যাদি। তাছাড়া, দক্ষতা অর্জনে সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ঋণে প্রবেশগম্যতা দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। ১৯৯৩ সালে মিরপুরের ভাসানটেকে সরকার একটা বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়িত করে। সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার (পিপিপি) আওতায় একটা প্রকল্প যেখানে সরকার জমি দিয়েছে আর বেসরকারি আবাসন সংস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মাণ, পরিচালন ও হস্তান্তর পদ্ধতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ফ্ল্যাট দিয়েছে। অবশ্য সামর্থ্যের মধ্যে ছিল না বলে পরিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই ফ্ল্যাট পেতে ব্যর্থ হয়।

**রাস্তা অবকাঠামো:** রাস্তা নির্মাণ ও নিস্কাশন প্রক্রিয়া অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত আছে এলজিইডি, ওয়াসা, এবং ইউএলজিআই। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক শহুরে সেবা উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। বিশেষত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কারিগরি সহায়তা দিয়ে রাস্তা যোগাযোগ ও অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে এলজিইডি শহুরে সেবা উন্নয়নে সরকারি অর্থায়নে ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। এলজিইডি এরকম আরও ৮টি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে জড়িত যেগুলোর অর্থায়নে উন্নয়ন সহযোগী (ডিপি) জড়িত থাকলেও ম্যাচিং ফান্ডের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দিয়েছে সরকার। চলমান শহর উন্নয়ন প্রকল্পগুলো শেষ হলে পরে ৭৩৬০ কিঃমিঃ রাস্তা, ১৫০২ কিঃমিঃ নিস্কাশন, ৩৩২৯ মিটার পুল/কালভার্ট, ৩৬টি বাস/ট্রাক টার্মিনাল, ২২টি সাইক্লোন শেলটার, ১৫২ কিঃমিঃ ফুটপাথ, ৪০টি বর্জ্য নালা জায়গা এবং ৩৫টি বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট তৈরিহবে।

জাইকার সাহায্যে নেয়া উত্তর বাংলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (NOBIDEP) ১৮টি পৌরসভা নিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে, উপকূলীয় অঞ্চলের শহরগুলোতে এডিবির পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় ঈঞঊওচ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি এমনভাবে করা হয় যাতে বরিশাল-খুলনা অঞ্চলে ১০টি পৌরসভায় জলবায়ুজনিত অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও সুশাসন শক্তিশালী করা যায় (জিইডি ২০১৮)।

**নিষ্কাশন প্রক্রিয়া অবকাঠামো:** ঢাকা ওয়াসা নিষ্কাশনের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করেছে। খুলনা ওয়াসাও সেখানকার জন্য এইরকম পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় নিষ্কাশন প্রক্রিয়া তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের (BCCTF) সহায়তায় বিভিন্ন পৌরসভায় ১০০টির বেশি ক্ষুদ্র নিষ্কাশন প্রক্রিয়া উন্নীত প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে যাতে এই প্রকল্পগুলোর পৌরসভাগুলোর জলবায়ু অভিঘাত সহনীয় করতে তুলতে সক্ষম হয়।

**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** আরবান লোকাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিউশন (ইউএলজিআইএস) কর্তৃক এটা অগ্রাধিকারমূলক পরিষেবা। একমাত্র ঢাকা শহরেই বসবাসকারী খানাগুলো প্রতিদিন ৬০০০ টন বর্জ্য উৎপাদন করে। ঐতিহ্যগতভাবে কোনো একটা খোলা অথচ অব্যবহৃত জায়গায় আবর্জনার স্তুপ ফেলা হতো; কেবলমাত্র ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি) পরিকল্পিত উপায়ে ও পরিচ্ছন্নতা ও দুর্গন্ধ বিবেচনায় নিয়ে নির্দিষ্ট অবর্জনা ফেলা হয় এবং আশা করা যায় ওই জায়গাগুলো অচিরেই নিঃশেষিত হবে। দেশে বিদ্যমান জমির স্বল্পতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার ভস্মসৎকার করার মতো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কথা ভাবছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) ডিএনসিসি, ডিএসসিসি ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের (এনসিসি) জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প পাশ করে (ইআরডি ২০১৪ক)।

**পানি সরবরাহ:** ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী শহরে পানি সরবরাহে নিযুক্ত সংস্থার নাম ওয়াসা। আর অন্যান্য শহরগুলোতে এই দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো ইউএলজিআইএস বা নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। পানিসংকট দূরীকরনে এই খাতে সরকার কর্তৃক অপ্রথাগত এবং নবধারামূলক চিন্তাভাবনা চলছে। পানি সরবরাহে টেকসই উন্নতি অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমানোর প্রয়াস নেয়া হচ্ছে, আর তাই বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য সরকারের চেষ্টা চলছে। ঢাকা শহরে প্রতিদিন পানির চাহিদা প্রায় ২৩৫ কোটি লিটার। ঢাকা ওয়াসার বর্তমান ক্ষমতা ২৪২ কোটি লিটার যার মধ্যে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির অনুপাত ৭০:৩০। তাছাড়া অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সরকার তিনটি মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে যথা: দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পদ্মা (যশলদিয়া) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রজেক্ট, দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রজেক্ট (পর্ব-৩) এবং দৈনিক ৫০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ঢাকা পরিবেশগত টেকসই পানি সরবরাহ প্রকল্প।

চট্টগ্রামে ওয়াসার আওতাধীন এলাকায় (সিওয়াসা) পানযোগ্য পানির চাহিদা ৫০ কোটি লিটার। শেখ হাসিনা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সফলতার সাথে সূচনার পর থেকে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্ণফুলি নদী থেকে দৈনিক ১৪.৩ কোটি লিটার পানি যোগান দেয় এবং বর্তমান এই সংস্থাটি প্রয়োজনের ৭০ শতাংশ পানি সরবরাহ করে। তাছাড়া, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বর্তমান দৈনিক পানি সরবরাহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আরও তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে এবং এগুলো হল কর্ণফুলি পানি সরবরাহ প্রকল্প (পর্ব-২) যার ক্ষমতা দৈনিক ১৪.৩ কোটি লিটার, দৈনিক ৯ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প এবং দৈনিক ৬ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ভান্ডাল ঝুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প।

দৈনিক ১১ কোটি লিটার পানি সরবরাহ ক্ষমতা নিয়ে KhulnaWater Supply Project বাস্তবায়নের পথে যা বাস্তবায়িত হলে পানি সরবরাহ ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া ২০২৩ সালের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ১০০ শতাংশ ব্যবহারকল্পে Khulna Water Supply প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

রাজশাহী শহরে পদ্মার গোদাগারি পয়েন্ট থেকে পানি সরবরাহ করার একটা প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ নিশ্চিত হবে। সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এবং ১৮টি পৌরসভার শতভাগ ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের প্রকল্প রয়েছে। আর ২৩টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠার প্রকল্প কাজ করছে। এ পর্যন্ত মোট ১৫২টি পৌরসভায় ডিপিএইচই কর্তৃক নলের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে (ইআরডি ২০১৮)। এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, ওয়াসাগুলো দরিদ্র জনগণের জন্য যে পানির ব্যবস্থা করে তার বিল পরিশোধ করা হয় সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে।

**পয়ঃনিষ্কাশন/নর্দমা ব্যবস্থাপনা:** উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগজনিত সমস্যা বাংলাদেশ বেশ ভালভাবেই মোকাবেলা করছে। বস্তুত উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের মাত্রা যেখানে ২০১৫ সালে ছিল মাত্র ১ শতাংশ, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার আওতা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৬৩ শতাংশ হয়েছে। যাই হোক, ঢাকা শহরের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার আওতা মাত্র ২০ শতাংশ। ঢাকা ওয়াসা সুয়েজ মাস্টার প্ল্যান (এসএমপি) শেষ করে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এসএমপির আওতায় ৫টি পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার প্ল্যান্ট (এসটিপি) স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার মধ্যে দাশেরকান্দিতে দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পয়ঃনিষ্কাশন/নর্দমা শোধনের কাজ চলছে। সায়েদাবাদ ও উত্তরায় আরও দুটি এসটিপি নির্মাণের কাজ পাইপলাইনে আছে। বাকী দুটো পর্যায়ক্রমে নির্মিত হবে মিরপুর ও রায়েরবাজার। চট্টগ্রাম ওয়াসা (সিডব্লিউএসএ) বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পয়ঃনিষ্কাশন এবং নর্দমা ব্যবস্থাপনার মাষ্টার প্ল্যান সম্পূর্ণ করে রেখেছে। তেমনি এডিবির সহায়তায় খুলনা ওয়াসা (কেডব্লিউএসএ) পয়ঃনিষ্কাশন সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন শেষ করে তিনধাপে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবছে (ইআরডি ২০১৮ক)।

**শহরে অভিঘাতসহনশীল প্রকল্প:** ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনে অভিঘাতসহনশীল প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে। এর উদ্দেশ্য কেন্দ্রিয়ভাবে সমন্বয়কৃত ও স্থানীয়ভাবে ঝুঁকি দমনের জন্য এক সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা (ডিআরএম)। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও এর মধ্যে থাকবে জরুরি অপারেশন সেন্টার, জরুরি পণ্যসামগ্রীর গুদাম, স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, জরুরি ব্যবস্থার জন্য ভারবাহী যন্ত্র, উদ্ধার কার্যক্রম ও জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

**বায়ুদূষণ:** বাংলাদেশ একটা এমবিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মান নির্ধারণ করেছে। অতীতে বায়ুদূষণ দূর করতে রাখতে বেশ কিছু নির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে নির্দ্দিষ্ট নির্গত দূষণ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর মধ্যে আছে ঢাকাশহরে টু স্ট্রোক থ্রি হুইলার চলাচল নিষিদ্ধ, পেট্রোল থেকে সিসা প্রত্যাহার, মোটরযানে সিএনজির ব্যবহার ও রূপান্তর প্রভৃতি। আরও আছে পাঁচ বছর পুরনো গাড়ি বাতিল, নির্গতকরণ মান নির্ধারণ, ইটভাটা থেকে নির্গতকরণ হ্রাসকল্পে নীতিমালা গ্রহণ, উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং উন্নত চুলার প্রসারের প্রচারণা। এই কৌশলগুলোর কিছু কাজে লেগেছে, কিন্তু অন্যগুলো তেমন কার্যকর করা যায় নি (ডিওই ২০১২)।

এসমস্ত নীতিমালা নেয়া সত্বেও বাংলাদেশের বিশেষত ঢাকা শহরে বায়ুর মানে উন্নতি ঘটেনি বরং উল্টোটি ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। বায়ুমান ২০১০ থেকে অব্যাহতভাবে নিম্নমুখীতার জের ধরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ১৪ মিলিয়ন মানুষের এই ঢাকা শহর বিশ্বের তৃতীয় দূষিত শহর। ভারতের রাজধানী দিল্লী সবচেয়ে দুষিত শহর এবং তারপরে আছে কায়রো। প্রতিবছর শুধু বায়ু দুষণে বাংলাদেশে ১২২,৪০০ জীবন ঝরে যায় বলে একটি হিসাব বলছে (হেলথ ইফেকটস ইন্সটিটিউট ২০১৭)।

**বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যসুরক্ষা প্রচেষ্টা:** সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২০ নাগাদ দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং এসডিজি অভীষ্ট বাস্তবায়নে একটা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। বর্তমান ও অতীত কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে,গত ৩ বছরে ২৩টি প্রত্নতাত্বিক অবস্থান খনন কাজ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি প্রত্নতাত্বিক অবস্থান খনন কাজ হাতে নেয়া এবং ৩৪টি জেলায় প্রত্নতাত্বিক সমীক্ষা সমাপ্ত করা। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে একই সাথে সংরক্ষণমূলক কর্মকান্ডও চলছে। সবশেষে, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার সুরক্ষায় ও সেই সম্পর্কিত গবেষণায় যেসমস্ত বেসরকারি সংগঠন জড়িত রয়েছে তাদের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

এডিবির অর্থায়নে দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প (বাংলাদেশের অংশ) শেষ হয়েছে যার উদ্দেশ্য সংস্কৃতি-ভিত্তিক পর্যটন উন্নতি করা এবং পর্যটনের সাথে স্থানীয় জনগণের সংযোগ বৃদ্ধিতে কমিউনিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। আশা করা যায় যে, এর ফলে কমিউনিটি পর্যটন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যাবে।

গেল ৩ বছরে প্রায় ৫৭টি গবেষণা বই ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো মূলত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে রচিত। তাছাড়া, বিলুপ্তির পথে থাকা প্রায় ১৩০০০ লোকগীতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা গেছে। গেল দু'বছরে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' এবং 'শীতলপাটি' – সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি সেলাই ইউনেস্কো কর্তৃক সদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যহিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

## ১১.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

বড় ও ছোট শহরগুলোকে যদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে দেখা যায় এবং তাদের যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হয় তা হলে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মাথায় রাখা দরকার।

**পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী সগৃহায়ণ:**

দ্রুত নগরায়নের ফলে ঘরবাড়ীর চাহিদা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়ে বসতি ঘাটতি সৃষ্টি করেছে। নগরায়নের বর্তমান হার ও বসতি সরবরাহ বিবেচনায় নিলে ভবিষ্যতে এই ঘাটতি তীব্রতর হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যেখানে নিম্ন ও মধ্য আয়ের লোকেরা তাদের অর্থ সামর্থ্যের ভেতর ঘর ভাড়া করতে ব্যর্থ হবে এবং বাড়ী ভাড়া পরিশোধে মজুরি আয়ের একটা বিরাট অংশ চলে যাবে।

**সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা:**

একটা দক্ষ গণপরিবহন পদ্ধতির প্রভাব অনেক এবং প্রভাবগুলো পরস্পর সম্পর্কিত। যেমন; ধীর গতিতে চলা পরিবহনের জন্য কর্মঘন্টা নষ্ট হয় এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে; জ্বালানীব্যয় ও নির্গতকরণ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত যাত্রীবাহী বাস ভ্রমণ আনন্দদায়ক হয় না এবং বিশেষত নারীদের জন্য তো তা নিরাপদ নয়। তবে আশা করা যায় নগর পরিবহণ খাতে বৈপ্লবিক কিছু পরিবর্তন ও নবদ্যোগের ফলে

ঢাকার পরিবহন পদ্ধতি বেশ বেগবান, ব্যয়সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক হবে। এগুলোর মধ্যে আছে ৫টি মেট্রো রেললাইন নির্মাণ, দু'টো দ্রুত বাস রুট, ১২০০ কিঃমিঃ নতুন রাস্তা-পথ, ৬টি ফ্লাইওভার/উড়ালসেতু এবং ৩টি সংযোগ রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা। প্রত্যাশিত যে, ২০৩৫ সালের মধ্যে এগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হবে। তার আগে ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মিতব্য উত্তরা ও মতিঝিলের মধ্যকার মেট্রো রেললাইন এবং গাজীপুর থেকে মহাখালী পর্যন্ত দ্রুত বাসলাইন পরিবহন সমস্যা কিছুটা হলেও কমিয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

**বায়ুর মান উন্নতি:**

দ্রুত নগরায়নের ফলে উর্ধমুখী নির্মাণসামগ্রীর চাহিদা এবং নির্মাণজনিত কর্মকাণ্ড বিশেষত শহরাঞ্চলে বায়ু দুষণের প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়। সরকারি নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও ঢাকার আশেপাশে অসংখ্য ইটের ভাটা গড়ে উঠছে এবং এই ভাটাগুলো থেকে নির্গত ধুলো ও ধোঁয়া দুষণ সৃষ্টিতে ৫২ শতাংশ ভূমিকা রাখে। অবশ্য আনন্দের খবর এই যে, ইতিমধ্যে ইটভাটার ৬০ শতাংশ দক্ষ জ্বালানী উৎস ব্যবহার করা শুরু করেছে। সরকার এ ভাটাগুলোর পরিচালন পদ্ধতির উপর তীক্ষ্ম নজর রাখছে যাতে তারা দক্ষ ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং যাতে ঐ সমস্ত এলাকায় অ-নিবন্ধনকৃত ইটভাটার অস্তিত্ব না থাকে। ইটের ভাটা ছাড়াও আধা-নির্মিত স্থাপনা ও রাস্তা পরিবেশে ধুলা যুক্ত করে পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং, সুপারিশ হচ্ছে (ক) ব্যক্তিখাতের নির্মাণ কাজ যারা করে তাদেরকে সরকারের বেধে দেয়া নির্মাণ নীতি (বিল্ডিং কোড) মেনে চলতে হবে এবং মালামাল পরিবহণকালে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ধুলা না উড়ে; (খ) শহরের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি এবং এটাকে দক্ষ করতে হবে যাতে অদক্ষতার সাথে জ্বালানী ব্যবহার করতে না পারে (বায়ুতে অতিরিক্ত ২.৫ অনু পদার্থ) সেদিকে নজর দিতে হবে।

**অভিঘাতসহনীয় শহর:**

গ্রাম থেকে শহরে বিশেষত ঢাকা শহরে দরিদ্রদের অভিগমনের প্রধান উৎস পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি জায়গাগুলো যেমন উপকূলীয় অঞ্চল, হাওর, মঙ্গা, নদীভাংগন ইত্যাদি এলাকা। ভবিষ্যতে এ সমস্ত অঞ্চল থেকে অভিবাসীদের আগমন আরও ব্যাপক হতে পারে। এর কারণ প্রধানত জলবায়ুজনিত পরিবর্তন যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি করবে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে, এবং জলবায়ুজনিত কারণে সমুদ্রের স্তর উপরে উঠে নিম্নাঞ্চল পূর্ণ প্লাবিত করবে। আর গ্রাম থেকে মানুষের সিংহভাগ আসে ঢাকা শহরে। ঢাকা শহরকে চাপমুক্ত রাখতে হলে প্রয়োজন জলবায়ু সহনশীল এবং অভিবাসন-বান্ধব অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্বপূর্ণ কিছু শহর সৃষ্টি করা। ইতিমধ্যে সরকার ৪৯১টি উপজেলা সদরে নগরের সেবা সমূহের প্রাপ্যতার ব্যবস্থা করে তাদের ছোট শহর হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে এবং গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রে(রুরাল গ্রোথ সেন্টার) প্রায় ১৪০০ আবাসিক কেন্দ্রস্থল উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে (ইআরডি ২০১৮)।

তবে, এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকাও কম নয়। বিশ্বব্যাংক আরবান রিজিলেন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার উদ্দেশ্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেবার পদ্ধতির উন্নয়ন করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতাবৃদ্ধি। ২০১৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর এক ঋণ চুক্তির মাধ্যমে জাইকা আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট অর্থায়ন করে যার উদ্দেশ্য সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা। এই কর্মসূচিগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো চিহ্নিতকরণে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে, যেমন শহরে ঝুঁকি শনাক্তকরণ, জরুরি কর্মকাণ্ডের জন্য আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা এবং নিরাপদ স্থাপনা ইত্যাদি। তাছাড়া, এই প্রকল্পে অন্য যেসমস্ত সুযোগ রয়েছে তার মধ্যে আছে নির্মাণ ও নকশায় দক্ষতা উন্নয়ন, সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া ঠিক করা, নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণ।

**সম্পদের সীমাবদ্ধতা:**

সাম্প্রতিককালে দেশে ঘটে যাওয়া দ্রুত নগরায়ন এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে উন্নতমানের শহুরে সেবার চাহিদা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে অনেক সেবা আছে যেগুলো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর সমাধান দিতে পারে কিন্তু তার জন্য চাই ব্যয়বহুল বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ প্রত্যাশা পূরণকল্পে শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউজিএলআই) হাতে থাকা অর্থায়ন যথেষ্ট নয়; এক্ষেত্রে আরও বরাদ্দ জরুরি। মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় সরকারের ওপর মঞ্জুরি পাওয়ার নিমিত্ত অত্যধিক নির্ভরশীলতা কোনো টেকসই সমাধান নয়। আর তাই সম্পদ সন্নিবেশে ইউএলজিআইগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্ভাব্য সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার ঘটাতে হবে। বলার বোধ হয় অপেক্ষা রাখে না যে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের জন্য প্রয়োজন নবধারামূলক উদ্ভাবনী উদ্যোগ, বিকল্প উৎসের ব্যবহার (যেমন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ) এবং ঋণের সুবিধায় সুযোগ বৃদ্ধি।

**ঢাকা ও অন্যান্য শহরে প্রধান অংশীজনদের মধ্যকার সমন্বয়**

নগরাঞ্চলে সেবা সুবিধা প্রদানে সংগঠন ও অংশীজন জড়িত থাকে। শহরে বাসরত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থে এই অংশীজনদের মধ্যে সঠিক এবং সময়মতো সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি। অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি করতে সিটি কর্পোরেশন (সিসি) এ্যাক্ট ২০০৯ সিসিকে ক্ষমতা দিয়েছে । আর সিসির সমন্বয় সভা যাতে সুসম্পন্ন করা যায় সে জন্য চিঠির মাধ্যমে সরকার সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তার অর্থ, সরকার চায় ওই সমন্বয় সভায় সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ অংশ নিক। ইতিমধ্যে সিসি সূচিত এই প্রক্রিয়া অংশীদারিত্ব, জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে সুফল পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত, নাগরিকদের অংশগ্রহণ সাপেক্ষে অন্যান্য কমিটিগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায় চালুকৃত প্রকল্পগুলোর এই কমিটিগুলোকে সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে। নাগরিকদের অংশগ্রহণে এই কমিটিগুলোর দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ও সংশ্লিষ্টতা বাড়লে ইউএলডিআইগুলোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণে, বাজেট প্রণয়নে, প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং শহুরে দরিদ্রদের স্বার্থে নেয়া মৌলিক সেবা প্রকল্প তদারকির কাজটি বেশ সুসংহত হবে।

**নীতিমালা, কৌশল এবং মাষ্টার প্ল্যানের সমন্বয়করা**

প্রায় সব সিসির কার্যরত সংগঠনগুলোর নিজস্ব উন্নয়ন কৌশল, নীতি ও মাস্টার প্ল্যান আছে। এই মাস্টার প্ল্যানগুলো খুব কমই সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর ফলে বাস্তবায়নকাল মাস্টার প্ল্যানগুলোর মধ্যে অধিক্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় বলে উন্নয়ন হস্তক্ষেপের কারণে জনদুর্ভোগ চরমে উঠে এবং সম্পদের অপচয় ঘটে। আর এই সমস্যা সহজেই মোকাবেলা করতে হলে সিসিগুলোকে মাস্টার প্ল্যানগুলোকে সমন্বয় ও যুগপৎ করার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তার সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে।

## ১১.৫ সারাংশ

বাংলাদেশে নগরায়ণ মাত্রা বেশ নিচের দিকে। এ দেশে মোট জনগোষ্ঠীর ৩৫ শতাংশ নগরাঞ্চলে বাস করে বলে এক হিসাবে বেড়িয়ে এসেছে। অবিমিশ্র সংখ্যায় মোট ৫৬.২৮ মিলিয়ন মানুষ নগরবাসী এবং সংখ্যাটা বেশ বড়ই বলতে হবে। অপরদিকে নগরায়ণের এই স্তর সাতক্ষীরা জেলার ৭.২ শতাংশ থেকে ঢাকা জেলায় ৯০ শতাংশের উপর বিস্তৃত। বাংলাদেশে ৫৭০টির মতো নগরকেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে ঢাকা শহরকে মেগা সিটি হিসাবে ধরা হয় আর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেটকে বিবেচনা করা হয় পৌরসভা বা মেট্রপলিটন এরিয়া হিসাবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান ২৫টি শহরের জনসংখ্যা এক লাখের ওপর; অন্যান্য খুব ছোট শহরে বাকী মানুষের বাস।

বাংলাদেশের বড় অথবা মধ্যম শহরগুলোতে প্রধান সমস্যা পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাব। ২০১০ সালে আবাসন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪.৬ মিলিয়ন ইউনিট। শহুরে জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৪ শতাংশের আশ্রয়স্থল ছিল খুব নিম্নমানের অস্থায়ী কাঠামোতে আর ২৯ শতাংশের বাস আধা-স্থায়ী আশ্রয়স্থলে। মোট কথা, শহুরে খানার একটা বিরাট অংশ এমন ঘরে বাস করে যার মান অত্যন্ত নিচের দিকে। তবে আশার কথা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমাবর্তিশীল অবস্থার উন্নতি ঘটছে অর্থাৎ, এইচআইইস ২০১৬ মতে, আশ্রয়স্থলের গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপরও বস্তিতে থাকা খানার ৯৬ শতাংশ পাকা নয় এবং অত্যন্ত নিম্নমানের ঘরে বাস করে।

অন্যদিকে, নগরায়নের গতিমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবহন সেবার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে যান্ত্রিক ও অ-যান্ত্রিক পরিবহন রাস্তায় তীব্র যানজট সৃষ্টি করে চলেছে। আর এই যানজটের জন্যে ঢাকা শহরে প্রতিদিন কর্মঘন্টা নষ্ট হয় ৫মিলিয়ন।

পরিবহন সমস্যার পাশাপাশি আছে পানির সমস্যা। এইচআইইস ২০১৬ অনুযায়ী, শহরে বাসরত খানাগুলোর ৩৭.২৮ শতাংশে (নলবাহিত পানির) প্রবেশগম্যতা রয়েছে। অবশ্য শহরভেদে এই অনুপাতের বিস্তর তারতম্য লক্ষণীয় হলেও ঢাকা ওয়াসাঢাকায় নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রয়োজনের ৯০ শতাংশ মেটায়।

পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সমস্যা সব শহরেই। ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সব নগর কেন্দ্রে প্রয়োজন মতো পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই এবং একটা বিরাট সংখ্যক খানা মলশোধনীর সাথে সংযুক্ত নয় (আহমেদ ২০১৭)।

তবে জানাতেই হয় যে, ইদানিং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুযোগ প্রাপ্তিতে প্রশংসনীয় উন্নতি ঘটছে যেমন ১৯৮১ সালে মাত্র ৩২.৪ শতাংশ খানার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ ছিল; ২০১৭ সালে সেই অনুপাত দাঁড়ায় ৭৬.৮ শতাংশ (বিবিএস, ২০১৭)।

পয়ঃনিষ্কাশনের পাশাপাশি বর্জ্য (Solid waste) ব্যবস্থাপনার উন্নতি উল্লেখ করা যায়। ঢাকা শহরে মোট নির্গত বর্জ্যের ৬০ ভাগ সংগ্রহ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। অন্যদিকে সিলেট ও চট্টগ্রাম পরিস্থিতি একটু বেশি ভাল- সেখানে যথাক্রমে ৭৬ ও ৭০ শতাংশ বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে অপেক্ষাকৃত কম বর্জ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে (জিইডি ২০১৫)।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ যেমন নদীভাংগন, সাইক্লোন, খরা, টর্নেডো, শৈত্যপ্রবাহ, বন্য, হঠাৎ বন্যা এবং ভূমিকম্পের প্রকোপ। এর সাথে আগুন ও দালান ধ্বসের মতো মানব-সৃষ্ট দুর্যোগের কথা তো আছেই। তবে আনন্দের সংবাদ হচ্ছে দুর্যোগ প্রবণতার ঝুঁকি হ্রাসে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে বিশ্ব মঞ্চে বিশেষত উপকূলীয় অভিঘাত মোকাবেলায় একটা মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আর সেটা করতে গিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলে জীবন ও জীবিকা রক্ষাকল্পে বিপুল সংখ্যক দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করতে হয়েছে। এসমস্ত প্রচেষ্টা স্বত্বেও জলবায়ুজনিত কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের ঝুঁকি প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের যে কটি শহর ভূমিকম্পের প্রচন্ড ঝুঁকিতে রয়েছে তার মধ্যে ঢাকা শহর অন্যতম।

শহর ও কম্যুনিটি টেকসই করতে দরকার অংশগ্রহণমূলক দায়িত্ব। বিভিন্ন অংশীজন স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণে থাকা সেবা প্রদান করে এই দায়িত্বের অংশীদার হবে এটাই প্রত্যাশিত। যেমন: শহর আবাসন, বস্তি আবাসন, নগর পরিবহন, পানি ও পয়ঃনিস্কাশনের সুব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, বায়ু দূষণ এবং নগর নিরাপত্তা বিধানকল্পে এলজিইডি, ইউএলজিআই এবং তাদের সংস্থাগুলো যথা ওয়াসা, উন্নয়ন অংশীদার এবং সুশীল সমাজ সংগঠন, অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বড় কিংবা ছোট শহর যদি চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করতে হয় তা হলে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে- যেমন, পর্যাপ্ত নিরাপদ ও সামর্থ্যের মধ্যে আবাসন নিশ্চিতকরণ, তেমনি পর্যাপ্ত, প্রবেশগম্য, সামর্থ্যের মধ্যে এবং টেকসই পরিবহনের ব্যবস্থা করা, নগর অভিঘাতসহনীয় পদক্ষেপ নেয়া এবং সম্পদ স্বল্পতার ক্ষেত্রে সমাধান খুঁজে পাওয়া।

# ১২

# পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

## পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরণ নিশ্চিত করা

## ১২.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

এ কথা আজ জানা যে, পৃথিবীর সীমিত সম্পদের বিপরীতে মানবজাতির চাপ ক্রমেই বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯.৬ বিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে বর্তমান জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে গেলে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন, তাতে পৃথিবীর মতো আরো অন্তত তিনটি গ্রহ দরকার। এহেন পরিস্থিতিতেও, অদক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি ও পরিবহন অব্যবস্থাপনার কারণে বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত মোট খাদ্যদ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যায়, যার পরিমাণ প্রায় ১.৩ বিলিয়ন টন এবং টাকার অংকে তা প্রায় ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাস্তুগত প্রতিকূল এই সংকট মোকাবেলায় মানুষের বর্তমান ভোগের ধরণ এবং দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১২ এর উদ্দেশ্য হলো "অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ নিয়ে বেশি করা এবং ভালো থাকা"। এর মাধ্যমে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে, ক্ষয়-ক্ষতি এবং দূষণ রোধ করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

এসডিজি-১২ সর্ববেষ্টিত কর্মকণ্ডের ডাক দেয়:প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ও রাসায়নিক পরিবেশসহনীয় ব্যবস্থাপনা, টেকসই বাণিজ্য, সংগ্রহ পদ্ধতি, নীতি-নির্ধারক কর্তৃক অদক্ষ জীবাশ্ম-জ্বালানীতে ভর্তুকির পরিমাণ যুক্তিসঙ্গতকরণ, পরিবেশ সচেতন জীবন-যাত্রা, নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং গবেষক, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য গোষ্ঠী কর্তৃক উৎপাদন ও ভোগ পদ্ধতিতে দক্ষতা আনয়ন। এসডিজি-১২ এর লক্ষ্য হলো টেকসই উৎপাদন ও ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও অন্যান্য অপচয় কমানো এবং নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য টেকসই উৎপাদন ও ভোগ নিশ্চিতকরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার ওপরও এসডিজি গুরুত্বারোপ করে। টেকসই উন্নয়ন ও এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে, টেকসই পর্যটনের ওপর গুরুত্ব দেয় যার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় দ্রব্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এর মাধ্যমে ব্যবসা- বাণিজ্য, ভোক্তা, নীতি-নির্ধারক, গবেষক, বিজ্ঞানী, খুচরা বিক্রেতা, মিডিয়া ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি বৈশ্বিক অংশিদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

## ১২.২ টেকসই উৎপাদনের ধরন ও ভোগের বর্তমান অবস্থা

১৯৯২ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনের পর থেকেই টেকসই উৎপাদন ও পরিমিত ভোগ বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং ১৯৯৪ সালের অসলো সিম্পোজিয়ামেও এটাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ২০১২ সালে টেকসই উন্নয়নের উপর জাতিসংঘ সম্মেলনে (রিও+২০) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভোগের ওপর ১০ বছর মেয়াদি কর্মকাঠামো গ্রহণ করে (১০ওয়াইএফপি)। এটি একটি বৈশ্বিক কর্মকাঠামো যার মাধ্যমে দেশসমূহ টেকসই ভোগ ও উৎপাদনের দিকে স্থানান্তরিত হবে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১২ অর্জনে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ এখনো টেকসই ভোগ ও উৎপাদনের ওপরে ১০ বছর মেয়াদী কর্মকাঠামো প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়নি, যদিও সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করতে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, প্রাকৃতিক, অবকাঠামোগত এবং মনুষ্যসৃষ্ট দূযোর্গ মোকাবেলায় টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক মূলধন তৈরির চ্যালেঞ্জ বিষয়ে সচেতন রয়েছে (জিইডি-২০১৩)। সম্পদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয়হ্রাস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, বিষাক্ত বর্জ্যের নিরাপদ বন্দোবস্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর হুমকি মোকাবেলায়ও সচেতনতা বাড়ছে।

২০০৯ সাল থেকে শুরু করে বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশ বার্ষিক ৬.৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। গত তিন বছরে সেটা ছিল ৭ শতাংশের ওপরে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৭.৮৬ শতাংশে গিয়ে পৌছে। এই ধারাবাহিক টেকসই প্রবৃদ্ধির কারণে এ দেশে মাথাপিছু আয় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৫১ মার্কিন ডলার, যা ২০১০ সালে ছিল ৭৫৯ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের ২০১৫ সালের সংজ্ঞানুসারে, বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্যআয়ের দেশের কাতারে স্থান করে নিয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পর্দাপনের জন্য মার্চ ২০১৮তে জাতিসংঘের কমিটি অন ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা কর্তৃক প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০০-০৫ সময়ের মধ্যে গড়ে ১.৮ শতাংশ হারে, ২০০৫-১০ সময়ের মধ্যে ১.৭ শতাংশ হারে এবং ২০১০-১৬ সময়কালের মধ্যে ১.২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছে।। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে পরপর তিনটি খানার আয় ও ব্যয় জরিপ থেকে পরিলক্ষিত এই নিম্নগামী হার ভবিষ্যতে টেকসই দারিদ্র বিমোচনের চ্যালেঞ্জকেবড় করে দেখায়। মাথা গুনতি দারিদ্র্য বিমোচন হারের (হেড কাউন্ট পোভার্টি রেট) ভিত্তিতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০১৮ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে। এর বিপরীতে ২০১০ সালে ছিল ৩১.৫ শতাংশ এবং ২০০০ সালে ৪৮.৯ শতাংশ। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, দারিদ্র্য বিমোচনে দারুণ সাফল্য অর্জনের পরেও দেশে এখনো প্রায় ৩৬ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সরকারের উন্নয়ন কৌশলহলো, বিনিয়োগের হার এবং ম্যানুফেকচারিংয়ের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর মাধ্যমে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা। দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর বিকল্প নেই। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অতি দারিদ্র্যের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য স্তরে নামিয়ে আনতে চাইলে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

ম্যানুফেকচারিং-তাড়িত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অবিসম্ভাবীভাবে অর্থনীতিতে অধিকতর জ্বালানীর চাহিদা সৃষ্টি করবে কারণ জ্বালানী হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ও খানার চাহিদা পূরণের উপকরণ। এমতাবস্থায়, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত ক্ষয়-ক্ষতিরোধ এই দু'টি উদ্দেশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ ও জ্বালানী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপদ রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, কার্বন নিঃসরণকারী জ্বালানী শক্তির ব্যবহার ও পরিবহন হ্রাস এবং খোলা জায়গায় বর্জ্য নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে যা অর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে অপচয় কমিয়ে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহার, সংস্কার এবং দীর্ঘ মেয়াদে তাদের কার্যক্ষমতা ধরে রাখার প্রবণতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে পরিবেশের ওপর চাপ কমবে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারের সাথে জ্বালানী শক্তির ভোগ বৃদ্ধির বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। এসসিপি'র জন্য জ্বালানীশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একই পরিমাণ জ্বালানী ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ উৎপাদনে সক্ষম এমন অর্থনৈতিক পূনর্গঠনের মাধ্যমে জ্বালানীর উৎপাদনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে কম জ্বালানী ব্যবহারকারী তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত এবং পাওয়ার ডিভিশনের দক্ষতার কারণে জ্বালানী দক্ষতা বেড়েছে (টেকসই এবং নবায়নযোগ্য এনার্জি শক্তি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) ২০১৫)। দক্ষ জ্বালানী ভোগ ও উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে সরকার "জ্বালানী দক্ষতা ও সংরক্ষণ নীতি-২০১৩' এবং "এনার্জি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা-২০১৫ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষ করে আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও সেবা, সরকারি- বেসরকারি বিভিন্ন খাতের ওপর এই নীতি প্রযোজ্য হবে। গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রচারনামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই দক্ষতা অর্জিত হতে পারে।

## *লক্ষ্যমাত্রা ১২.৩ খুচরা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয় অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসলকাটা পরবর্তী ক্ষতিসহ উৎপাদন ও যোগান শৃঙ্খলে খাদ্য-ক্ষতি হ্রাস করা*

বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্যহানী ও খাদ্য অপচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয়। কারণ দেশগুলোতে এখনো লাখ লাখ মানুষ অভুক্ত থাকে। খাদ্য অপচয় নানা কারণে হতে পারে। তারমধ্যে চাষাবাদকালীন সমস্যা, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, অবকাঠামোগত এবং বাজার বা মূল্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম। জলবায়ুর বিভিন্ন অবস্থান যেমন বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিসহ নানা প্রাকৃতিক দূর্যোগ উৎপাদনকালীন সময়ে ফসলের বিরাট ক্ষতি সাধন করে। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে চাষাবাদ পরবর্তী বিভিন্ন প্রাদুর্ভাবে মোট উৎপাদনের কমপক্ষে ১০ শতাংশ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (নাথ ও অন্যান্য ২০১৬)।

খাদ্য অপচয় হলো, মানুষের ভোগ উপযোগী সেই পরিমাণ খাবার যা খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তার বিভিন্ন আচরণের কারণে নষ্ট হয়ে যায় এবং আর ভক্ষণযোগ্য থাকে না। নানা কারণে এমন হতে পারে। যেমন- ভুল উৎপাদন তারিখ নির্ধারণ, বাজে সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রান্নাবান্নার পদ্ধতিগত ত্রুটি (বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ২০১৫)। আহমেদ ২০১৮ সালের এক হিসেবে দেখিয়েছেন, মোট উৎপাদিত খাদ্যের মধ্যে অপচয় হয়া ৫.৫ শতাংশ যার মধ্যে ৩ শতাংশ অপচয় হয় প্রক্রিয়াজাতকরণকালীন সময়ে, ১.৪ শতাংশ নষ্ট হয় বিতরণের সময় এবং অবশিষ্ট ১.১ শতাংশ খাদ্য অপচয় হয় খাবারের বাসন থেকে।

***২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সবধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এদের বিরূপ প্রভাব কমাতে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো।***

*শহুরে এলাকায় বিভিন্ন উৎস থেকে বর্জ্য উৎপাদিত হয় যেমন– গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক, শিল্পজাত, রাস্তাঘাট পরিস্কার এবং স্বাস্থ্যপরিচর্যাকারী সুযোগ-সুবিধাথেকে উৎপাদিত বর্জ্য। বর্জ্যের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি এবং এর ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বর্জ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের সকল নগর এলাকা মিলিয়ে মোট বর্জ্য উৎপাদন দাঁড়ায় দিনে প্রায় ১৩,৩৩২.৯ টন। যারমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে উৎপাদিত হয় মোট বর্জ্যের যথাক্রমে ৩৪.৮ ভাগ এবং ১১.৬ ভাগ (ইফতেখার, ২০০৬)।*

*বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনো সুসংগঠিত নয়। এখানে বর্তমানে তিন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি রয়েছে যথা– আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, সামাজিক উদ্যোগ এবং অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হলো পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের। এটি একটি প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতি যেখানে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং নিষ্পত্তি বা খালাস করার দায়িত্ব পালন করে স্থানীয় প্রশাসন। এই ব্যবস্থায় বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করার কোনো পদ্ধতি নেই। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো সামাজিক উদ্যোগ। এখানে বিভিন্ন এনজিও এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ করে থাকে। তৃতীয় এবং সর্বশেষ পদ্ধতিটি হলো অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ এবং যথার্থ ভাগাড়ে পৌছে দেওয়ার ব্যবসায় জড়িত বিপুল পরিমাণ অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তি মূল দায়িত্ব পালন করে (আবেদীন ও জহিরুদ্দিন, ২০১৫)।*

*বাংলাদেশে মোট বর্জ্যের মাত্র সামান্য কিছু অংশ কম্পোস্ট তৈরি করে পুনঃব্যবহারযোগ্য করা হয়। ওয়েস্ট কনসার্ন পিপিপি মডেল ব্যবহার করে ঢাকায় একটি বড় পরিসরের কম্পোস্ট প্লান্ট পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পের আওতায়, ওয়েস্ট কনসার্ন দিনে প্রায় ৭০০ টন জৈব বর্জ্য (মিশ্র নয়, কেবল ভেজিটেবল বর্জ্য) সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাথমিকভাবে দিনে ১০০ টন বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে এটি যাত্রা শুরু করছে (এনায়েতুল্লা এবং হাশমী, ২০০৬)। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে উন্মুক্ত অবস্থায় বর্জ্য পোড়ানো, অবৈধ ডাম্পিং এবং উন্মুক্ত ল্যান্ডফিল*

*(বর্জ্য ফেলার স্থান) গ্রিন হাউজ গ্যাসের অন্যতম একটি উৎস। ২০০৫ সালে শহুরে বর্জ্য থেকে নিঃসরিত গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে বার্ষিক প্রায় ২.১৯ মিলিয়ন CO2!*

## ১২.৩ টেকসই উৎপাদনের ধরন ও ভোগ নিশ্চিতকরণে সরকারের প্রচেষ্টা

বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশ লাখ লাখ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশের পথ তৈরি করেছে। কিন্তু পরিবেশগত নানারকম ঝুঁকি এই উন্নয়নের পথে একটি বড় হুমকি। তবে সরকার পরিবেশ দূষণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। এই সকল ঝুঁকি মোকাবেলা করেই টেকসই উৎপাদন, ভোগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১৩ সালের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার (এনএসডিএস) মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তারমধ্য থেকে কিছু পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

### ১২.৩.১ টেকসই কৃষি উৎপাদন

সেচ ব্যস্থার উন্নয়ন, কৃষি জমির অন্যান্য ব্যবহার রোধ, ভারসাম্যপূর্ণ সার ব্যবহার, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দক্ষ পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করার মাধ্যমে টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে। মৎস সংরক্ষণ, প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা, বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ এবং মৎসচাষ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ের টেকসই মৎস উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে। চিংড়ি উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট উৎপাদন এলাকা চিহ্নিতকরণ, চিংড়ি চাষের জন্য বনভূমি দখল না করা এবং রাসায়নিকমুক্ত (অর্গানিক) চিংড়ি চাষ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে টেকসই চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।.

### ১২.৩.২ ম্যানুফেকচারিংয়ে টেকসই উৎপাদন

পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং যত্রতত্র অব্যবহৃত-ক্ষতিকর দ্রব্যাদি ফেলে না রাখার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে টেকসই ম্যানুফেকচারিং উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে। দক্ষ শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজ শিল্প, দূষণরোধে পর্যাপ্ত সহায়তা এবং বৃষ্টির পানি ধরে রেখে উৎপাদন কাজে ব্যবহার উপযোগী শিল্পভবন নির্মানে সচেতনতা তৈরি করা হবে।

### ১২.৩.৩ টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানী

মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে কয়লাভিত্তিক ও পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং তা ব্যবহারে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ওপর জোর দেওয়া হবে।

### ১২.৪.৩ পানি ও বায়ুর গুণগত মান বৃদ্ধি

উপরিস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। পানির গুণগত মান রক্ষার্থে শিল্পদূষণ কমানোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষতিকর কার্বন নিঃসরণ রোধ করতে পুরনো মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন চলাচল বাতিল, উন্নত গণপরিবহন চালু এবং খানা কেন্দ্রিক রান্না বান্না ও ইটভাটার চুল্লীগুলোতে প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ জ্বালানীর ব্যবস্থা করা হবে এবং নির্মাণ কাজের সময় ধুলাবালি ও ময়লা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে।

### ১২.৫.৩ বর্জ্য নিঃসরণ ও ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য নিঃসরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের ৩-আর (রিডিউস, রিসাইকেল এ্যান্ড রিইউজ) নীতির আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কঠিন ও পচনশীল বর্জ্য উৎপাদন কমানো এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সামাজিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।

## ১২.৪ টেকসই ভোগ

চাহিদা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে যেমন: দোকান খোলা রাখার সময় কমানো, সকল অফিসে এসির তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখা, শপিংমল, বাসাবাড়ি এবং অন্যান্য স্থানে অপ্রয়োজনীয় বাড়তি আলোকসজ্জা হ্রাস, কম আলো দেয় এমন ত্রুটিপূর্ণ বাতি, ত্রুটিপূর্ণ রেফ্রিজারেটর, এসি, পাম্প, মটর এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রির পরিবর্তে দক্ষ পণ্য ব্যবহার করতে হবে। রাস্তাঘাটে সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতির পরিবর্তে কম বিদ্যুৎভোগী (এলইডি) বাতি এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত বাতির ব্যবহার বৃদ্ধি।তাছাড়া উৎপাদন খরচ প্রতিকলন করতে বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং তৈলাক্ত জ্বালানীর দাম সমন্বয় করে বিদ্যুৎ বিতরণে সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করা হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্রস সাবসিডাইজেশন এবং নির্দ্দিষ্ট বাজেট সহায়তার সাহায্য নেয়া হবে।

## ১২.৫ সারাংশ

বিশ্বব্যাপী খাদ্যহানি ও খাদ্য অপচয় একটি বড় সংকট, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে এখনো লাখ লাখ মানুষ অভুক্ত থাকে। জলবায়ুর পরিবর্তন, বাজার কাঠামো ও মূল্য পদ্ধতি, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, এবং চাষাবাদকালীন নানা সমস্যার কারণে খাদ্যহানী ঘটে। ফসল উত্তোলনকালীন সময়ে এ ধরনের নানা সমস্যার কারণে বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

খাদ্য অপচয় হলো, মানুষের ভোগ উপযোগী সেই পরিমাণ খাবার যা খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তার বিভিন্ন আচরণের কারণে নষ্ট হয়ে যায় এবং ভক্ষণযোগ্য থাকে না। আহমেদ ২০১৮ সালের এক হিসেবে দেখান, মোট উৎপাদিত খাদ্যের ৫.৫ শতাংশ অপচয় হয়ে যায়, যার মধ্যে ৩ শতাংশ অপচয় হয় প্রক্রিয়াজাতকরণকালীন সময়ে, ১.৪ শতাংশ নষ্ট হয় বিতরণের সময় এবং অবশিষ্ট ১.১ শতাংশ অপচয় হয় খাবারের বাসন থেকে।

শহর এলাকায় উৎপাদিত কঠিন ও অপচনশীল বর্জ্যের মূল অংশ আসে পরিবার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা-ঘাট এবং স্বাস্থ্যসেবা খাত থেকে। ২০০৫ সালের হিসেব মতে, বাংলাদেশের সকল নগর কেন্দ্রিক উৎপাদিত অপচনশীল বর্জ্যের পরিমাণ দিনে ১৩,৩৩২ টন, যার মধ্যে কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রামেই উৎপাদিত হয় মোট বর্জ্যের যথাক্রমে ৩৪.৮ শতাংশ এবং ১১.৬ শতাংশ।

বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয় মূলত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে। সামাজিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এ বিষয়ে এখনো কার্যকর কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ে না। মোট বর্জ্যের মাত্র সামান্য একটি অংশ জৈব সারে পরিণত করে ব্যবহারযোগ্য করা হয়। ২০০৫ সালে নগর অঞ্চলে বর্জ্য থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস হিসেবে নিঃসরিত কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২.১৯ মিলিয়ন।

# ১৩

# জলবায়ু কার্যক্রম

## জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

## ১৩.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

২০১৬ সাল পর্যন্ত গ্রহসম্বন্ধীয় উষ্ণতা অব্যাহত বৃদ্ধি পেয়ে প্রাক-শিল্প সময়ের প্রায় ১.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস উপরে উঠে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।একই সালে বৈশ্বিক স্তরে সাগর-বরফ হ্রাস পায় ৪.১৪ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার যা সম্ভবত এ যাবৎকালের লিপিবদ্ধ থাকা দ্বিতীয় সর্বনিম্ন পরিমান। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব উপশমনে প্রয়োজন হবে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্যারিস চুক্তিতে প্রাপ্ত উদ্যোমকে সুসংসহত করা। তাছাড়া, জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দমনে সহনশীলতা তৈরিকল্পে শক্তিশালী প্রচেষ্ঠারও প্রয়োজন রয়েছে (ইউএন, ২০১৭)।

এক হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, ভূমিকম্প, সুনামি, উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড় এবং বন্যায় সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক গড়পড়তা শতশত বিলিয়ন ডলার। কেবলমাত্র দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দরকার হবে বার্ষিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অভীষ্ট অর্জনে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে যে, জলবায়ু সম্পর্কিত দুর্যোগ উপশমে সাহায্য ২০২০ নাগাদ প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার করতে পারলে জলবায়ু সম্পর্কিত দুর্যোগ উপশমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করা যাবে (ইউএনডিপি, ২০১৮)।

তবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংঘটিত মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিকভাবে নথিভূক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ১৯৯০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ১.৬ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। অনেক দেশ ইতোমধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে।২০১৪-১৫ সালে তথ্য প্রদানকারী অধিকাংশ দেশ জানিয়েছে যে, পরিবেশ প্রভাব পর্যালোচনা, সংরক্ষিত এলাকা নিয়ে আইন, জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং সমন্বিত পরিকল্পনা মূল ঝুঁকি উপাদান উপশমে বড় ভূমিকা রেখেছে (ইউএন ২০১৭)।

## ১৩.২ অগ্রগতি পর্যালোচনা

### *সূচক ১৩.১.১ প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত ও নিখোঁজসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা*

বাংলাদেশ পরিবেশগত বিভিন্ন বিপদের মুখোমুখী যেমন, নদীভাংগন, সাইক্লোন, খরা, টর্নেডো, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি। আবার জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমানে থাকা জলবায়ুজনিত ঘটনাগুলোর পুনঃপুনঃ সংঘটন ও প্রবলতা ব্যাপক বৃদ্ধি করতে পারে। বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, যেমন: চরম তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত তীব্রতর বন্যা, খরা এবং বঙ্গোপসাগরে বিরাজমান উত্তাল আবহাওয়া (জিইডি ২০১৫)। অন্যান্য দুর্যোগ ছাড়াও বাংলাদেশেকে আঘাত করার মতো প্রধান দুর্যোগগুলোর মধ্যে থাকে বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো এবং ভূমিকম্প। ১৩.২ চিত্রে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বহুমুখী ঝুঁকি প্রবণতা দেখানো হয়েছে।

**চিত্র ১৩.১: বাংলাদেশ বহুমুখী-ঝুঁকি মানচিত্র**

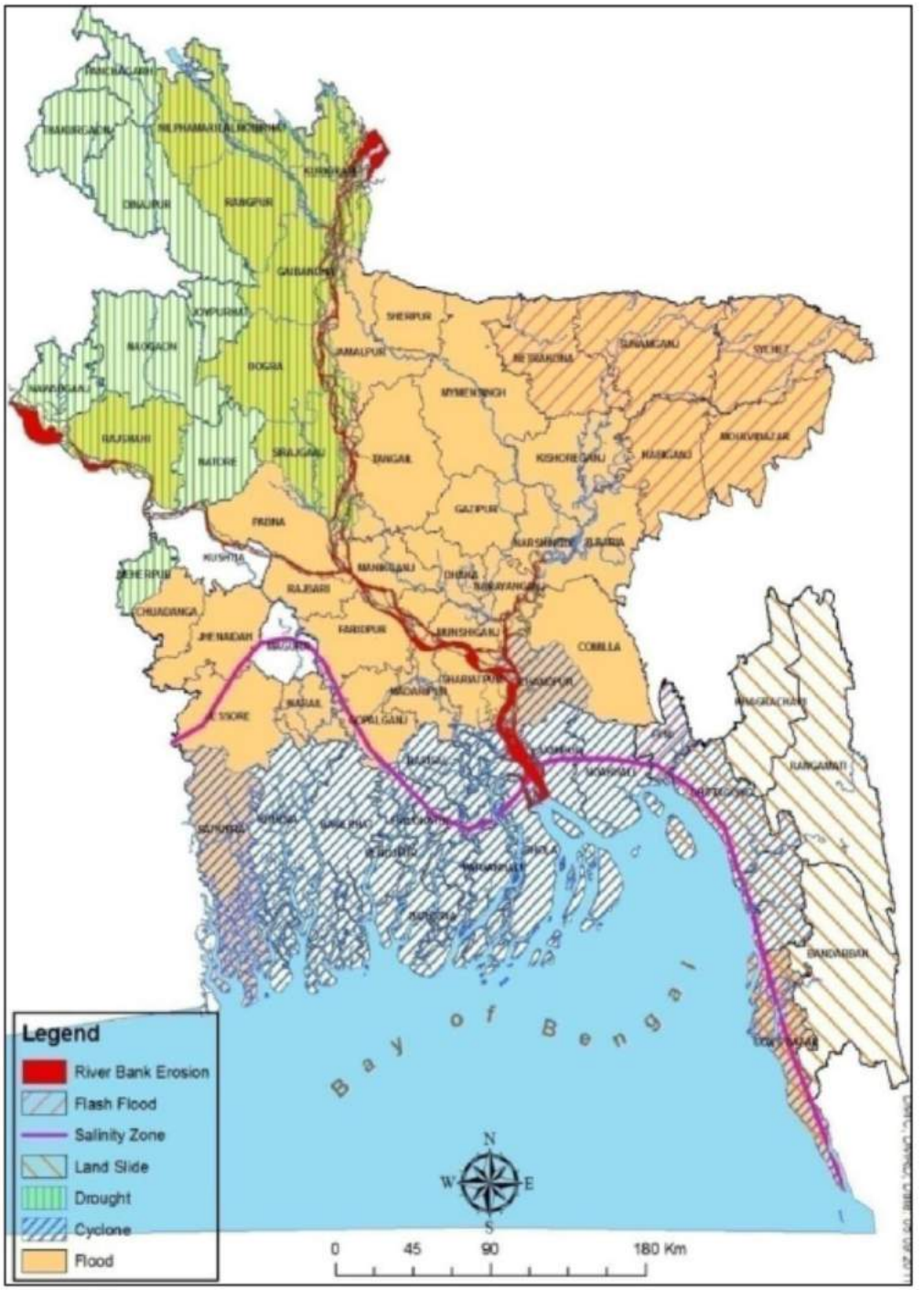


*উৎস: জিইডি ২০১৫।*

সময়ের বিবর্তনে দেশটি দুর্যোগে সাড়া দেবার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে যার ফলে দুর্যোগকালীন মৃতের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। চিত্র ১৩.২ দেখাচ্ছে কীভাবে সম্প্রতি সাইক্লোনের কারণে মৃতের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। যাই হোক, তারপরও স্বীকার করতেই হবে যে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন ত্বরান্বিত হবার ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকায় ঝুঁকি ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

সারণী ১৩.২: ঘূর্ণিঝড়ের সময় মৃতের সংখ্যা

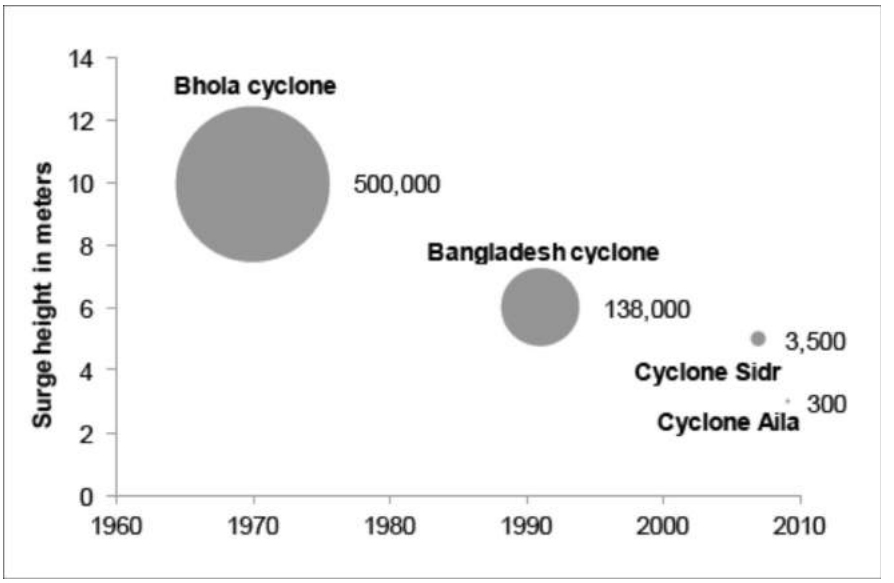


*উৎস: আইসিএআই, ২০১১*

চিত্র ১৩.৩ দেখাচ্ছে দুর্যোগের প্রকৃতি অনুযায়ী দুর্যোগে আক্রান্ত খানার বিন্যাস। দেখা যাচ্ছে যে বন্যা ও সাইক্লোন সবচেয়ে নিয়মিত দুর্যোগ যার ফলে আক্রান্ত হয় যথাক্রমে ২৪.৪৪% ও ১৫.১% খানা।

সারণী ১৩.৩: দূযোগের প্রকৃতি অনুযায়ী আক্রান্ত খানা (%), ২০০৯ থেকে ২০১৪

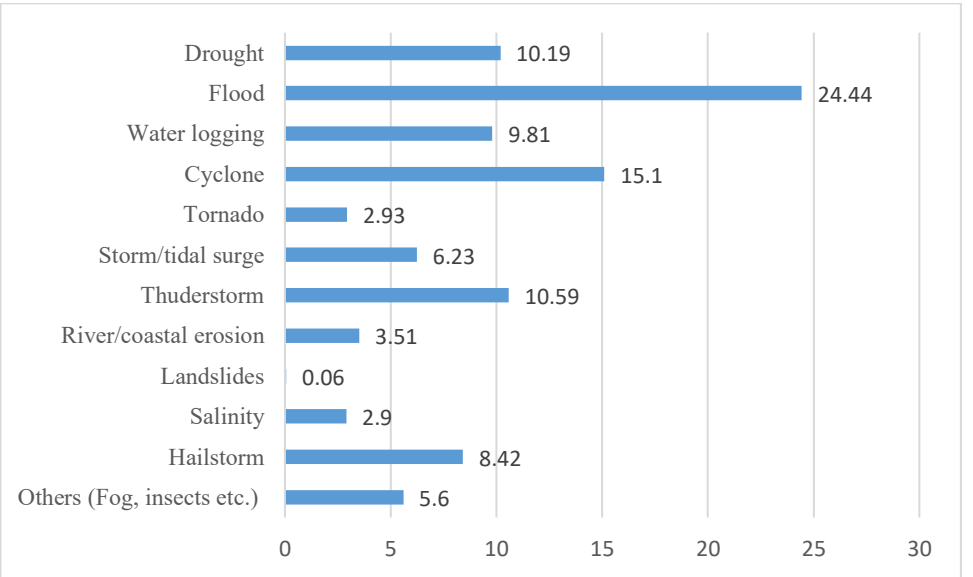


*উৎস: বিবিএস, ২০১৫*

২০০৯-২০১৪ সময়কালে বিভাগ ও দুর্যোগের শ্রেণি অনুযায়ী আক্রান্ত খানাগুলোরআনুপাতিক বিন্যাস লক্ষণীয় (সারণি ১৩.৩)। উদাহরণস্বরূপ, সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি খানা আক্রান্ত হয় বন্যায় (৭০%); বরিশালে বেশিরভাগ আক্রান্ত সাইক্লোনে (৭৪%) এবং খুলনা বিভাগে জলবদ্ধতায় (৩৪.৪৪%) এবং লবণাক্ততায় (২২.২৪%)।

**সারণি ১৩.১: দূর্যোগের প্রকৃতি ও বিভাগ অনুযায়ী আক্রান্ত খানা (%), ২০০৯ থেকে ২০১৪**

| বিভাগ | দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার (%) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | খরা | বন্যা | জলাবদ্ধতা | ঘূর্ণিঝড় | টর্নেডো | ঝড়/জলোচ্ছাস | বজ্রপাত | নদী/উপকূলীয় ক্ষয়সাধন | ভূমিধস | লবণাক্ততা | শিলা বৃষ্টি | অন্যান্য (কুয়াশা, পোকা-মাকড় ইত্যাদি) |
| বাংলাদেশ | ১৪.৮০ | ৩৪.৪৮ | ১৩.৮৮ | ২১.৩১ | ৪.১৪ | ৮.৬৫ | ১৪.৯৪ | ৪.৯৫ | ০.০৮ | ৪.০৯ | ১১.৮৮ | ৭.৯০ |
| বরিশাল | ১.৪১ | ৫.২৪ | ৩.৯১ | ৭৮.৩১ | ০.৯১ | ৩১.৫১ | ৩.৭২ | ৪.৩৫ | ০.০০ | ০.৮৫ | ০.৩১ | ০.০৫ |
| চট্টগ্রাম | ১০.৬১ | ৩২.০৩ | ৩৪.৩৯ | ৩০.৯৬ | ১.৮০ | ১৩.৫১ | ৮.৩৯ | ৭.০১ | ০.৮০ | ৫.৩০ | ৯.৪৬ | ১২.৮৬ |
| ঢাকা | ১৯.৮৯ | ৫১.৮৯ | ১৮.৬৮ | ০.০০ | ৩.৮৮ | ০.০০ | ১৭.৬৯ | ৬.৪২ | ০.০০ | ০.০০ | ২০.৮৬ | ৯.২৭ |
| খুলনা | ৯.৩০ | ৭.৬৮ | ৩৪.৮৮ | ২৩.২৩ | ২.৬২ | ৯.১৬ | ৭.৩৯ | ৪.১৫ | ০.০০ | ২২.২৪ | ১০.৩১ | ৭.৩২ |
| রাজশাহী | ২৫.৩৯ | ৪৮.৪৭ | ০.৬৫ | ০.০০ | ৭.৫১ | ০.০০ | ২০.৪০ | ৩.৩৯ | ০.০০ | ০.০০ | ১২.৮৬ | ১৪.৭৩ |
| রংপুর | ২৩.৯৯ | ৪১.৭৪ | ০.৬৮ | ০.০০ | ১২.৩০ | ০.০০ | ২৩.৫৩ | ৬.৮৭ | ০.০০ | ০.০০ | ১৬.৬২ | ৮.৩৪ |
| সিলেট | ১৬.৫১ | ৬৯.৯৭ | ২.৫৭ | ০.০০ | ১.৩০ | ০.০০ | ৩১.৮৪ | ১.৯৫ | ০.০২ | ০.০০ | ১২.৫৪ | ৫.৪২ |

*উৎস: বিবিএস, ২০১৫*

### *সূচক ১৩.১.২ সেন্ডেই দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কাঠামো অনুসরণ করে জাতীয় দুর্যোগ প্রশাসন কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়ন করেছে এমন দেশের সংখ্যা।*

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর) ২০১৬-২০২০ সময়কালের জন্য সেন্ডেই দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রশমন কৌশল (২০১৫-২০৩০) ও দৃঢ়ভাবে অনুমোদিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রটোকল মেনে একটা দুর্যোগ ঝুঁকি উপশমন কৌশল প্রস্তুত করেছে।

### *সূচক ১৩.২.১ একটি সমন্বিত নীতি/কৌশল/পরিকল্পনা প্রণীত বা প্রযুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিসহ গ্রিনগ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয় (যেমন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান, জাতীয় যোগাযোগ, দ্বিবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা অন্যান্য।*

নিম্নে জাতীয় পরিকল্পনা ও ফ্রেমওয়ার্কে গৃহীত জলবায়ুজনিত প্রধান বিষয়গুলোর একঝলক দেখা যেতে পারে।

Bangladesh Climate change Strategy and Action Plan (বিসিসিএসপি) হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রধান জাতীয় পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশে জলবায়ু জনিত বিনিয়োগের ভিত্তি। বিসিসিএসপি কর্ম-পদক্ষেপ নেবার জন্য একটা সার্বিক নির্মাণ কাঠামো (সারণি ১৩.৩) দিয়ে সাহায্য করে এবং এটা করতে গিয়ে বিবেচনায় থাকে উন্নয়ন অর্জনের পথে বাংলাদেশ সরকারের নিম্ন কার্বন-পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা ও অভিযোজন।বিসিসিএসপি হলো এমন একটা কৌশল যা পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লক্ষ্য একই রেখায় আনার একটা সূত্র হিসাবে কাজ করে।মোট ৪৪টি কর্মসূচি এবং ১৪৫ টি পদক্ষেপসহ ৬টি বিষয়বস্তুগত জায়গাচিহ্নিত করা হয়েছে। বিষয়বস্তুগত দিকগুলো হলো: (১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য; (২) বিস্তৃত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা; (৩) অবকাঠামো; (৪) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা; (৫) উপশমন এবং নিম্ন কার্বন নিঃস্বরণ এবং (৬) স্বক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি।

নরওয়ের সরকারের সহায়তা নিয়ে ২০১৫ সালে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার (এনএপি) একটা রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। এনএপি প্রক্রিয়া সম্পন্নকল্পে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা তৈরি করা হয় তার মধ্যে আছে আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি, একটি কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি সহ এনএপি সূত্রবদ্ধকরণের নিমিত্ত একটা প্রধান দল গঠন করা।

| জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রধান ক্ষেত্র | |
|---|---|
| ১. | খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা (পানিসহ) |
| ২. | বিস্তৃত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
| ৩. | লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ সহ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা। |
| ৪. | বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাংগন রক্ষা |
| ৫. | জলবায়ু অভিঘাতসহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ |
| ৬. | গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন বৃদ্ধি |
| ৭. | নগর অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধিকরণ |
| ৮. | ইকোসিসটেম-ভিত্তিক অভিযোজন (বনায়নসহ ব্যবস্থাপনা) |
| ৯. | কম্যুনিটি বা জনপদ-ভিত্তিক আদ্রভূমি ও উপকূলীয় জায়গা সংরক্ষণ |
| ১০. | নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ |

### জলবায়ুর পরিবর্তন এবং জেন্ডারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (সিসিজিএপি):

Climate Change and Gender Action Plan (সিসিজিএপি ২০১৩) এর অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে জেন্ডার-ভিত্তিক হস্তক্ষেপগুলোর রূপান্তরযোগ্য প্রকৃতি। এর অন্য এক সম্ভাবনা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাড়া দেবার কার্যকারীতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সিসিজিএপি তৈরি করতে গিয়ে একটা অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দেশের ভেতর সভা এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় এবং এগুলোতে অংশ নেয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সরকারি বিভাগের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিবেদন, প্রকাশনা, ওয়েবসাইট, সমীক্ষা এবং মুখোমুখি সাক্ষাৎকার এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ সরকার Climate Change Trust Act 2010 প্রণয়ন ও আইনে পরিণত করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব হ্রাসকরা। বাংলাদেশেই একমাত্র প্রথম দেশ যে Bangladesh Climate Change Trust Fund নামে একটা ট্রাস্ট ফান্ড সৃষ্টি করে যারলক্ষ্য বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে গিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে বিনিয়োগগুলোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে সম্পদের সংস্থান করা। অপরদিকে, Bangladesh Climate Change Resilience Fund (বিসিসিআরএফ) প্রধানত দাতাদের দ্বারা সৃষ্ট একট তহবিল যার মূল উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং প্রধানত অভিযোজনে সাহায্য করা, তবে তার সাথে উপশমনও যুক্ত আছে।

Intended Nationally Determined Contributions (আইএনডিসি): আইএনডিসি'র (বর্তমানে এনডিসি) মূল কাজ অভিযোজন ও উপশমন কৌশল সাজিয়ে জলবায়ু অভিঘাতসহনীয় করে তোলা। বাংলাদেশের উপশমন কৌশল বিদ্যুৎ, পরিবহন ও শিল্পখাত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'যেমন আছে তেমন' অবস্থায় ২০৩০ নাগাদ এই খাতগুলো থেকে নির্গত জিএচজি (এঐএ) মোট নির্গতকরণের ৬৯% হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ উৎস ব্যবহার করে ২০৩০ নাগাদ এই খাত থেকে জিএইচজি নির্গতকরণমাত্রা ৫% হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যদি উন্নত দেশ থেকে যথাযথ পরিমাণে ও সময়ে সহযোগীতা পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে নির্গতকরণ কমাতে হবে ১৫%।

***সূচক ১৩.খ.১ নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অগ্রাধিকারসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্বক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপদ্ধতি এবং অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বিনির্মাণসহ সহায়তার পরিমাণ ও বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ বা রাষ্ট্রের সংখ্যা।***

এই বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত দুটো প্রকল্পের জন্য Green Climate Fund (জিসিএফ) থেকে অর্থায়ন পেয়েছে:

বাংলাদেশে বৈশ্বিক পরিচ্ছন্ন রান্না কর্মসূচি: উন্নত চুলা অভিযোজনে টেকসই বাজার সৃষ্টিতে প্রতিকূলতা দূরীকরণঃ (Global Clean Cooking Programme Bangladesh: Removing barriers in the development of a sustainable market for the adoption of improved cook stoves in Bangladesh)

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৬ শতাংশ পল্লী অঞ্চলে বাস করে যেখানে রান্না-বান্না করা হয়ে থাকে প্রধানত প্রথাগত জ্বালানী (যেমন: কাঠ) ব্যবহার করে। রান্নার জন্য কাঠ পোড়ালে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথাইল ও ব্ল্যাক কার্বন নির্মুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রভাব হিসাবে বনায়ন ব্যহত হয় (Deforestation) ও স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এসব কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রাণহানিসহ প্রায় ৫৬,০০০ দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে দেশের মাত্র ৩-৫শতাংশ খানা উন্নত চুলা ব্যবহার করে

উন্নত চুলায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা শুধু পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য নয়; এতে করে বিদ্যমান সরবরাহ শৃঙ্খল যেমন বিস্তৃত হবে তেমনি বৃদ্ধি পাবে চাহিদাও। স্বভাবতই অংশীদার সংগঠন ও স্থানীয় উদ্যোগীদের জন্য উন্নত চুলা উৎপাদন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং চুলাকেন্দ্রিক গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্র এই প্রকল্পে প্রভূত সাহায্য করবে।

এই প্রকল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৮২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে জিসিএফ থেকে মঞ্জুরি হিসাবে আসবে ২০ মিলিয়ন ডলার। প্রকল্পের আয়ুস্কাল সাড়ে তিন বছর। ধরে নেয়া হয় যে প্রাথমিক উপকারপ্রাপ্তদের সংখ্যা হবে ১৭.৬ মিলিয়ন এবং যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) অপসারিত হবে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ২.৯ মিলিয়ন টন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকছে adoptive capacities of Coastal communities, especially women, to cope with the impacts of climate induced Salinities)

উপকূলীয় এলাকার জনগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ যেমন সাইক্লোন, উত্তাল সমুদ্র এবং সমুদ্র স্তর। ইদানিং এগুলো আরও প্রবলতর হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় এবং এই সমস্ত দুর্ঘটনার সূত্রে উপকূলীয় মিঠাপানিতে প্রচুর পরিমাণে এবং দ্রুততার সাথে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা গেলেপ্রত্যাশা করা যায় যে, মিঠাপানির উপর নির্ভরশীল কৃষি জীবনজীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস পাবে এবং একই সাথে উপকূলীয় জনপদে যারা ঝুঁকিতে আছেন তাদের ক্ষেত্রে দুর্লভ সুপেয় পানির প্রাপ্তি ঘটবে। জলবায়ু সহনশীল পানি সরবরাহ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কম্যুনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রায় আছে খুব অরক্ষিতজনগোষ্ঠী বিশেষত নারী ও শিশু।

এই প্রকল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে জিসিএফ মঞ্জুরির পরিমাণ ২৪ মিলিয়ন ডলার। ছ'বছরেরবিস্তৃত এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প শেষে সুবিধাভোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৭১৯,২০০ এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

## ১৩.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ

বিগত বছরগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোতে বাংলাদেশ বিপুল পরিমানে বিনিয়োগ করেছে যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়স্থল স্থাপন, সাইক্লোন আশ্রয় গড়ে তোলা ইত্যাদি। এর ফলে ইদানিং মৃত্যুর হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। যাই হোক, এই সমস্তকাঠামোরঅনেকগুলো সঠিকভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না বিধায় দুর্যোগ আঘাত হানার সময় পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, বড় অংকের অর্থের অভাবে দুর্যোগের পরপর এসমস্ত অবকাঠামোর পুর্নবাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বিশেষ উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে সংঘটিত যথাক্রমে সিডর ও আইলার পর উপকূলীয় পোল্ডার পুর্নবাসনে দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপরটি যখন পোল্ডারের ভেতর দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতার কারণে জনগণের দুর্ভোগ চরমে উঠেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ ধরনের সংকট আরও ঘনীভুত ও তীব্রতর হবে যখন জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগ আঘাত হানতে থাকবে।

## ১৩.৪ ভবিষ্যত করণীয়

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষরদাতা। এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ শিল্পোন্নত দেশ থেকে অভিযোজন সম্পর্কিত অর্থায়ন প্রত্যাশা করতে পারে। নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, এই দেশে দুর্যোগ অভিঘাত সহনশীল ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে হলে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থায়নের প্রয়োজন পড়বে। আর সেক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে শিল্পোন্নত দেশ থেকে। অবশ্য কিছু অর্থায়ন ঘটেছে ইদানিং স্থাপিত এৎববহ ঈষরসধঃব ঋঁহফসূত্রে তবে এই ধরনের খুব প্রতিযোগতামূলক অর্থ পেতে হলে বাংলাদেশেকেও তার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে আর জলবায়ু সংক্রান্ত নীতিগুলোকে মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে।

## ১৩.৫ সারাংশ

সূচক ১৩.১.১ অনুযায়ী যদি দেখা হয়, তবে প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ মানুষসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এখন ১২,৮৮১। এই লক্ষ্যমাত্রা ২০২০ ও ২০৩০ সালের জন্য যথাক্রমে ৬,৫০০ ও ১৫০০। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এযাবৎকালের গতিপথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তেমন কঠিন কিছু নয়। সম্ভবত এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল (২০১৬-২০২০) যা উপকারী সেন্ডাই নির্মাণ কাঠামো ধরে তৈরি করা হয়েছে।

মোট কথা, জলবায়ুজনিত সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন বেশ ভালভাবে প্রস্তুত আছে বলে মনে হয় এবং জলবায়ুজনিত বেশ কিছু কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতি প্রশংসার দাবী করতে পারে। গেল ৮ বছরে বিসিসিটিএফ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। এরি মধ্যে বিসিসিএসএপি সংশোধন ও এনএপির প্রস্তুতিপর্ব বিবেচনাধীন আছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অর্থায়নও আসছে এবং আসবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস যেমন, ২০১৮ সালে বাংলাদেশের জিসিএফ তহবিল থেকে দুটো প্রকল্পের জন্য মঞ্জুরি পেয়েছে।

# ১৪

## জলজ জীবন

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

## ১৪.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ জুড়ে রয়েছে মহাসাগর যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম)। ক্রমবর্ধিষ্ণু জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব (মহাসাগরের অম্লত্বসহ), অতিরিক্ত মৎস শিকার এবং সামুদ্রিক দূষণের কারণে বৈশ্বিক মহাসাগরের সংরক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। জাতিসংঘের ২০১৭ সালের এসডিজি রিপোর্ট (ইউএন, ২০১৭) অনুসারে, সংরক্ষিত এলাকায় প্রধান জীববিচিত্র (কেবিএস) জায়গার বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০০ সালের ৩২ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ৪৫ শতাংশ। অপরদিকে, বিশ্বব্যাপী মাছের মজুদ দ্রুত নিঃশেষ হয়েছে- অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের আলোকে টেকসই নয় এমন জায়গার অনুপাত ১৯৭৪ সালের ১০ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ৩১ শতাংশে পৌঁছেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ এর লক্ষ্য হলো সামুদ্রিক জলরাশির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় এলাকার ইকোসিস্টেমের দূষণরোধ এবং সেইসাথে সামুদ্রিক অম্লত্বের প্রভাব সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ বৃদ্ধি ও মহাসাগর-নির্ভর সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে মহাসাগর সম্পর্কিত সমস্যা কিছুট হলেও মোকাবেলা সম্ভব।

## ১৪.২ অগ্রগতি পর্যালোচনা

*বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ:*

দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিমে থাকা সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ৭১০ কি.মি উপকূল রেখা। উঁচু বহুমুখীতা এবং সহনীয় শৈবাল এবং সহনীয় ও ঝিনুক/শামুক নিয়ে সামুদ্রিক কচ্ছপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন এলাকা হলো সমুদ্রের পূর্ব উপকূল এবং বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল অঞ্চলও এই পূর্ব উপকূলেই অবস্থিত। পূর্ব-এশিয়া-অস্ট্রেলেশিয়ান এবং মধ্য এশিয়ান অঞ্চলের প্রায় ১০০ প্রজাতির অতিথি পাখির আবাসস্থল, বিচরণ কেন্দ্র এবং তাদের শীতকালীন অবকাশ যাপন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় উপকূল এলাকাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ১০ প্রজাতির উপকূলীয় পাখির আশ্রয়স্থল (ডিওই, ২০১৫)। পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় রয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং বিভিন্ন সরিসৃপ যেমন লোনা পানির কুমিরের আশ্রয়স্থল।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের প্রায় পুরোটাই হয়ে থাকে উপকূলবর্তী অগভীর জলাঞ্চলে। উপযুক্ত মৎস্য আহরণ প্রযুক্তি এবং পর্যাপ্ত আধুনিক মৎস্য জলযানের অভাবে এই এলাকার বাইরে মৎস্য আহরণ সম্ভব হয় না। ২০০০-২০০১ সালে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ ছিল ৩৭৯,৪৯৭ টন, যা ২০১৪-১৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬২৬,০০০ টন। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৬ শতাংশ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ থেকে। একক মাছ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে ইলিশ, যার মূল্যও সবচেয়ে বেশি। এদেশে বার্ষিক ইলিশ আহরণের পরিমাণ প্রায় ৩৯৫,০০০ টন।

বাংলাদেশ এখনও তার গভীর সমুদ্র অঞ্চলে থাকা তেল ও গ্যাস সম্পদের প্রকৃত সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে পারে নি। ঐসব জায়গায় গ্যাস খনন খুব একটা সফল হয়নি। সামুদ্র এলাকায় তেল ও গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে এখন পর্যন্ত মায়ানমারের নিকটবর্তী অগভীর সমুদ্রাঞ্চলকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ এরইমধ্যে মায়ানমারের আরাকান উপকূলীয় এলাকায় অনেকগুলো বড়বড় গ্যাস ক্ষেত্র (শিও, ফু, মিয়া) আবিষ্কৃত হয়েছে (এফএও, ২০১৪)। বাংলাদেশ অংশেও রয়েছে এর সম্ভাবনা।

### *সূচক ১৪.৫.১ সামুদ্রিক অঞ্চলের মধ্যে সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি*

দেশের প্রথম সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা হিসেবে সরকার ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে "The Swatch of No Ground Marine Protected Area" প্রতিষ্ঠা করে, যা তিমি, ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, হাঙর এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আওতায় বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো গ্রাউণ্ড এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর আওতায় বঙ্গোপসাগরের 'Middle ground and South Patches' দেশের প্রধান দু'টি সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার বিস্তৃত জলসীমার পরিমাণ ২৪৩,৬০০ হেক্টর (২৪৩৬ বর্গ কি:মি:), এবং সেটা দেশের মোট সামুদ্রিক জলসীমার প্রায় ২.০৫ ভাগ। বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক জলসীমা হলো ১১,৮৮১,৩০০ হেক্টর (১১৮,৮১৩ বর্গ কি:মি:)। ইলিশের ডিম ছাড়ার মৌসুমে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে নিলে মোট সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি বেড়ে দাঁড়ায় জলসীমার ৭.৯৪ ভাগ।

## ১৪.৩ সরকারের প্রচেষ্টা

*ইলিশ সংরক্ষণ*

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। ইলিশ সংরক্ষণ এবং ইলিশ উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান হার ঠেকাতে সরকার "মৎস্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ১৯৫০" এর আওতায় উপকূলীয় লোনা ও মিঠাপানির এলাকায় ইলিশের জন্য পাঁচটি অভয়ারণ্য এবং চারটি ডিম নিঃসরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। জাটকা নিধন রোধ এবং মা ইলিশ সংরক্ষণ ও পরিচর্যাও এই আইনের আওতাভুক্ত। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর অধ্যায় ৫৫ (উপ-অধ্যায় ২, ঘ) এর মাধ্যমে সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ইলিশের প্রজনন ও ডিম ছাড়ার মৌসুমে অবাধ চলাচল ও নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে মোট ২২ দিন (১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০১৬) সব ধরনের মাছ ধরা এবং মাছ ধরার বাণিজ্যিক ট্রলার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ২০১৫ সালে এই নিষেজ্ঞাকালীন সময় ছিল ১৫ দিন (২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর, ২০১৫)।

ইলিশের প্রজনন ও সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিগত কয়েক বছরে ইলিশ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে। নিম্নের চিত্রে যার প্রতিফলন দেখা যায়ঃ

**চিত্র ১৪.১ সময়ের বিবর্তনে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি**

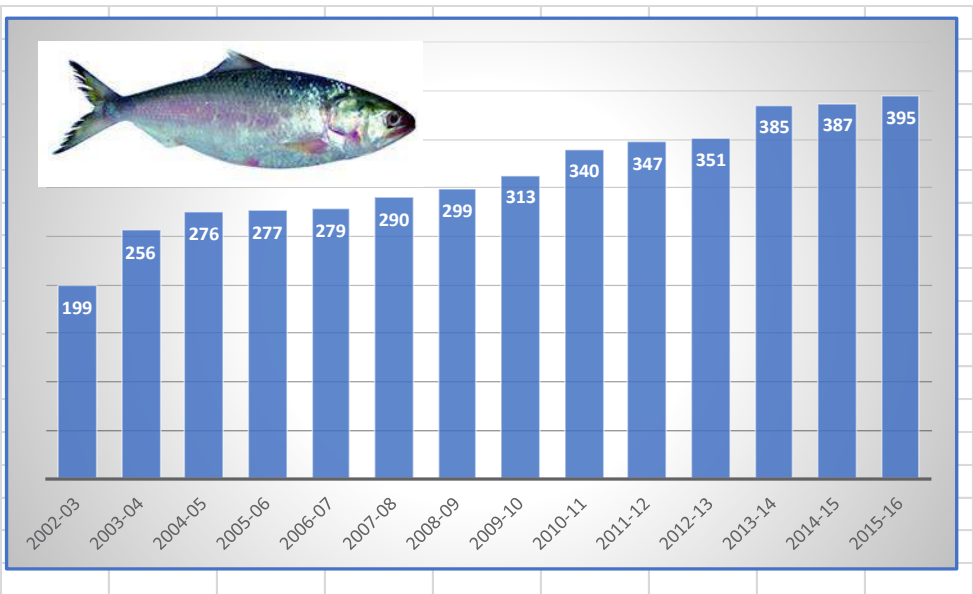


*উৎস: মৎস বিভাগের বাৎষরিক বই*

## ১৪.৪ চ্যালেঞ্জসমূহ

সাধারণত তেল কোম্পানী এবং নিলামকারীরাসহজসাধ্য ও স্বল্প ব্যয়ের কারণে সমুদ্র উপকূলীয় অগভীর অঞ্চলে খনন করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু এই সকল এলাকায় খনন কাজের ফলে সামগ্রিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং মৎস্য সম্পদের ওপর বিরাট বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও, এই সকল খনন কাজের সময় সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া তেল মৎস্যসম্পদ, মৎস্যক্ষেত্র, মৎস্য প্রজনন ও পরিচর্যা, লবণাক্ত জলাভূমির ইকোসিস্টেম, প্রবাল, ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম, উপকূলীয় পর্যটন, লবণ শিল্প, জনজীবন ও স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে এবং জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে প্রাপ্ত সুবিধা কমিয়ে দিতে পারে (এফএও, ২০১৪)।

উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে চট্টগ্রামের উত্তর-উপকূলীয় অঞ্চলে জাহাজ ভাঙা ও মেরামত শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সমুদ্র উপকূলীয় পরিবেশের ওপর যার বিরাট প্রভাব রয়েছে। এই শিল্পের কারণে শিল্পাঞ্চল ও এর আশপাশের এলাকার মৎস্য সম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং সবচেয়ে ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটছে জাহাজ ভাঙার সময়ে সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলে (ফুড চেইন) নিঃসরিত দূষণের ফলে।

চক্রবর্তী এবং হোসাইন (২০১৬) এর বক্তব্য অনুযায়ী, উপকূলীয় এলাকায় অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, অধিক পরিমাণে বাচ্চা মাছ নিধন, বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ, পলি জমা, কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও দূষণ ইত্যাদির কারণে উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য দ্রুত কমে আসছে এবং পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনছে। মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ ও ক্রমবর্ধমান মৎস্য চাহিদা ও আহরণ প্রতিবছরই বাড়ছে। একদিকে নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও অন্যান্য অবৈধ প্রক্রিয়ায় মৎস্য আহরণের কারণে সব ধরণের মাছ ও চিংড়ি মারাত্মক নিধনের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে চিংড়ি ও নরম খোলবিশিষ্ট সামুদ্রিক কাঁকড়ার অতিরিক্ত চাহিদার কারণে এদের বিভিন্ন প্রজাতি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই নিধন হচ্ছে। নগরের পয়ঃনিষ্কাশন, শিল্পবর্জ্য,তৈলবর্জ্য এবং জাহাজ ভাঙা কার্যক্রমের কারণে যেমন রাসায়নিক দূষণ ঘটছে, তেমনি বাড়ছে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা।

## ১৪.৫ ভবিষ্যত করণীয়

উপকূলীয় অঞ্চল এবং এর পাশ্ববর্তী অঞ্চলের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং শিল্প কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। টেকসই মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য আহরণও টেকসই পরিমাণে বজায় রাখতে হবে। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্তে সরকার ইতোমধ্যে মৎস্য প্রজনন মৌসুমে বঙ্গোপসাগরে ২ মাস মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে এবং প্রায় তিন দশক পরে উপকূলীয় এলাকায় মাছের প্রাচুর্যতা পর্যবেক্ষণের জন্য এ বছর (২০১৮) মৎস্য জনসংখ্যা পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে, ২০১৯ সালের মধ্যে যা শেষ হবে বলে আশা করা যায়। একই সাথে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা বা কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

## ১৪.৬ সারাংশ

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ একটি বিরাট সমুদ্র এলাকা অর্জন করেছে। এই বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চল প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তবে সমুদ্র তলদেশ থেকে অদক্ষ গ্যাস উত্তোলন সমুদ্রকেন্দ্রিক জীব-সম্পদের ওপর বিরাট খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে এ ধরণের সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক সময়ে দু'টি সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, যার একটি হলো ইলিশের নিরাপদ প্রজনন কেন্দ্র এবং অন্যটি তিমির অভয়ারণ্য। মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ বর্তমানে মোট সামুদ্রিক এলাকার প্রায় ২.০৫ ভাগ। ইলিশের জন্য সংরক্ষিত এলাকা যোগ করলে যা দাঁড়াবে ৭.৯৪ ভাগে (লক্ষ্য ১৪.৫)। সবচেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে ইলিশ সংরক্ষণ ও উৎপাদনে; বিগত ১৫ বছরে যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

# ১৫

# স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

## ১৫.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

সুরক্ষিত ও পুনঃস্থাপিত ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে সহায়তা করে। একইসাথে, এরা বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধি করে। একটি বাঞ্চনীয়বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) তাদের উপর নির্ভরশীল সমাজে বসবাসকারী মানুষের জন্য বিভিন্নমুখী সুবিধার সৃষ্টি করে। অভীষ্ট- ১৫ বাস্তুসংস্থান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলজ প্রজাতির টেকসই ব্যবহার ও সুরক্ষার ওপর আলোকপাত করে। জাতিসংঘের এসডিজি রিপোর্ট ২০১৮ (ইউএন, ২০১৮) অনুযায়ী, পৃথিবীর মোট বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে আসছে। ২০০০ সালে মোট বনভূমির পরিমাণ ছিল ৪.১ বিলিয়ন হেক্টর (মোট ভূমির প্রায় ৩১.২ ভাগ) এবং ২০১৫ সালে প্রায় ৪ বিলিয়ন হেক্টরে (মোট ভূমির প্রায় ৩০.৭)। অবশ্য ২০০০-২০০৫ সময়ের মধ্যে বনভূমি উজারের হার প্রায় ২৫ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে বিভিন্ন হুমকিতে থাকা বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীদের "বৈশ্বিক লাল তালিকা সূচক" (গ্লোবাল রেড লিস্ট ইনডেক্স) ০.৮২ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৭৪ এ। এই তথ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, উভচর প্রাণী, কোরাল এবং সাইক্যাডের সংখ্যা হ্রাসের ভীতিকর চিত্রই ফুটে ওঠে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৫ এর উদ্দেশ্য হলো ২০২০ সালের মধ্যে বনভূমি, জলাভূমি, শুষ্কভূমি এবং পাহাড়-পর্বতসহ স্থলজ বাস্তুসংস্থানের ব্যবহার সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বনভূমি ধ্বংস রোধ করা গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই আমাদের সাধারণ ঐতিহ্যের অংশ এই প্রাকৃতিক আবাস এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধকল্পে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

## ১৫.২ অগ্রগতি মূল্যায়ন

***স্থলজ বাস্তুতন্ত্র***

বাংলাদেশের বাস্তুতন্ত্র মূলত স্থলজ, জলজ, উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক বাস্তু নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের স্থলজ বনভূমির প্রধান ধরণগুলো হলো– (১) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের চিরহৎি বনভূমি; (২) নাতিশীতোষ্ণ আংশিক চিরসবুজ বনভূমি; (৩) নাতিশীতোষ্ণ আদ্র ক্ষণস্থায়ী বনভূমি; (৪) ম্যানগ্রোভ বন; (৫) মিঠাপানির জলার বন; (৬) বসতভিটার বনভূমি; এবং (৭) কৃত্রিম বা রোপনকৃত বনায়ন।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় অর্ধেকই জলাভূমি। এই জলাভূমির বাস্তুসংস্থান জুড়ে গড়ে উঠেছে বিস্তৃর্ণ আবাস। বিশেষ করে এর অন্তর্ভুক্ত আছে তিনটি প্রধান নদী– পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের প্রায় ৭০০ অধিক উপনদী ও শাখা নদী, বিস্তৃর্ণ প্লাবনভূমি, স্থায়ী ও ঋতুভিত্তিক প্রায় ৬৩০০ বিল (স্থায়ী ও অস্থায়ী প্লাবনভূমি), প্রায় ৪৭টি বড় বড় হাওড় (দক্ষিণাঞ্চলের গভীর প্লাবনভূমি), বাওড়, বিস্তৃর্ণ বন্যাপ্লাবিত এলাকা এবং পুকুর ও ট্যাংক।

ওরিয়েন্টেল অঞ্চলের অধীনে ইন্দো-হিমালয়ান এবং ইন্দো-চাইনিজ উপ-অঞ্চলের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ অবস্থিত। এ দেশ প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের বায়োলজিক্যাল করিডোর, ভূমি সেতু এবং বিভিন্ন জীব জীবনের বৈচিত্র্যময় আবাসভূমি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভৌগলিক কৌশলগত অবস্থান বাংলাদেশকে পরিবেশ ও বাস্তুগত দিক থেকে বিশেষ করে জৈবিক বৈচিত্র্যময় ভূমি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। বিভিন্ন অভিবাসী প্রজাতি, অগভীর স্রোতাস্বিনীর ওপর ফেলে রাখা পাথরফলক, অবকাশ কেন্দ্র এবং বন্যপ্রাণীর বিচরণ পথ ও বিরতির মাচা হিসেবেও এ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। ফলশ্রুতিতে, বিপুল পরিমাণ গাছপালা ও পশুপাখির একটি ব্যাপক আবাসস্থল এখানে তৈরি হয়েছে যেখানে জীববৈচিত্র্যের বিপুল সমাহার পরিলক্ষিত হয় (ডিওই, ২০১৫)।

### *সূচক ১৫.১.১ মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির পরিমাণ*

বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২.৫৮ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৫ ভাগ। বিস্তৃত এই অঞ্চলের প্রায় ১০.৫ ভাগ ব্যবস্থাপনা করে বন বিভাগ (সারণি ১৫.৩) এবং বাকী অংশ অবিন্যাসকৃত গ্রামীণ বনাঞ্চল।

**সারণি ১৫.১: বাংলাদেশের বন**

| বনের ধরণ | জায়গা (মাইল হেক্টর) | দেশের জায়গা ভিত্তিক (শতাংশ) |
|---|---|---|
| **বন বিভাগ কর্তৃক বন ব্যবস্থাপনা** | **১.৫৩** | **১০.৫৪%** |
| **সরকারী বন** | **০.৭৩** | **৫.০৭%** |
| **পল্লী বন** | **০.২৭** | **১.৮৮%** |
| **সর্বমোট** | **২.৫৩** | **১৭.৪৯%** |

উৎস: ডিওই, ২০১৫

বিশ্বের সবচেয়ে বড় একক প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পরিচিতি সুন্দরবন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত, যা বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট)। বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃত পতিত অঞ্চলকে বনায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সফল হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৪০,০০০ হেক্টর ভূমি ম্যানগ্রোভ বনায়নের অধীনে রয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন প্রোগ্রাম আরো অধিক পরিমানে ভূমি বনায়নের আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে।

**সারণি ১৫.২: বন বিভাগ কর্তৃক বন ব্যবস্থাপনা**

| বনের ধরণ | জায়গা (মাইল) | দেশের জায়গা ভিত্তিক (শতাংশ) |
|---|---|---|
| পার্বত্য বন | ০.৬৭ | ৪.৬৫% |
| ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট | ০.১৪ | ০.৯৭% |
| শাল বন | ০.১২ | ০.৮৩% |
| সর্বমোট | ১.৫৩ | ১০.৫৪% |

উৎস: ডিওই, ২০১৫

সূচক ১৫.১.২ বাস্থসংস্থানের ধরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত বাংলাদেশের বর্তমানে প্রায় ৪০টি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, যার চিত্র দেখানো হয়েছে (চিত্র ১৫.৩) এবং বিবরণ দেওয়া হযেছে সারণি ১৫.৪ এ। এর মধ্যে ৩৮টি সংরক্ষিত এলাকা হলো বনাঞ্চল ভিত্তিক, যার নিয়ন্ত্রণ করে বন বিভাগ। এদের মধ্যে ১৭টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম এবং একটি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা। সরকার ২০১০ সাল থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং তাদের আবাস হিসেবে মোট ২১টি অঞ্চলকে সংরক্ষিত এলাকা (৭টি জাতীয় উদ্যান, ১২টি বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম, ১টি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা এবং একটি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা) হিসেবে ঘোষণা করেছে। দেশের মোট ৩৮টি সংরক্ষিত অঞ্চলের বিস্তৃতি মোট বনভূমির প্রায় ১০.৫৫ শতাংশ, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১.৮ ভাগ।

চিত্রঃ ১৫.১ সুরক্ষিত এলাকার মানচিত্র (দুইটি সামুদ্রিক সুরক্ষিত অঞ্চল মানচিত্রে দেখানো হয়েছে)

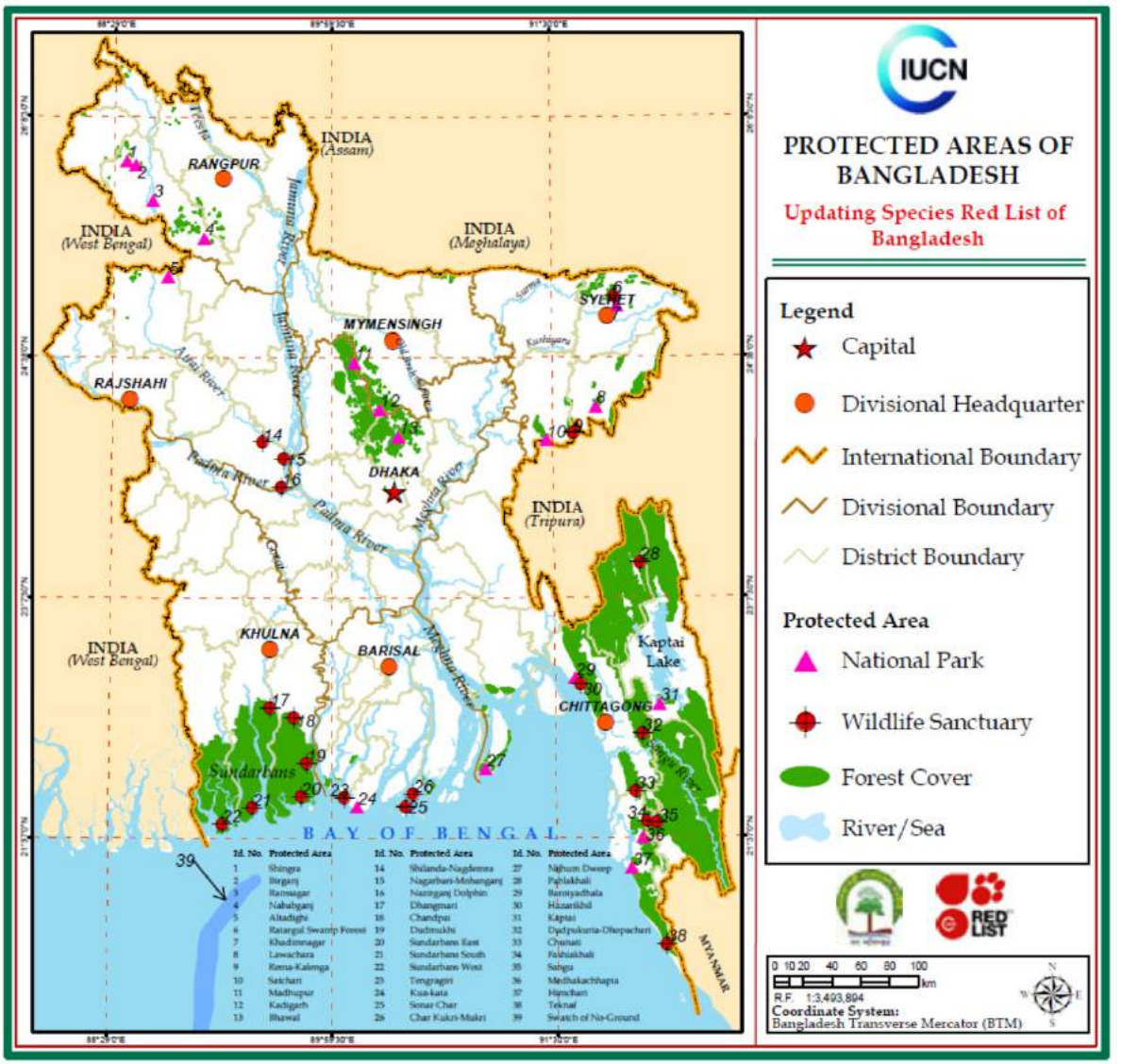


সারণি ১৫.৩: বাংলাদেশের সংরক্ষিত এলাকার বিশেষত্ব (আইইউসিএন ২০১৫)

| ক্রমিক | সংরক্ষিত এলাকা | ইকোসিস্টেম | সংরক্ষণ-অধিশ্রয়ণ | স্থান | এলাকা (হেক্টর) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান | মিশ্রিত চিরসবুজ | | কক্সবাজার | ১৭২৯.০০ |
| ২ | কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান | মিশ্রিত চিরসবুজ | | পার্বত্য চট্টগ্রাম | ৫৬৬৪.৭৮ |
| ৩ | নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান | প্লানটেড ম্যানগোভ ফরেষ্ট | হরিণ এবং পাখি | নোয়াখালী | ১৬৩৫২.২৩ |
| ৪ | মেধা কাশাপিয়া জাতীয় উদ্যান | মিশ্রিত চিরসবুজ | | কক্সবাজার | ৩৯৫.৯২ |
| ৫ | বাড়াইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান | মিশ্রিত চিরসবুজ | | চট্টগ্রাম | ২৯৩৩.৬১ |
| ৬ | কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান | প্লানটেড ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট | | পটুয়াখালী | ১৬১৩.০০ |

| ক্রমিক | সংরক্ষিত এলাকা | ইকোসিস্টেম | সংরক্ষণ-অধিশ্রয়ণ | স্থান | এলাকা (হেক্টর) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭ | ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান | শাল বন | | গাজীপুর | ৫০২২.০০ |
| ৮ | মধুপুর জাতীয় উদ্যান | শাল বন | | টাঙ্গাইল/ ময়মনসিংহ | ৮৪৩৬.০০ |
| ৯ | রামসাগর জাতীয় উদ্যান | | | দিনাজপুর | ২৭.৭৫ |
| ১০ | লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান | মিশ্রিত চিরসবুজ | | মৌলভীবাজার | ১২৫০.০০ |
| ১২ | সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান | মিশ্রিত চিরসবুজ | | হবিগঞ্জ | ২৪২.৯১ |
| ১৩ | খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান | মিশ্রিত চিরসবুজ | | সিলেট | ৬৬৮.৮০ |
| ১৪ | নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান | | | দিনাজপুর | ৫১৭.৬১ |
| ১৫ | সিংড়া জাতীয় উদ্যান | | | দিনাজপুর | ৩০৫.৬৯ |
| ১৬ | কাদিগড় জাতীয় উদ্যান | | | ময়মনসিংহ | ৩৪৪.১৩ |
| ১৬ | আলতাদিঘি জাতীয় উদ্যান | | মানুষের তৈরি পুকর | নওগাঁ | ২৬৪.১২ |
| ১৭ | বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান | | | দিনাজপুর | ১৬৮.৫৬ |
| ১৮ | রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | | হবিগঞ্জ | ১৭৯৫.৫৪ |
| ১৯ | চর-কুকড়ি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | প্লানটেড ম্যানগোভ ফরেষ্ট | | ভোলা | ৪০.০০ |
| ২০ | সুন্দরবন (পূর্ব) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন | বেঙ্গল টাইগার | বাগেরহাট | ৩১২২৬.৯৪ |
| ২১ | সুন্দরবন (পশ্চিম) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন | বেঙ্গল টাইগার | সাতক্ষীরা | ৭১৫০২.১০ |
| ২২ | সুন্দরবন (উত্তর) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন | বেঙ্গল টাইগার | খুলনা | ৩৬৯৭০.৪৫ |
| ২৩ | পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | এশিয়ান হাতি | পার্বত্য চট্টগ্রাম | ৪২০৬৯.৩৭ |
| ২৪ | চুনাতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | এশিয়ান হাতি | চট্টগ্রাম | ৭৭৬৩.৯৭ |
| ২৫ | ফাঁসিয়াখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | এশিয়ান হাতি | কক্সবাজার | ১৩০২.৪২ |
| ২৬ | দুধপুকুরীয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | হালক গিবন, হাতি | চট্টগ্রাম | ৪৭১৬.৫৭ |
| ২৭ | হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | | চট্টগ্রাম | ১১৭৭.৫৩ |
| ২৮ | সাঙ্গু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | | বান্দরবন | ২৩৩১.৯৮ |
| ২৯ | টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | মিশ্রিত চিরসবুজ | এশিয়ান হাতি এবং ল্যাপুর কাপ্টেন | কক্সবাজার | ১১৬১৪.৫৭ |
| ৩০ | তেনগাগ্রি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন | পাখি এবং হরিণ | বরগুনা | ৪০৪৮.৫৮ |
| ৩১ | সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন | পাখি এবং হরিণ | পটুয়াখালী | ২০২৬.৪৮ |
| ৩২ | চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | নদী/মেরিন | | বাগেরহাট | ৫৬০.০০ |
| ৩৩ | দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | নদী/মেরিন | | বাগেরহাট | ১৭০.০০ |
| ৩৪ | ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | নদী/মেরিন | | বাগেরহাট | ৩৪০.০০ |
| ৩৫ | নিঝিরগঞ্জ (ডলফিন) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | নদী | গঙ্গা নদী ডলফিন | পাবনা | ১৪৬.০০ |
| ৩৬ | সিলেন্দা-নাগডেমরা (ডলফিন) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | নদী | গঙ্গা নদী ডলফিন | পাবনা | ২৪.১৭ |

| ক্রমিক | সংরক্ষিত এলাকা | ইকোসিস্টেম | সংরক্ষণ-অধিশ্রয়ণ | স্থান | এলাকা (হেক্টর) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৭ | নগরবাড়ি-মহনগঞ্জ ডলফিন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | নদী | গঙ্গা নদী ডলফিন | পাবনা | ৪০৮.১১ |
| ৩৮ | রাতারগুল জলাবন | | | সিলেট | ২০৪.২৫ |
| ৩৯ | সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড | | | বঙ্গোপসাগর | ১৭৩,৮০০ |
| ৪০ | মেরিন | | | বঙ্গোপসাগর | ৬৯,৮০০ |

*সূচক ১৫.৫.১ লাল তালিকা সূচক (আরএলআই)*

লাল তালিকা সূচক (আরএলআই) হলো এমন একটি সূচক যা আঞ্চলিক বা বৈশ্বিকভাবে বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে এমন নির্দিষ্ট প্রজাতির বিলুপ্তির ঝুঁকিকে '১' থেকে '০' মান হিসেবে ব্যবহার করে । এখানে '১' হলো সবচেয়ে ভালো অবস্থান, যেখানে সকল প্রজাতি বিলুপ্তি হুমকির বাইরে রয়েছে অথবা কম উদ্বেগী শেণিতে (লিস্ট কনসার্ন ক্যাটাগরি) রয়েছে। অন্যদিকে '০' হলো সবচেয়ে খারাপ অবস্থান, যেখানে আঞ্চলিক বা বৈশ্বিকভাবে বিলুপ্তির হুমকিতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতি স্থান পায়। আন্তর্জাতিক স্কেলে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সর্বশেষ আরএলআই হলো ০.৮৬, পাখীদের ক্ষেত্রে ০.৯১, উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ০.৭৫ এবং প্রবালের ক্ষেত্রে ০.৮১। বিগত কয়েক দশক ধরে এই চারটি গ্রুপের আরএলআই আশংকাজনকভাবে কমছে যার মানে পরিস্থিতি অবনতির দিকে গড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে পাখি, উভচর প্রাণী, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং বিভিন্ন খোলসযুক্ত প্রাণীর আরএলআই ০.৮০ এর চেয়ে বেশি। যার মানে হলো, এই চারটি শ্রেণির অবস্থান তুলনামূলক ভালো। কিন্তু স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে অবস্থা বেশ গুরুতর। এদের আরএলআই প্রায় ০.৫০ এর কাছাকাছি। এই প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে জরুরী ভিত্তিতে সংরক্ষণ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রজাপতি এবং বিভিন্ন সরীসৃপ জাতের প্রাণীদেরও আরএলআই খুব ভীতিকর অবস্থায় রয়েছে।

নিচের সারণিতে ২০০০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণীদের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই অবস্থান সরাসরি তুলনামূলক নয়, কারণ ২০০০ সাল এবং ২০১৫ সালের প্রটোকল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ভিন্নভিন্ন। তারপরও যা বলা যায়, তা হলো– বিভিন্ন প্রাণী শ্রেণির মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং মাছ সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন।

**সারণি ১৫.৪: প্রজাতির অবস্থান তুলনা, ২০০০ এবং ২০১৫**

| গোষ্ঠী | ২০০০ সালে রেড অবস্থান | | ২০১৫ সালে রেড অবস্থান | |
|---|---|---|---|---|
| | প্রজাতির সংখ্যা | হুমকির মুখে | প্রজাতির সংখ্যা | হুমকির মুখে |
| মাছ (মিঠা ও লোনা পানি) | ২৬৬ | ৫৪ (২০%) | ২৫৩ | ৫৯ (২৩%) |
| উভচর প্রাণী | ২২ | ৮ (৩৬%) | ৪৯ | ১০ (২০%) |
| সরীসৃপ | ১২৭ | ৬৩ (৫০%) | ১৬৭ | ৩৮ (২৩%) |
| পাখি | ৬২৮ | ৪৭ (৭%) | ৫৬৬ | ৩৯ (৭%) |
| স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী | ১১৩ | ৪৩ (৩৮%) | ১৩৮ | ৩৬ (২৬%) |
| কাকড়া জাতীয় প্রাণী | খুব কম দেখা যায় | ১৪১ | ১২ (৮.৭%) | |
| প্রজাপ্রতি | খুব কম দেখা যায় | ৩০৫ | ৫৭ (১৯%) | |

*উৎস: আইইউসিএন, ২০১৫*

বর্তমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়ারইতিবাচক সুসংবাদ হলো এই যে, প্রজাতিকূলের মধ্যে বিলুপ্তির হুমকিতে নেই এমন ক্যাটাগরিতে থাকা সবচেয়ে কম উদ্বেগজনক হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ৫৩ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ৫০ শতাংশ হয়েছে। । ১১ প্রজাতির আবাসিক পাখি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১১টি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে যে ২টি প্রজাতিকে ২০০০ সালে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, ২০১৫ সালে তা নতুন করে আবার খুঁজে পাওয়া গেছে।

জাতীয় জৈববৈচিত্র্য মূল্যায়ন ২০১৫ (ডিওই, ২০১৫) জীববৈচিত্র্যের প্রতি সরাসরি হুমকি এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সংরক্ষিত অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বর্ধিত জনসংখ্যা একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের আবাস ও কৃষিক্ষেত্রের বিস্তৃতি, চাষাবাদেপালাক্রম, বিভিন্ন পশুপাখি ও বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল কমে যাওয়া এবং বিলুপ্তি ইত্যাদি বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান হুমকি। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার, বিশেষ করে– মৎস সম্পদ, মিঠাপানির খোলসযুক্ত প্রাণী, প্রবাল, কচ্ছপ, ব্যাঙ, সাপ, পাখি এবং রাজহাঁস ইত্যাদির অতিরিক্ত শোষণ জীববৈচিত্র্যের জন্য অন্যতম হুমকি। অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য, গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব আবর্জনা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যেমন– বালাইনাশক, কীটনাশক, আগাছানাশক এবং জৈবসার ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে স্থলজ ও জলজ বাস্তুসংস্থান দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

## ১৫.৩ সরকারি প্রচেষ্টা

### বৃক্ষনিধনবিলম্বকরণ

২০১৬ সালের আগস্ট মাসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে বনায়ন সংরক্ষণ করতে বৃক্ষনিধনের ওপর জারিকৃত বিলম্বকরণ নির্দেশ ২০২২ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এই নিষেধাজ্ঞা বর্ধিত করা হয়।

### পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (ইসিএএস)

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর সেকশন ৫ এর অধীনে বাংলাদেশ ১৩টি জীববৈচিত্র্যময় জলাভূমিকে পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। পরিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মোট বিস্তৃতি ৩৮৪,৫৯২ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২.৬০ ভাগ। পরিবেশ বিভাগ এই অঞ্চলগুলো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে।

**সারণি ১৫.৫: বাংলাদেশের ইকোলজি ক্রিটিকাল এরিয়া (ইসিএএস)**

| | ইসিএ | ইকোসিস্টেম এর ধরন | স্থান | জায়গা (হেক্টর) | ঘোষণার বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কক্সবাজার-টেকনাফ উপদ্বীপ | কোষ্টাল-মেরিন | কক্সবাজার | ২০,৩৭৩ | ১৯৯৯ |
| ২ | সুন্দরবন ( ১০ কিলোমিটার ভুমিমুখী পরিধি) | কোষ্টাল-মেরিন | বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা | ২৯২,৯২৬ | ১৯৯৯ |
| ৩ | সেন্ট-মার্টিন দ্বীপ | মেরিন দ্বীপ সাথে কোরাল রিফ্স | টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার | ১,২১৪ | ১৯৯৯ |
| ৪ | হাকালুকি হাওর | মিষ্টি জলদ্বীপ জলাভূমি | সিলেট এবং মৌলভীবাজার | ৪০,৪৬৬ | ১৯৯৯ |
| ৫ | সোনাদিয়া দ্বীপ | মেরিন দ্বীপ | মহেশখালী উপজেলা, কক্সবাজার | ১০,২৯৮ | ১৯৯৯ |
| ৬ | টাঙ্গুয়ার হাওর | | মৌলভীবাজার | ৯,৭২৭ | ১৯৯৯ |
| ৭ | মারজাত বাওর | মিষ্টি জলদ্বীপ জলাভূমি | কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ্ এবং চৌগাছা উপজেলা, যশোর | ৩২৫ | ১৯৯৯ |
| ৮ | গুলশান-বারিধারা উদ্যান | | ঢাকা শহর | ১০১ | ২০০১ |
| ৯ | বুড়িগঙ্গা | নদী | শুধু ঢাকা | ১৩৩৬ | ২০০৯ |

| | ইসিএ | ইকোসিস্টেম এর ধরন | স্থান | জায়গা (হেক্টর) | ঘোষণার বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | তুরাগ | নদী | শুধু ঢাকা | ১১৮৪ | |
| ১১ | শীতলক্ষা | নদী | নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর | ৩৭৭১ | |
| ১২ | টঙ্গি খাল সংযুক্ত বালু | নদী | শুধু ঢাকা | ১৩১৫ | |
| ১৩ | জাফলং-ডাউকি | নদী | জাফলং, সিলেট | ১৪৯৩ | ২০১৫ |

***উৎস: ডিওই, ২০১৫***

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় অবস্থিত রাতারগুল হলো ছোট একটি মিঠাপানির জলার বন (সোয়াম্প)। এটাই বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা একমাত্র মিঠাপানির জলার বন। এই এলাকার বাস্তুসংস্থান হলো সাধারণ মিঠাপানির জলাভূমির বন, যা শীতকালে শুষ্ক থাকে এবং বর্ষাকালে প্রায় ৮ ফুট পানিতে নিমগ্ন হয়ে যায়। এই অঞ্চলের বনপরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের জন্য সরকার ২০১৫ সালের মে মাসে রাতারগুলকে একটি বিশেষ জীবমণ্ডল সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে।

***শকুনি নিরাপদ জোন (ভালচার সেইফ জোন)***

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃকসিলেট ও খুলনা অঞ্চলে দুইটি বিশেষ 'শকুনি নিরাপত্তা জোন' ঘোষণা করা হয় যা চিত্র ১৫.২ এ দেখানো হয়েছে। সিলেট অঞ্চলে বাংলাদেশ সীমার ভেতরে মোট নিরাপদ জোনের বিস্তৃতি প্রায় ১৯,৬৬৩ বর্গ কিঃমিঃ এবং মূল জায়গা ৭,৪৫৯ বর্গ কিঃমিঃ। খুলনা অঞ্চলে বাংলাদেশের সীমার ভেতরে মোট নিরাপদ জোনের আয়তন হলো ২৭,৭১৭ বর্গ কিঃমিঃ; যার মধ্যে মূল নিরাপত্তা জোন হলো ৭,৮৪৬ বর্গ কিঃমিঃ।

চিত্র ১৫.২ বনবিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভালচার সেইফ জোন

## ১৫.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

জিইডি (২০১৫) অনুযায়ী বনাঞ্চলের লক্ষ্য অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ হলো– বনভূমির সুস্পষ্ট সীমা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকা এবং বনভূমির দৃশ্যমান সীমানা নির্ধারণ, ভূমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘশত্রুতা, কাঠের চাহিদা, জ্বালানী কাঠ, খুঁটি ও চারগাছ, রান্নাবান্নার জন্য জ্বালানী কাঠের ব্যবহার, ইট পোড়ানো এবং তামাক শোধন/নিরাময়, কুঁড়েঘর নির্মাণ, পানের বরজে আচ্ছাদন নির্মাণ, পার্বত্য-চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি দখল নিয়ে বিরোধ এবং অপর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক/ রসদ সংকট ইত্যাদি।

উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কক্সবাজার, টেকনাফ অঞ্চলের বনভূমির ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করছে। এরইমধ্যে বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রায় ৬০০০ একর বনভূমি শরণার্থীদের অস্থায়ী বসবাসের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শরণার্থীরা রান্না-বান্নার জন্য বনের কাঠ কেটে নিচ্ছে, যা এ অঞ্চলের বনসম্পদকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করছে; কমিয়ে দিচ্ছে বনসম্পদের পরিমাণ।

বনবিভাগ (আহসান, ২০১৬) সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য বেশকিছু হুমকি চিহ্নিত করেছে। সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী আশ্রয়স্থল (ডব্লিউএস) এবং কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান (এনপি) মানুষের ইচ্ছাকৃত ক্ষয়-ক্ষতি ও নানা ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ফলে নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হচ্ছে। সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী আশ্রয়স্থলের জন্য বনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আয়োজিত রাশমেলার সময় বিপুল সংখ্যক মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জৈবসম্পদ ব্যবহারের মধ্যে আছে বৃক্ষ নিধন (লগিং), স্থলজ প্রাণী শিকার ও হত্যা এবং অধিক পরিমাণে স্থলজ বৃক্ষ সংগ্রহও অন্যতম হুমকি। কৃষি ও জলজ শ্রেণির মধ্যে সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন মধুপুর জাতীয় উদ্যান। এখানে হুমকির মূলে রয়েছে বার্ষিক ও বারোমাসি (দীর্ঘমেয়াদী) ফসল চাষাবাদ, রাবার ও একাশিয়া জাতের গাছের চাষ এবং উদ্যানের ভেতর গবাদিপশু চারণ ইত্যাদি। তাছাড়া আবাসিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নও এই বনভূমির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান হুমকি হিসেবে থাকছে।

লক্ষ্যণীয় যে, দেশের ৩৮টি সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে অনেকগুলোই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। সংরক্ষিত অঞ্চলগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব হলো এই যে, অধিকাংশ জনগণই জাতীয় উদ্যান বা বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রমগুলো পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণ সচেতনার বিষয়গুলো মাথায় রাখে না। দর্শনার্থীদের আচরণ কখনো কখনো বন্যপ্রাণী বা গাছ-গাছালীর জন্য সরাসরি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অথবা পরোক্ষভাবে তাদের স্বাভাবিক জীবনে নানা বিঘ্নের সৃষ্টি করে।

## ১৫.৫ ভবিষ্যত করণীয়

বর্তমানে বাংলাদেশে বনাঞ্চলে বৃক্ষের ঘনত্ব যে সন্তোষজনক নয়, এই বিষয়টি বুঝতে পেরে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (জিইডি, ২০১৫) বৃক্ষের ঘনত্ব ৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিকল্পনায় বনকৌশলের মধ্যে আছে প্রাকৃতিক বনে গাছ কাটা বিলম্বকরণ, বিদ্যমান বনগুলোতে গাছের ঘনত্ববৃদ্ধি, 'এসিসটেড ন্যাচারেল রিজেনারেশন'-এর মাধ্যমে পুরনো বৃক্ষরোপিত এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি জোরদার করা।

এই পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ হেক্টর পাহাড়ী বন এবং ৫০০০ হেক্টর সমতল ভূমির বনায়ন করা হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। বৃক্ষরোপনের উৎপাদনশীলতা বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি করতে হবে এবং বনাঞ্চলের ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্নমুখী কাজে ব্যবহৃত হয় এমন বৃক্ষের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান বনায়ন ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচি চালু রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করতে বিদ্যমান কর্মসূচী একইরকম গুরুত্বের সাথে চালু রাখতে হবে। এই অঞ্চলগুলোতে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর ভূমিতে বৃক্ষরোপন ও পুনঃরোপন করা হবে।

## ১৫.৬ সারাংশ

দেশে বর্তমানে মোট বনভূমির বিস্তৃত দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৫ শতাংশ। বৃক্ষ বেষ্টনীর ভিত্তিতে (কোনপি কভারেজ) বনাঞ্চলের গুণগত মান বর্তমানে একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। একারণেই ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি প্রধান লক্ষ্য হলো বনাঞ্চলে বৃক্ষের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা। বনাঞ্চলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে যথা– বৃক্ষ নিধন বিলম্বকরণ, সুরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা (ইসিএ), বিশেষ জীববৈচিত্র্য জোন তৈরি এবং শুকুনির জন্য দু'টি নিরাপদ জোন প্রতিষ্ঠা অন্যতম। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই সকল পরিকল্পনাগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১৬

# শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

## ১৬.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

একটা শান্তপ্রিয় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ চিহ্নিতকরণে সহিংসতার প্রকোপ ও বিচার পদ্ধতিতে সুযোগ সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই সূচক আবার টেকসই উন্নয়নের জন্য তাৎপর্য বহন করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ৬৮/১৮৮ আইনের শাসন ও উন্নয়ন যে পরস্পর সংযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক, এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের দোহা সম্মেলনে পরিবেশিত তথ্যানুসারে, ২০০০ থেকে ২০১৩ সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক স্তরে সহিংস অপরাধ প্রবণতামোটামুটি স্থিতিশীল ছিল তবে বিভিন্ন অঞ্চলগত দেশ ও অর্থনৈতিক স্তর ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ২০১২ সালে বৈশ্বিক স্তরে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের (ইনটেনশনাল হোমিসাইড) হার ছিল ৬.২জন। যদিও উচ্চআয়ের দেশগুলোতে বিভিন্ন সহিংস অপরাধ প্রবণতার হার কমেছে কিন্তু উচ্চ-মধ্যআয়, নিম্নআয় এভং নিম্ন-মধ্যআয়ের দেশগুলোতে এ অবস্থার অবনতি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ২০১৩ সালে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যআয়ের দেশগুলোতে পরিকল্পিত খুনের হার উচ্চআয়ের দেশগুলোর চেয়ে প্রায় ২.৫গুণ বেশি ছিল।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রতিবেদন ২০১৭ অনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নত হলেও সহিংসতার প্রবণতা বাড়ছে এবং পরিকল্পিত খুনের হারেরক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে খুবই ধীর গতিতে। বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিকল্পিত খুনের হারের পরিসর ১০০,০০০ জনে ৫.৭ থেকে ৬.২ জন। উচ্চ বৈষম্যের দেশগুলোতে এই হার আরো বেশি। ২০১৫ সালে ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রতি ১০০,০০০ জনে সর্বোচ্চ পরিকল্পিত খুনের হার নথিভুক্ত হয়েছে ২১.৩ থেকে ২৭.৩ পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সর্বনিম্ন হার হলো ০.৯ থেকে ১ জন। ১-১৪ বছর বয়সী শিশুদের প্রায় ৮০ ভাগই নিয়মিতভাবে কোনো না কোনো শারীরিক বা মানসিক শাস্তির শিকার হয়। ২০১২-২০১৪ সময়ের মধ্যে বিশেষত দরিদ্র দেশগুলোতে প্রায় ৫৭০টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের মানব পাচারের ঘটনা ধরা পড়ে। পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৭১ শতাংশ নারী এবং ২৫ শতাংশ হলো শিশু।

টেকসই উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের 'স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম রুলস ফর নন-কাস্টডিয়ান' অনুযায়ী, একজন বিচারপ্রার্থীর বিচারপূর্ব কারাবাসের সময় কমিয়ে আনার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যাতে করে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই সে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ পায় (সাধারণ পরিষদ প্রস্তাব, ৪৫/১১০)। বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে এই বিষয়ে বৈশ্বিক স্তরে কার্যত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বিচারের অপেক্ষায় থাকা বা দণ্ডিত ব্যক্তিদের হার ২০০৩-২০০৫ সালের ৩২ শতাংশ থেকে ২০১৩-২০১৫ সালে ৩১ শতাংশে নেমে এসেছে।

## ১৬.২ সূচকের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর অগ্রগতি মূল্যায়ন

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে পরিকল্পিত নরঘাতীর শিকারের হারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতার মতো বিষয়গুলো এখনো এদেশে বাস্তবতা। বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা বর্তমান সমাজে অতি সাধারণ এবং অন্যতম প্রধান একটি ঘটনা।নানাবিধ সামাজিক কারণে এসব ক্ষেত্রে অভিযোগের হার খুবই কম। 'নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা জরিপ-২০১৫' অনুযায়ী বিয়ে হয়েছে এমন নারীদের প্রায় ৭২.৬ ভাগই জীবনে অন্তত একবার হলেও স্বামী কর্তৃক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন; ২৭.৪ শতাংশ নারী সঙ্গী নয় এমন মানুষের দ্বারা নির্যাতনের কথা বলেছেন। তবে নারী সহিংসতার সকল ধরনের ক্ষেত্রেই ২০১১ সালের চেয়ে ২০১৫ সালে অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতা ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহসাম্প্রতিক সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এদের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

আইনের শাসন এবং সকলের জন্য ন্যায়বিচারের সুবিধা নিশ্চিতকরণ এখনো বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ। উদ্বেগের জায়গাগুলোর মধ্যে আছে বিচারের অপেক্ষায় থাকা বিপুল সংখ্যক মামলা (প্রায় ৩ মিলিয়ন), সকলের দ্বারা বিশেষ করে দরিদ্রদের আইনি সহায়তা লাভের প্রতিবন্ধকতা এবং বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বিচারের ক্ষেত্রে এই সকল জটিলতার কারণে জনগণ বিভিন্ন বিচার যেমন, জমিজমার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে উৎসাহী হয়। এতদসত্ত্বেও, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজি'র অন্তর্ভুক্তি, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডায় অংশ নিতে বাংলাদেশ যে গভীরভাবে মনযোগী এর মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

### *সূচক ১৬.১.১ জেন্ডার ও বয়সভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা*

২০০৩-২০১৪ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে পরিকল্পিত খুনের হার তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি(প্রতি ১০০,০০০ জনে শিকার৭.২)।।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে এই হার কমে ১.৮ জনে নেমে এসেছে, যারমধ্যে ১.৪ হলো পুরুষ এবং ০.৪ নারী। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং আইন ও শাসন অবস্থার উন্নয়ন সহিংসতার হার কমিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা রেখে ২০১৭ সালে পরিকল্পিত খুনের হার আরও কমে নেমে এসেছে ১.৬৫ (এসআইআর, ২০১৭)। যাই হোক, বিগত কয়েক বছরে এই সূচকে বার্ষিক গড় হ্রাসের হার চিত্তাকর্ষক ৪.২৬ শতাংশ।

**সারণি ১৬.১: পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা**

| সূচক | ২০১০ | ভিত্তি বছর (২০১৫) | ২০১৭ | মাইলফলক ২০২০ | লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬.১.১ জেন্ডার ও বয়স অনুযায়ী প্রতি একশত হাজার জনে ইচ্ছাকৃত নর হত্যায় আক্রান্তদের সংখ্যা | ২.৬ | সর্বমোট: ১.৮<br>পুরুষ: ১.৪<br>নারী: ০.৪<br>(এমওএইচএ, ২০১৫) | সর্বমোট: ১.৬৫<br>পুরুষ: ১.২৩<br>নারী: ০.৪২ | সর্বমোট: ১.৬<br>পুরুষ: ১.৩<br>নারী: ০.৩ | সর্বমোট: ১<br>পুরুষ: ০.৯<br>নারী: ০.১ |

*উৎস: পিএসডি, এমওএইসএ, ২০১৫; এসআইআর, এমওএইচএ, ২০১৮*

### *সূচক ১৬.১.৩ পূর্ববর্তী ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার জনসংখ্যার অনুপাত*

এই সূচকের মাধ্যমে সহিংসতার সাম্প্রতিক ও চলমান পরিস্থিতি জানা যায়। নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ-২০১৫ অনুযায়ী, কোনো না কোনো সময়ে বিয়ে হয়েছে এমন নারীদের মধ্যে প্রায় ৫৭.৭ শতাংশ তার স্বামী কর্তৃক যেকোনো প্রকারের সহিংসতার শিকার হয়। বিগত ১২ মাসে যেকোনো প্রকারের সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদের অনুপাত ৩৮.০ শতাংশ, যারমধ্যে শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকারের অনুপাত ৫৪.২ শতাংশ এবং ২৬.৯ শতাংশ। যাই হোক সহিংসতার শিকার এই সকল নারীদের অধিকাংশই (৬১.৪ শতাংশ) দরিদ্র পরিবার থেকে আগত।

### *সূচক ১৬.২.১ জেন্ডার, বয়স ও শোষণের ধরণভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে মানব পাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত*

এই সূচক একটি দেশের আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরিমাপ করে। মানব পাচার রোধে সর্বনিম্ন মান ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেও সরকার 'মানব পাচার হ্রাস ও প্রতিরোধ আইন ২০১২' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে এবং এই আইন বাস্তবায়নের রোডম্যাপ হিসেবে ২০১৫-১৭ সালের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তারপরও মানব পাচার রোধে সরকারি অনুসন্ধান, মামলা পরিচালনা এবং পাচারে জড়িতদের শাস্তি বিধানের ওপর আরো গভীর নজর দিতে হবে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মানব পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যাভিত্তিবছর ২০১৫ প্রতি ১০০,০০০ এর ০.৮৫ থেকে নেমে এসেছে ০.৫৮ এবং ২০১৫-১৭ সময়ের মধ্যে এই সূচক বার্ষিক গড়ে ১৭.৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে।

**সারণি ১৬.২: মানব পাচার ও যৌন নিপীড়নে আক্রান্তের সংখ্যা**

| সূচক | ভিত্তি-বছর (২০১৫) | ২০১৭ | মাইলফলক ২০২০ |
|---|---|---|---|
| ১৬.২.২ জেন্ডার ও শোষণের ধরনভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে মানব প্রাচারে আক্রান্তের সংখ্যা | ০.৮৫<br>(পুরুষ: ০.৫৩; নারী: ০.৩২)<br>(এমওএইচএ, ২০১৫) | ০.৫৮<br>পুরুষ: ০.৩৬<br>নারী: ০.২২<br>(এমওএইচএ, ২০১৮) | সর্বমোট: ০.৫<br>(এমওএইচএ, ২০১৮) |
| ১৬.২.৩ ১৮ বছর বয়সের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে, এমন ১৮-২৯ বছর বয়সী তরুণ-তরণীর অনুপাত (শতাংশ) | মহিলা: ৩.৪৫<br>(ভিএডব্লিউ জরিপ, ২০১৫) | নারী: ০ | ৩<br>(এমওডব্লিউসিএ, ২০১৮) |

*উৎস: বিবিএস, নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন (ভিএডব্লিউ) জরিপ ২০১৫; পিএসডি, এমওএইচএ, এসআইআর, ২০১৮; এমওডব্লিউসিএ, এসআইআর, ২০১৮*

### *সূচক ১৬.৩.১ কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সরকারিভাবে স্বীকৃত অন্যকোনো বিরোধ নিষ্পত্তিকারী সংস্থার নিকট বিগত ১২ মাসে সহিংসতার শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা উল্লেখপূর্বক অভিযোগ প্রদানকারীর অনুপাত*

এই সূচক ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুবিধা নির্দেশ করে। ২০১৫ সালে সঙ্গী কর্তৃক সহিংসতার শিকার হওয়া ৭২.৭ শতাংশ নারী তাদের সাথে ঘটা সহিংসতার কথা কারো নিকট অভিযোগ করেনি। মাত্র ২.১ ভাগ নারী স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নিকট হাজির হয়ে অভিযোগ করেছে এবং মাত্র ১.১ শতাংশ নারী সহিংসতার ঘটনায় পুলিশের সাহায্য চেয়েছে।

তবে ২০১৫ সাল থেকে এক্ষেত্রে চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে বার্ষিক ৩৭,০০০ উপকারভোগীকে আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করা থাকলেও, ২০১৭ সালে প্রায় ৮০,০০০ উপকারভোগীকে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই সেবা কৃতিত্বের কারণে ২০২০ সালের জন্য বার্ষিক প্রায় ৯০,০০০ মামলারত ব্যক্তিকে আইনী সহায়তা দেওয়ার নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিরোধ নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে বিকল্প বিরোধ নিষপত্তি (এডিআর) এর আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে বার্ষিক ২৫,০০০ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্য নিয়ে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৬,০০০ মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

### *সূচক ১৬.৩.২ জেলে বন্দী মোট জনসংখ্যার তুলনায় বিনাদণ্ডে আটক বন্দীর সংখ্যার অনুপাত*

এই সূচক মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা এবং একটি কার্যকর বিচার ব্যবস্থার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সামগ্রিক বিচার বিভাগের সক্ষমতা মূল্যায়নে সহায়তা করে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশে বিনা দণ্ডে আটককৃত বন্দীদের অনুপাত অনেক বেশি (প্রায় ৭৯ শতাংশ, ২০১৫)- ২০৩০ এর লক্ষ্য থেকে যা প্রায় দ্বিগুণ বেশি। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নিম্নআয়ের দেশ এবং সল্পোন্নত দেশগুলোতে আইনের শাসন বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

সূচক ১৬.৭.১ জাতীয়ভাবে বন্টনের তুলনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে (জাতীয় ও স্থানীয় সংসদ, সরকারি চাকুরি ও বিচার বিভাগ) জেন্ডার, বয়স, অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীভেদে পদের অনুপাত নির্দেশ করে।

এই সময়ের মধ্যে নারী অফিসারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশী প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। ২০২০ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশের লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিক সময়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে।

### *সূচক ১৬.৯.১ বয়স অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনকৃত অনূর্ধ-৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত*

এই সূচক থেকে মানুষের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির স্তর, স্বীকৃতি এবং ব্যক্তির মানবাধিকার সংরক্ষণে অবস্থা জানা যায়। শিশু অধিকার কনভেনশনের আর্টিকেল ৭ এর মাধ্যমে এই অধিকার সুরক্ষিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জরিপ এমআইসিএস ২০১২-১৩ অনুযায়ী, অনূর্ধ-৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৩৭ ভাগ শিশুর জন্মনিবন্ধনকৃত করা হয়েছে। ২০০১ সালে একই বয়সী শিশুদের জন্মনিবন্ধন হার ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। আশা কথা হলো, এই অবস্থার উন্নয়ন করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ২০০১ সালে ইউনিসেফের সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে "জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প" গ্রহণ করেছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০০৬ সালে নতুন জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আইন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে অনলাইনে নিবন্ধন সুবিধা প্রদান করতে বার্থ এ্যান্ড ডেথ রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন সিস্টেম (বিআরআইএস) বা জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন তথ্য পদ্ধতি চালু করেছে। সরকারের এইসকল উদ্যোগ দেশব্যাপী জন্মনিবন্ধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে ভূমিকা রেখেছে।

### *সূচক ১৬.১০.২ জনসাধারণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ এবং/অথবা নিশ্চয়তামূলক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা*

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাশ করা হয়েছে। এই আইন অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণে কাজ করে। চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা জাতীয় সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য অধিকার এরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। এই আইনের আওতায়একটি স্বাধীন তথ্য কমিশনও গঠন করা হয়েছে।

### *সূচক ১৬.ক.১ প্যারিস চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য সকল নাগরিকের মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ধারা অনুযায়ী, দেশে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ধরনের চমৎকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মর্যাদা ও সততার নিশ্চয়তা বিধান করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি আদর্শের নিরাপত্তা বিধান করা, যাতে করে সকল মানুষের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং দেশে মানবাধিকারের মান উন্নয়ন ঘটে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) মানবাধিকার লংঘন রোধে বিভিন্ন জনসচেতনামূলক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করে যেমন– বিবৃতি প্রদান, সহিংসতার স্থান পরিদর্শন, সেমিনার এবং গোলটেবিল আলোচনা ইত্যাদিসহ সব ধরনের মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধে সরব থাকে। এই কমিশন বর্তমানে এর দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে (২০১৬-২০২০), যেখানে ২০১৬-২০২০ এর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানবাধিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন ১৭টি সমস্যা চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে দুইটি বিচার্য বিষয় রয়েছে সবার ওপরে: প্রথমটি হলো, রাষ্ট্র ব্যবস্থা কর্তৃক সহিংসতা বিশেষ করে জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম, জেলহাজতসহ বিভিন্ন নির্যাতন/নিপীড়ন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সংস্কৃতি, দ্বিতীয়টি হলো, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার লঙ্ঘন যার মধ্যে আছে স্বাস্থ্য অধিকার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং শারীরিকভাবে অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যসহ নানা ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লংঘন।

২০১৬ সালে, মানবাধিকার কমিশন মোট ৬৯২টি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় সাড়া দেয়, যার মধ্যে ৬৬৫ জন প্রতিবাদী সরাসরি নিজেরা কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করে এবং ২৭টি ক্ষেত্রে কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মানবাধিকার লংঘনের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো– সহিংসতা (১০৮), চাকুরী (৫৬), যৌতুক(২১) হত্যা (২০) এবং অপহরণ (১০)। স্মর্তব্য ২০১৬ সালে এরকম মোট ৫০৩টি অভিযোগ সমাধান করা হয়েছে।

## ১৬.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ

বিভিন্ন অপরাধের ওপর পর্যাপ্ত ও হালনাগাদকৃত তথ্যের অভাবে এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিচালন কঠিন হয়ে পড়ে। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যনির্ভর একটি দক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে এই অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

এদেশে আইনের শাসন বাস্তবায়ন একটি মারাত্মক উদ্বেগের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। এই লক্ষ্যে আইন কার্যকরী করণেআরো বিশেষ মনযোগ দেয়া জরুরি। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখানে উপযুক্ত আইন রয়েছে, কিন্তু যথাযথ আইন বাস্তবায়নের ঘাটতি অপরাধ দমন কার্যক্রমের সফলতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যকর জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটতে পারে।

সংশ্লিষ্ট এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কার্যকর বিচার বিভাগের সুবিধা নিশ্চিতকরণ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রয়োজনীয় জনবল ও প্রযুক্তিগত সম্পদের ঘাটতির কারণে বিচার বিভাগ দ্রুত বিচার নিষ্পত্তিকরণে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার অভিযোগ বিশেষ করে পারিবারিক সহিংসতা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা এদেশের অন্যতম প্রধান একটি বিবেচ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে সহিংসতা প্রতিরোধ, হুমকির ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তির নিরাপত্তা, ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা এবং অপরাধীদের দ্রুত জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সময়মত অভিযোগ করা জরুরি। মূলত, বিদ্যমান সামাজিক ট্যাবু বা বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা এ ধরনের সহিংসতার ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ করতে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

## ১৬.৪ সারাংশ

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভিত্তিবছর থেকে পরিকল্পিত খুনের শিকার ব্যক্তিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ মানব পাচার এবং যুবদের প্রতি মানসিক ও শারীরিক নিপীড়ন অবস্থার উন্নয়নের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতেও উন্নতি সাধিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ– গত কয়েক বছরে মানব পাচারের সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত হারের চেয়ে বেশি হারে কমেছে। সবচেয়ে আশার কথা হলো, যদি বর্তমান অবস্থা জারি থাকে তবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর অধিকাংশ লক্ষ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অর্জিত হয়ে যাবে।

তবে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ এখনো গুরুত্বপূর্ণ যথা: বিভিন্ন অপরাধকাণ্ডের পর্যাপ্ত হালনাগাতকৃত তথ্যের ঘাটতি, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, বিপুল পরিমাণে মামলা পরিচালানায় বিচার বিভাগের সক্ষমতার অভাব এবং সহিংসতা বা অপরাধের সময়মত অভিযোগের ঘাটতি ইত্যাদি।

দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ও সরকারি চাকুরীতে দুর্নীতি মোকাবেলায় সরকার শাসন সংক্রান্ত বেশকিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে যেমন, বার্ষিক কর্মসক্ষমতা চুক্তি (এপিএ), নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার), জাতীয় ঐক্যবদ্ধতা পরিকল্পনা (এনআইএস) এবং অভিযোগ সমাধান পদ্ধতি (জিআরএস) ইত্যাদি। এ সকল অনুষঙ্গ ভবিষ্যতে অধিক দায়িত্বশীল ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার নিশ্চয়তা দেবে।

# ১৭

# অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

## টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ এবং বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

## ১৭.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য অংশগ্রহণকারী সকল দেশের উচিত হবে প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত, সরকারি ও বেসরকারি, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পদের সংস্থান ও কার্যকর ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রধান প্রধান আর্থিক সম্পদগুলো হলো– অভ্যন্তরীণ কর, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) । অন্যদিকে, অর্থ-বহির্ভূত সম্পদের বন্ধনীতে রয়েছে দেশীয় নীতি কাঠামো, কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও দক্ষ প্রশাসনের জন্য সহায়তা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। উন্নয়নশীল দেশগুলো অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে,অপরদিকে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীলদেশকে টেকসই উন্নয়নের পথে নিয়ে আসতে ওডিএ এর মাধ্যমে নানারকম সহযোগীতা দিয়ে আসছে।

নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশসমূহ (এলএমআইসিএস) বিশেষ করে– নিম্ন আয়ের দেশগুলো তাদের উন্নয়ন এজেন্ডা অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সরকারি তহবিলের ওপর নির্ভর করে। যাই হোক, ২০১৩ সালে অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক কো-অপারেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এর অন্তর্ভুক্ত মাত্র পাঁচটি দাতা দেশ (নরওয়ে, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্য) জাতিসংঘের দীর্ঘকালের লক্ষ্যমাত্রা মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে ব্যয় করার শর্ত পূরণ করতে পেরেছে। স্মর্তব্য যে, সরকারি উন্নয়ন সহায়তার সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৯৯০ সাল থেকে উচ্চআয়ের দেশগুলোতে (এইচআইসি) গড় সরকারি রাজস্ব আদায় মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মূলত আয়কর এবং মূল্য সংযোজন করের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে এটা মোট জিডিপি-র ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এসব দেশগুলোতে মোট কর রাজস্ব আহরণের অনুপাত জিডিপি-র ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশ। নিম্ন-মধ্যআয় এবং উচ্চমধ্য আয়ের দেশগুলোর ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। তবুও দারিদ্র্যপিড়ীত ও অভাবগ্রস্থ দেশগুলোতে শক্তিশালী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দেশীয় রাজস্ব আয়ে ঘাটতি রয়ে গেছে। জিডিপি-র অনুপাতে সবচেয়ে কম রাজস্ব আদায়কারী বিভিন্ন দেশে, জিডিপি-র অনুপাতে কর রাজস্বের হার এখনো ১৫ শতাংশের নিচে বিশেষ করে যেসব দেশে এখনো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাস যেমন বাংলাদেশ, ভারত ও নাইজেরিয়ায়। তবে গত দুই দশক ধরে সকল আয়স্তরের দেশেই রাজস্ব ও কর আহরণের ধারা ধরাবাহিকভাবে উন্নীত হয়েছে। যাই হোক, ২০১৫ সালে, মোট নীট সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) ছিল ১৩১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্য থেকে মাত্র ৩৭.৩ বিলিয়ন ডলার গিয়েছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে।

এসডিজি ১৭ অভীষ্টের মূল মনোযোগ হচ্ছে: উন্নয়নশীল দেশগুলোর দেশীয় ও বৈদেশিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধি, সমন্বিত নীতি ও কর্মপন্থার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনা টেকসইকরণ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে পৌছানোর কর্মপন্থা বাস্তবায়ন ও শক্তিশালী করণের ওপর আলোকপাত করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ ভাগাভাগির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে বৈশ্বিক অংশিদারিত্বের ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করে অভীষ্ট ১৭।

## ১৭.২ সূচকের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৭ এর অগ্রগতি মূল্যায়ন

**সম্পদ আহরণ:**

সাম্প্রতিককালে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০১৭) ২০১৫-১৬ সালের স্থিরমূল্যে এসডিজি বাস্তবায়নের অতিরিক্ত খরচ অনুমান করেছে মোট ৯২৮.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যকথায় ২০১৭-২০৩০ সময়ের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য দেশীয় ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে বার্ষিক ব্যয় দরকার হবে প্রায় ৬৬.৩২ বিলিয়ন ডলার। এই বিপুল পরিমাণ সম্পদের ঘাটতি পূরণে অর্থ যোগানে বিভিন্ন উৎস অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে যেমন: বেসরকারি খাত (৪২.০৯ শতাংশ), সরকারি খাত (৩৫.৫০ শতাংশ), সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (৫.৫৯ শতাংশ), বৈদেশিক অর্থায়ন (১৪.৮৯ শতাংশ) এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান (৩.৩৯ শতাংশ)।

সকল অংশীজন নিয়ে বৈশ্বিক অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে এসডিজির কার্যকর বাস্তবায়নের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সরকার মনে করে, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার বর্তমান অগ্রগতিকে আরো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এগিয়ে নিতে হবে। যদিও এদেশে জাতীয় রাজস্বের একটি বড় খাত হলো কর-রাজস্ব এবং এই খাত থেকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ মোট রাজস্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ,সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত (আনুমানিক ১০ শতাংশ) এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম।সংকুচিত করভিত্তি, বিপুল পরিমাণ করফাঁকি এবং প্রশাসনিক অদক্ষতাকে এর পেছনে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশের স্বল্প কর আহরণ সূচকের (লো ট্যাক্স-ইফোর্ট ইনডেক্স) মান বর্তমানে ০.৪৯৩ (বিবি, ২০১২) যা থেকে বোঝা যায়, এদেশের রাজস্ব আদায় সক্ষমতা এখনো অব্যবহৃত পর্যায়েই রয়ে গেছে এবং একইসাথে এটা ইঙ্গিত করে যে, বাজেট ভারসাম্যহীনতা নিরসনে রাজস্ব আদায়ের উচ্চ-সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং বলা বাহুল্য, বর্তমান রাজস্ব আহরণ সক্ষমতার উন্নয়ন করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী পনুর্গঠনসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) আরো আধুনিকায়ন করতে হবে।

বর্তমান প্রাপ্ত সম্পদের বিপরীতে হিসাকৃত প্রয়োজনীয় সম্পদের মধ্যকার ব্যবধান দূর করে এসডিজি অর্থায়নে ও বাস্তবায়নেরর জন্য সরকারি আর্থিক সহায়তা (ওডিএ), বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং রেমিটেন্সসহ অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদের পর্যাপ্ত অন্তঃপ্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বৈদেশিক খাত থেকে প্রবাহিত আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতার উন্নতি ঘটে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তা মোটেও যথেষ্ট ছিল না। ২০১০-২০১৪ সময়ের মধ্যে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১৪.২ শতাংশ, যদিও ২০১৫-১৭ সালে তা নেমে গেছে ১১.২ শতাংশে। অপরদিকে, ২০১০-১৪ সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগ, টেক্সটাইল ও জ্বালানি খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের হার বার্ষিক প্রায় ১৪.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে এফডিআই প্রবাহের পরিমাণ আরো বেড়ে প্রায় ১৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিগত সময়গুলোতে রেমিটেন্স প্রবাহ বার্ষিক গড় প্রায় ৭.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে, যদিও গত দুই বছরে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য বৈদেশিক শ্রমবাজারে শ্রমশক্তি রফতানির ক্ষেত্রে অবৈধ অভিবাসীসহ নানাবিধ কারণে ব্যাপক ধ্বংসের ফলে এই খাতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

**সারণি ১৭.১: বহিস্থ অর্থায়নের উৎস**

| | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিএ (মিলিয়ন ইউএস) | ১৭৭৭.০ | ১৮৪৭.০ | ২০৫৭.২ | ২৭৬০.৮ | ৩০৪৬.৮ | ৩০০৫.৫ | ৩৫৩১.৭ | ৩৬৭৭.৩ |
| এফডিআই(নিট) (মিলিয়ন ইউএস)) | ৯১৩.০ | ৭৭৯.০ | ১১৯৪.৯ | ১৭৩০.৬ | ১৪৩৮.৫ | ১৮৩৩.৯ | ২০০৩.৫ | ২৪৫৪.৮ |
| রেমিট্যান্স (মিলিয়ন ইউএস ) | ১০.৯ | ১১.৭ | ১২.৮ | ১৪.৫ | ১৪.২ | ১৫.৩ | ১৪.৯ | ১২.৮ |

*উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক*

বাংলাদেশে এসডিজি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন পরামর্শ ও সহায়তা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বেশকিছু কৌশলগত প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই বিভাগ সম্পদ আহরণের প্রক্রিয়া এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সাথে সহযোগীতা বৃদ্ধি করেছে। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সহযোগিতা নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল পলিসি অন ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এনপিডিসি)" প্রস্তুত করেছে। এ প্রচেষ্টার পাশাপাশি আছে হাই- লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামগুলোতে (এইচএলপিএফ) সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের অগ্রগতি ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের ওপর সেচ্ছামূলক জাতীয় পর্যালোচনা তুলে ধরা (ভিএনআর), কার্যকর উন্নয়ন সহায়তার জন্য বৈশ্বিক অংশিদারিত্বের (ডিপিইডিসি) ওপর উচ্চ পর্যায়ের মিটিং (হাই লেভেল মিটিং- এইচএলএম-২) এবং পরবর্তীতে ২০১৭ এর ডিসেম্বরে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়া যা বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এছাড়াও নিয়মিত স্থানীয় পর্যায়ে পরামার্শ বৈঠক, অনলাইন সেবা পোর্টাল "এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" এর সূচনা, ব্যাপক সরকারি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ প্রবাহের কৌশলগত রূপান্তর এবং বৈদেশিক সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের (বিডিএফ) আয়োজন হলো বহিঃসম্পদ আহরণ ও দক্ষ ব্যবস্থার জন্য প্রধান প্রধান গৃহিত পদক্ষেপ।

### *সূচক ১৭.১.১ উৎস অনুযায়ী জিডিপিতে মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত*

জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাতের মাধ্যমে যেমন অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়, তেমনি এটা বাজেট ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতার বিষয়েও ধারণা দেয়কর-রাজস্ব এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব মিলিয়ে ২০১৬-১৭ সালে সরকারি রাজস্ব দাঁড়িয়েছে প্রায় ২১৮৫.০ বিলিয়ন টাকা, যা মোট জিডিপির প্রায় ১১.১ শতাংশ। সন্দেহ নেই যে আগের বছরের ৯.৬ শতাংশের তুলনায় রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধির পেছনে কাজ করেছে মূলত নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি, কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দূরদর্শী কর আহরণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। যাই হোক, যদি এই প্রবৃদ্ধি ধারা ভবিষ্যতে ধরে রাখা যায়, তাহলে জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আহরণের হার ২০২০ সালের মাইলফলক ছাড়িয়ে যাবে। দেশে বর্তমানে মোট সরকারি রাজস্বের প্রায় ৮৫ ভাগই আসে কর-রাজস্ব থেকে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বাজেটে এ খাতের অবদান বেড়েছে। তবে ২০১৬ সালে এ খাতের অবদান ভিত্তি বছরের ৬৩ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৬০ শতাংশে এবং২০১৭ সালের বাজেট অর্থায়নে কর খাতের অবদান ২০২০ এর মাইল ফলক ছাড়িয়ে গেছে।

### সারণি ১৭.২: অভ্যন্তরীণ কর দিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজেট অর্থায়নের অনুপাত (%)

| সূচক | ২০১০ | ভিত্তি-বছর (২০১৫) | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|
| ১৭.১.১ উৎস অনুযায়ী জিডিপির অনুপাতে মোট সরকারী রাজস্ব | ১০.৪ | ৯.৬ (এফডি, অর্থবছর ১৫) | ১০.২৬ | ১০.১৬ |
| ১৭.১.২ অভ্যন্তরীণ রাজস্বে অভ্যন্তরীণ বাজেট অর্থায়নের অনুপাত | ৬০.৮ | ৬৩ (এফডি, অর্থবছর১৫) | ৬০.৬ | ৬৬.৪ |

*উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়*

### *সূচক ১৭.৩.১ মোট আভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগীতার পরিমাণ*

বাংলাদেশের বাজেট ব্যয় অর্থায়নে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং সরকারি উন্নয়ন সহায়তাসহ বিভিন্ন বৈদেশিক উৎস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মোট বাজেট অর্থায়নের প্রায় ১৫ ভাগ এসব উৎসের অবদান। ২০১৬ সালে নীট সরকারি উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ ছিল ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৬.৭ শতাংশ বেশি। কিন্তু দেশের মোট বার্ষিক বাজেটে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার অবদান ২০১৫ সালের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ ৯ শতাংশ স্তরের চেয়ে কম হারে কমেছে এবং ২০১৩-১৪ সালে মোট বাজেটে অবদানের ভিত্তিতে পৌঁছেছে ৯.৯ শতাংশ স্তরে। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার প্রবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুত গতিতে জাতীয় বাজেটের প্রবৃদ্ধির আকার বাড়ছে ।

### সারণি ১৭.৩: বার্ষিক বাজেটে বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য

| | ২০১০ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাজেট (বিলিয়ন ইউএস ৳) | ১৮.২৭ | ২৩.৬৯ | ২৭.৮২ | ৩০.৮৬ | ৩৩.৮১ | ৩৩.৮০ | ৩৩.৮৬ |
| ওডিএ (বিলিয়ন ইউএস ৳) | ১.৭৮ | ২.০৬ | ২.৭৬ | ৩.০৫ | ৩.০১ | ৩.৫৩ | ৩.৬৮ |
| অভ্যন্তরীণ বাজেটের শতাংশ হিসাবে ওডিএ | ৯.৭ | ৮.৭ | ৯.৯ | ৯.৯ | ৮.৯ | ৯.৬ | ১০.৯ |

*উৎস: অর্থ মন্ত্রালয়*

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এফডিআই প্রবাহ বার্ষিক গড়ে প্রায় ১৭ শতাংশ হারে বেড়েছে তবে সরকারি বাজেটের অনুপাতে এফডিআই মোটামুটি ৫ শতাংশে স্থির রয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৭ সালে এসে এফডিআই এর পরিমাণ এবং মোট বাজেটের অনুপাত উভয়ই বেড়েছে, যদিও ২০৩০ সালের মাইলফলক অর্জন এখনো কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা হিসেবেই রয়ে গেছে। এফডিআই বিষয়ক আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখকরা যায়, তা হলো– দেশীয় বিনিয়োগের অর্থায়নে এফডিআই এর অংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশীয় বিনিয়োগে এফডিআই এর অর্থায়ন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় কোনো প্রবণতা ছাড়াই প্রায় ৩.২ শতাংশের মধ্যে ওঠা-নামা করেছে। সুতরাং দেশে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে একটি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

### সারণি ১৭.৪: বার্ষিক বাজেটে এফডিআই এর অনুপাত

| | অর্থবছর ১২ | অর্থবছর ১৩ | অর্থবছর ১৪ | অর্থবছর ১৫ | অর্থবছর ১৬ | অর্থবছর ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এফডিআই (বিলিয়ন ইউএস ৳) | ১.১৯ | ১.৭৩ | ১.৪৪ | ১.৮৩ | ২.০০ | ২.৫ |
| বাজেটের শতাংশ হিসাবে এফডিআই | ৫.০ | ৬.২ | ৪.৭ | ৫.৪ | ৫.৯ | ৭.৪ |
| বিনিয়োগে এফডিআই (শতাংশ) | ৩.২ | ৪.১ | ২.৯ | ৩.২ | ৩.০ | ৩.২ |

*উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়*

### *সূচক ১৭.৩.২ মোট জিডিপির অনুপাতে রেমিটেন্সের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)*

২০১০ সাল থেকে রেমিটেন্সের বার্ষিক প্রবাহ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে এবং ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ প্রায় ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছায়। কিন্তু পরবর্তী দুই বছরে এর পরিমাণ অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে। জিডিপির অনুপাতে রেমিটেন্স প্রবাহের এই নিম্নগামী হার সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় পৌছায় ২০১৭ সালে। এই প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের মাইলফলক (১৪ শতাংশ) অর্জন খুব উচ্চভিলাষী বলে মনে হয়।

**সারণি ১৭.৫: জিডিপিতে রেমিট্যান্স এর অনুপাত**

| সূচক | অর্থবছর ১০ | অর্থবছর ১২ | অর্থবছর ১৩ | অর্থবছর ১৪ | অর্থবছর ১৫ | অর্থবছর ১৬ | অর্থবছর ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেমিট্যান্স (বিলিয়ন ইউএস ৳) | ১০.৮৫ | ১২.৮ | ১৪.৫ | ১৪.২ | ১৫.৩ | ১৪.৯ | ১২.৮ |
| জিডিপির অংশ হিসাবে রেমিট্যান্স (%) | ৮.৪ | ৯.৬ | ৯.৭ | ৮.২ | ৭.৯ | ৬.৭ | ৫.১ |

*উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়*

### *সূচক ১৭.৪.১ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা রফতানির অনুপাতে ঋণ সেবা*

এই সূচক মোট রফতানি আয়ে ঋণ সেবা, সুদ এবং প্রদত্ত মূল অর্থের (প্রিন্সিপাল পেমেন্ট) অনুপাত পরিমাপ করে। ঋণ সেবা পরিশোধের বিরাট অংক প্রকৃতপক্ষে সরকারের উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির সক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্থ করে। আনন্দের কথা যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঋণসেবা বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০১২ সালে ঋণের বোঝা ছিল প্রায় ৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে যা নেমে আসে ৪.৬ শতাংশে। অর্থবছর ২০১৭তে এই বোঝার হার আরো কমে প্রায় ৩.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ঋণ পরিশোধ পরিস্থিতির চিত্তাকর্ষক উন্নয়নে দুটো উপাদান কাজ করেছে- একদিকে নিম্ন সাহায্য প্রবাহ ও অন্যদিকে অব্যাহত রপ্তানি বৃদ্ধি। ফলশ্রুতিতে ২০২০ এমনকি ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭ সালের মধ্যেই অর্জিত হয়ে গেছে।

**সারণি ১৭.৬: রফতানি অনুপাতে ঋণ পরিশোধ**

| সূচক | অর্থবছর ১২ | অর্থবছর ১৩ | অর্থবছর ১৪ | অর্থবছর ১৫ (ভিত্তি-বছর) | অর্থবছর ১৬ | অর্থবছর ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.৪.১ দ্রব্য ও সেবা রপ্তানির অনুপাতে ঋণ পরিশোধ (শতাংশ) | ৭.০ | ৮.৬ | ৬.৪ | ৫.১২ | ৪.৬ | ৩.২৪ |

*উৎস: অর্থ মন্ত্রাণালয়*

### *সূচক ১৭.৬.২ গতিভেদে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে স্থায়ী ব্রডব্যান্ড গ্রহীতার সংখ্যা*

এই সূচক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ সুবিধার স্তর এবং বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ভাগাভাগির সুযোগের সহজলভ্যতা নির্দেশ করে। স্থায়ী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা জ্ঞান অনুসন্ধান এবং শেয়ারিংয়ের অবারিত সুযোগ প্রদান করে। দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রহীতার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২০১৬ সালে প্রতি ১০০ জনে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা হিসেব করা হয়েছে ৩.৭৭; ২০১৪ সালের তুলনায় যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সময়ের মধ্যে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের হার বেড়েছে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৫৪.৯ শতাংশ এবং ২০১৫-১৬ সময়ের মধ্যে ৫৬.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলতেই হয় যে, ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই অবদান দারুণ বিস্ময়কর। এই সূচক অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশের লক্ষ্য অর্জনে বাকী বছরগুলাতে বার্ষিক মাত্র ১২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন এবং আশা করা যায় সেটা সম্ভবপর।

**সারণি ১৭.৭: স্থায়ী ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রহণ**

| সূচক | ২০১০ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ভিত্তি বছর [২০১৫] | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.৬.২ গতি ভেদে প্রতি একশত বাসিন্দার স্থায়ী ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রহণ | ০.২৭ | ০.৩৯ | ০.৯৭ | ১.৯৫ | ২.৪১ (বিএরটিসি, ২০১৫) | ৩.৭৭ | ঘঅ |

*উৎস: ডব্লিউডিআই, বিশ্বব্যাংক ২০১৭, এবং বিটিআরসি ২০১৫*

### *সূচক ১৭.৮.১ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা*

এই সূচক আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবিধা পরিমাপ করে। এই সূচক অনুযায়ী দেশে ইন্টারনেট সেবা ব্যবহাকারী মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ২০১০ সালের ৩.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে তা ২০১৫ সালে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০.৩৯ শতাংশ। এই নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে ২০১৭ সালে পৌছে গেছে প্রায় ৫০ শতাংশে; তার অর্থ দাঁড়ায়, ২০১৬ সালেই ২০২০ সালের মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে।

সারণি ১৭.৮: ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অনুপাত (%)

| সূচক | ২০১০ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ভিত্তি-বছর [২০১৫] | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.৮.১ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ব্যাক্তির অনুপাত | ৩.৭ | ৫.০ | ৬.৬ | ১৩.৯ | ৩০.৩৯ (বিটিআরসি, ২০১৫) | ৪১.৪ | ৪৯.৫ |

*উৎস: বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন সূচক ২০১৭, এবং বিটিআরসি থেকে হিসাব করা*

### *সূচক ১৭.৯.১ অঙ্গীকার অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন ডলারে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মূল্য (উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমাত্রিক সহযোগীতার মাধ্যমেসহ)*

এই সূচকও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কী পরিমান আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তার দরকার তা মূল্যায়নে সহযোগীতা করে। সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে এমন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩ সাল থেকে ডলারের ভিত্তিতে সহায়তার পরিমাণ কমছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে সহায়তার প্রতিশ্রুতি ছিল মোট ৫৩০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।কিন্তু ২০১৭ সালে এসে এক লাফে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৭৭.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি।

**সারণি ১৭.৯: বাংলাদেশের প্রতিশ্রুত কারিগরী সহয়তার ডলার মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)**

| সূচক | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ভি-ত্তি-বছর [২০১৫] | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| উন্নয়শীল দেশে প্রতি প্রতিশ্রুত আর্থিক ও কারিগরী সহয়তার ডলার মূল্য (উত্তর দক্ষিণ, দক্ষিণ- দক্ষিণ এবং ত্রিমুখী সহযোগীতা) (মিলিয়ন ডলার) | ৫৮৮.০ | ৭২৬.৩ | ৬৮০.৭ | ৫৭০.৮ | ৫৩০.৬ | ৩৬৭৭.২৯ |

*উৎস: ইআরডি*

### *সূচক ১৭.১২.১ উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র-দ্বীপরাষ্ট্র কর্তৃক মোকাবেলা করা প্রদত্ত গড় শুল্কহার*

শুল্ক হলো বাণিজ্যের ওপর আরোপিত একটি প্রতিবন্ধকতা, যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার উন্মুক্ত প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে প্রাধিকারমূলক শুল্কহার সুবিধা ভোগ করে। একইসাথে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির সদস্যপদ থাকায় বাংলাদেশ রফতানির ক্ষেত্রেও বিশেষ শুল্কহার সুবিধা পায়। ২০১১ সালে, উন্নত দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্য এবং বস্ত্র ও পোশাক খাতে আরোপিত গড় শুল্কহার ছিল ০-৯ শতাংশের মধ্যে যা ২০১৫ সালের ১২ শতাংশ থেকে অনেকটা কম। এই সূচক স্পষ্ট করে যে, আমদানিকারক দেশেআরও বাণিজ্যকরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যেই এসডিজির লক্ষ্যে পৌছে যাবে।

সারণি ১৭.১০: গড় পড়তা শুল্ক হার

| সূচক | ২০১০ | ভিত্তি-বছর (২০১৫) | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| উন্নয়নশীল স্বল্পউন্নত এবং ক্ষুদ্রদ্বীপ দেশেগুলোর গড় শুল্ক | ১২% | ক) এমএফএন: ৮.২৫<br>খ) প্রাধিকারমূলক: ৩.৮৮%<br>(এমওসি, ২০১৪) | ক) এমএফএন: বাংলাদেশের জন্য (১০.৫% ) এমএফএন (১৩.২৫%) ভারকৃত শুল্ক<br>খ) প্রাধিকারমূলক: ৯.৪৭%<br>(এমওসি, এসআইআর, ২০১৮) |

*উৎস: এমওসি, এসআইআর, ২০১৮*

### *সূচক ১৭.১৯.২ (ক) গত ১০ বছরে অন্তত একটি আদমশুমারি ও গৃহগণনা পরিচালিত হয়েছে এবং (খ) শতভাগ জন্মনিবন্ধনসহ ৮০ ভাগ মৃত্যু নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন দেশের অনুপাত*

যদিও দেশের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের একটি লম্বা ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু কখনোই এই কর্মসূচি খুব একটা সফলতার মুখ দেখেনি। ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ৮ ভাগ মানুষ নিবন্ধন করেছিল। স্মর্তব্য যে, ২০০৪ সালে বাংলাদেশ "জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪" চালু করে, ২০০৬ সালে যা বাস্তবায়ন শুরু হয়। নিবন্ধন কার্যক্রম আরো টেকসই করতে ২০১৩ সালে এই আইন আরো সংশোধন করা হয়। ২০১০ সাল থেকে অনলাইন জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এই সকল উদ্যোগ জন্মবিন্ধন কার্যক্রমের বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনকৃত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৩৯.৮ মিলিয়ন, যা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মোটামুটি প্রায় ৮৬ ভাগ। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগেই ২০০৬ সালে জন্মনিবন্ধনের হার ছিল মাত্র ৯.৮ ভাগ এবং ২০১১ সালে ছিল ৩১ ভাগ। এতদ্বসত্ত্বেও, হাসপাতালের বাইরে জন্ম নেওয়া প্রায় ৮০ ভাগ শিশুর জন্ম এই কাজকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলছে। তবে একই আইনের আওতায় মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। ২০১৫ সালের তথ্য অনুসারে, মোট মৃত্যুর মাত্র ৪৯ শতাংশ নথিভুক্ত করা হয়েছে।

## ১৭.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ

উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের দারুণ কৃতিত্ব সত্ত্বেও এখনো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বিশেষ করে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রাপ্ত বিভিন্ন ধারণা ও তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, দেশীয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এখনো কর জালের (ট্যাক্স নেট) বাইরে রয়ে গেছে। এটা সত্য যে চলতি বছরে করদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, এরপরও প্রায় দ্বিগুন মানুষ কর জালের বাইরে রয়ে গেছে।

এদিকে আবার সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় লোকবল এবং কারিগরি সক্ষমতায় ঘাটতির কারণে ভ্যাট সংগ্রহ কার্যক্রম শক্তিশালী করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যে কাজটি আপাতদৃষ্টে বেশ কঠিন।

এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনাও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজেট ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারি উন্নয়ন সহায়তা বৈদেশিক সম্পদের একটি বড় উৎস। সাম্প্রতিক সময়ে মোট জাতীয় বাজেটের আকারের তুলনায় সরকারি উন্নয়ন সহায়তার অবদান কমে আসছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নাম লেখানোয় ভবিষ্যতে কম সুদে ঋণ প্রাপ্তি এবং বিভিন্ন সহায়তা বরাদ্দ পেতে আরো বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

এদেশে রেমিটেন্সের উৎস খুব বেশি বহুমুখী নয়। প্রচলিত বৈদেশিক শ্রম বাজারে বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করতে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেই চলেছে। অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়েও গভীর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের ঘাটতির কারণে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুব বেশি নিবন্ধন হচ্ছে না। জ্বালানী ও গ্যাসের সুবিধা, সম্পত্তির নিবন্ধন এবং মেধাসত্ত্ব অধিকার ইত্যাদির অভিযোগ বৈদেশিক বিনিয়োগ কম হওয়ার পেছনে প্রধানত দায়ী। তবে দেশের ভেতরেসৃষ্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহ বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## ১৭.৪ সারাংশ

দেখা যায় যে, যে সকল সূচকের পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে , এসডিজি বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যে এসব সূচকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে এবং লক্ষ্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে সঠিক পথেই এগোচ্ছে। করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দূরদর্শী কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে জিডিপির অনুপাতে সরকারি রাজস্ব আনুমানিক হারের চেয়েও বেশি পরিমাণে বেড়েছে। সরকারি উন্নয়ন সহায়তার প্রাপ্ত তথ্য দেখায় যে, এক্ষেত্রে পরিমিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট জাতীয় বাজেটে এর অবদান প্রান্তিকভাবে কমে গেছে। এফডিআই এবং রেমিটেন্স অন্তঃপ্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য সূচক যেমন– ইন্টারনেট সুবিধা এবং ইন্টারনেট সেবা ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক হারে বেড়েছে। অপটিকস ক্যাবল নেটওয়ার্কের বিস্তার এবং অপটিক্যাল ফাইবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোর অর্জন নির্ভর করে বৈদেশিক সম্পদসহ সব ধরনের সম্পদের যথাযথ লভ্যতার ওপর। স্মরণ করা দরকার যে, এসডিজির ১৬৯টি লক্ষ্যের মধ্য থেকে ৪১টি লক্ষ্য অর্জনে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই অভীষ্ট যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির মতো একটি সমন্বিত এবং সর্ববেষ্টিত এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সময়মত পর্যাপ্ত সহায়তা দান করা ।

# তথ্যপঞ্জি

1. Abedin, Md. Anwarul and M. Jahiruddin, 2015, Waste generation and management in Bangladesh: An overview. Asian J. Med. Biol. Res. 2015, 1 (1), 114-120

2. ADB and ILO, 2016, Bangladesh: Looking beyond Garments

3. Ahmed, Nazneen, 2018, 'Responsible food habit: Role of individual and the state' paper presented at a seminar organised by the Right to Food, Bangladesh on 30 November 2016.

4. Ahmed, Sadiq, 2017, Urbanization and Development, in Ahmed, Sadiq, Evidence Based Policy Making in Bangladesh, Chapter 8, Policy Research Institute (PRI).

5. Ahsan, M. M., Aziz, N. and Morshed, H. M., (2016). Assessment of Management Effectiveness of Protected Areas of Bangladesh. SRCWP Project. Bangladesh Forest Department

6. BBS,2012, Time Use Survey

7. BBS, 2015, Impact of Climate Change on Human Life (ICCHL)

8. BBS , 2016, Report on Violence Against Women (VAW) Survey 2015

9. BBS ,2017, Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2016

10. BBS and UNICEF (2014). Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013, Progotir Pathey: Final Report. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and UNICEF Bangladesh, 2014, Dhaka, Bangladesh.

11. Brundtland, Gro Harlem and World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.

12. CPD, 2015-16, 'New Dynamics in Bangladesh's Apparels Enterprises: Perspectives on Restructuring, Upgradation, and Compliance Assurance'.

13. CEGIS (2017). National Action Plan for Achieving SDG-6. Report preparation facilitated by Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) for Ministry of Water Resources. March 2017

14. Chakraborty T.R. and Hossin, S. (2016). Community Hint on the Conservation of Biodiversity of the Bay of Bengal. The Bay of Bengal: A Forgotten Sea - The Proceeding of the Symposium on the Bay of Bengal. Yangoon, Myanamar, 4 February 2016.

15. Choudhury, Rasheda K./ and Mostafizur Rahaman, 2015, Education for All Realities, Achievements and Challenges: The Story of Bangladesh https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&id_artikel=ART101695

16. DGHS (2016). EPI Surveillance 2016

16 DOE, Air Quality Strategy for Bangladesh 2012 SDG 11

17 DPHE (2016). Sustainable Development Goal 6.1; Universal and Equitable Access to Safe and Affordable Drinking Water for All; Concept Paper – Bangladesh. Department of Public Health Engineering, Government of the People's Republic of Bangladesh.

18 DPHE (2016b). Concept Paper on SDG's Target 6.2 - Access to Adequate and Equitable Sanitation and Hygiene. Department of Public Health Engineering, Government of the People's Republic of Bangladesh.

19 DOE (2015). Biodiversity National Assessment 2015 - Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity. Department of Environment, Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. November 2015.

20 DOE (2015). Biodiversity National Assessment 2015 - Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity. Department of Environment, Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. November 2015.

21 Enayetullah, Iftekhar and Q. S. I. Hashmi , 2006, Community Based Solid Waste Management Through Public-Private-Community Partnerships: Experience of Waste Concern in Bangladesh, PPT presentation at Asia Conference Tokyo, Japan, October 30 to November 1, 2006

22 ERD (2018). Journey with Green Climate Fund: Bangladesh's Country Programme for Green Climate Fund. Economic Relations Division, Ministry of Finance, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh.

23 ERD (2018a)."Improving Urban Services Delivery for Sustainable Development" paper presented in Bangladesh Development Forum 2018, held in Dhaka on 17-18 January 2018, organized by ERD (http://erd.gov.bd/../bd-Development-Forum-2018-17-18 January).

24 ERD (2018b). Speech by Honorable Minister of Finance delivered in Bangladesh Development Forum 2018 held in Dhaka on 17-18 January 2018, organized by ERD (http://erd.gov.bd/../bd-Development-Forum-2018-17-18 January).

25 Farjana Nasrin,2016, Waste Management in Bangladesh: Current Situation and Suggestions for Action, Int. Res. J. Social Sci. Vol. 5(10), 36-42, October (2016)

26 FAO, 2015, Food Loss and Waste Facts (http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/).

27 FAO, 2014, Opportunities and Strategies for Ocean and River Resources Management. Background paper for preparation of the 7th Five Year Plan - Submitted to Food and Agriculture Organization of the United Nations Bangladesh Country Office, Dhaka, Bangladesh. December 2014.

28 FAO, 2016, Strategic Review of Food Security and Nutrition in Bangladesh.

29 General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh (2015); Seventh Five Year Plan 2016-2020. General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. December 2015.

30 General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2015, Millennium Development Goals - Bangladesh Progress Report 2015.

31 General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2017, Education Sector Strategy and Actions for Implementation of the 7th Five Year Plan (FY2016-20) 2017

32 General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, undated, Implementation Review of the Sixth Five Year Plan and its Attainments

33 General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2013, National Sustainable Development Strategy 2013

34 Haque, Syed E., A. Tsutsumi, and A. Capon. 2014. Sick Cities: A Scenario for Dhaka City. International Institute of Global Health, UN University (http://ourworld.unu.edu/en/sick-cities-a-scenario-for-dhaka-city).

35 Health Effects Institute (2017). State of Global Air Report 2017, cited in the Daily Star on 17 February 2017.

36 Hossain, Moazzem.2018. Economic Impact of Dhaka Traffic, Accident Research Institute, BUET (https://www.dhakatribune.com/.../dhaka/.../study-dhaka-traffic-wastes-5-million-work...)

37 ICAI (2011); The Department for International Development's Climate Change Programme in Bangladesh, Report 3. Independent Commission for Aid Impact. November 2011.

38 International Labour Organisation (ILO).2017. Global Estimates of Child Labour 2017

39 International Union for Conservation of Nature, Bangladesh Country Office, Dhaka, Bangladesh

40 Iqbal, Kazi and M,N,Ferdaus Paban.2018.Jobless Growth, Really?, The Fianacial Express, 23 May, 2018. thefinancialexpress.com.bd/views/analysis/jobless-growth-really-1527087717Cached

41 IUCN, 1980,World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Integrated Non-formal Education Program (INFEP)'Development

42 IUCN (2017). Red List Indices of Seven Animal Groups of Bangladesh.

43 IUCN Blog. Accessed on <https://www.iucn.org/news/bangladesh/201704/blog-red-list-indices-sevenanimal-groups-bangladesh>, IUCN, International Union for Conservation of Nature.

44 IUCN Bangladesh (2015). Red List of Bangladesh Volume 1: Summary. IUCN,

45 Learning Assessment of Secondary Schools (LASI) 2015, Prepared by Australian Council for Educational Research for Monitoring and Evaluation Wing, Directorate of Secondary and Higher Education, Bangladesh, 2016

46 Limits to Growth published by the Club of Rome (1972)

47 Nath, B. C., M. A. Hossen, A. K. M. S. Islam, M. D. Huda, S. Paul, M. A. Rahman, 2016, Postharvest Loss Assessment of Rice at Selected Areas of Gazipur District, Bangladesh Rice Journal. 20 (1) : 23-32, 2016

48 OECD, 2016, Improving the Evidence Base on the Costs of Disasters: Key Findings from an OECD Survey

49 Osmani, S. R., Akhter Ahmed, Tahmeed Ahmed, Naomi Hossain, Saleemul Huq, and Asif Shahan, 2016, Strategic Review of Food Security And Nutrition In Bangladesh, World Food Program, Dhaka

50 Pedercini, Matteo and Steve Arquitt, 2016, An Interactive Learning Model for Implementing the Sustainable Development Goals, The Millennium Institute, Washington DC, USA

51 Shahidur R. Khandker, M, A. Baqui Khalily, and Hussain A. Samad, 2016, Beyond Ending Poverty: The Dynamics of Microfinance in Bangladesh, World Bank, Wasington D. C.

52 Save the Children. 2017. Position Paper on Urban Resilience: Humanitarian Sector, Bangladesh.

53 SREDA and Power Division 2015, Energy Efficiency and Conservation Master Plan (2015-2030)

54 Tyers, Alexandrsa, 2011, A gender digital divide? Women learning English through ICTs in Bangladesh (ceur-ws.org/Vol-955/papers/paper_16.pdf)

55 UN (2017). The Sustainable Development Goals Report 2017. United Nations, New York.

56 UNAIDS,UNAIDS DATA 2017, www. Unaids.org/sites/default/files/media_asset.20170720_Data_book_2017_en.pdf

57 UNDP (2018). The Sustainable Development Goals. Goal 13: Climate Action. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html

58 UNICEF-WHO (2017). Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF), 2017.

59 UNICEF-WHO, 2015. Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment. New York, USA

60 UNWATER (2016). Integrated Monitoring Guide for SDG 6 - Targets and global indicators. Version 19 July 2016.

61 UN (2017). The Sustainable Development Goals Report 2017. United Nations, New York.

62 UNDP (2018). The Sustainable Development Goals. Goal 13: Climate Action. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html

63 UN (2017). The Sustainable Development Goals Report 2017. United Nations, New York.

64 UNDP (2018). The Sustainable Development Goals. Goal 13: Climate Action. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html

65 UN (2017). The Sustainable Development Goals Report 2017. United Nations, New York.

66 UNDP (2018). The Sustainable Development Goals. Goal 13: Climate Action. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html

67 World Bank, 2013, An Assessment of Skills in the Formal Sector Labour Market in Bangladesh

## সংযুক্তি: এসডিজি: চকিত দৃষ্টিতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশের অগ্রগতি

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| এসডিজি ১: দারিদ্র্য বিলোপ) | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ১.১ চরম দারিদ্রের অবসান (< ১.৯০ ডলার প্রতিদিন অর্জনকারী জনসংখ্যা) | | | | |
| ১.১.১ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত | ১৮.৫ (বিশ্বব্যাংক, ২০১০) | ১৩.৮ (বিশ্বব্যাংক, ২০১৭) | ৯.৩০ | যথাযথ (অনট্র্যাক) |
| লক্ষ্যমাত্রা ১.২ জাতীয় পরিমাপে দারিদ্র্য অন্তত অর্ধেকে কমিয়ে আনা | | | | |
| ১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্য রেখায় উঁচু দরিদ্রের অনুপাত কমপক্ষে অর্ধেক হ্রাস করা | ২৪.৩ (খানা আয়- ব্যয় জরিপ ২০১৬) | ২৩.১ (বিবিএস, ২০১৭) | ১৮.৬ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| ১.২.২ নিচু দারিদ্র্য রেখার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত (চরম দরিদ্র) | ১২.৯ (খানা আয়- ব্যায় জরিপ ২০১৬) | ১২.১ (বিবিএস, ২০১৬) | ৮.৯ | যথাযথ আছে |
| লক্ষ্যমাত্রা ১.৩ যথোপযুক্ত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং দারিদ্র্য ও অরক্ষিতদের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি অর্জন | | | | |
| ১.৩.১ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত: কর্মসূচিতে থেকে সুবিধাভোগী খানা | ২৪.৬ ২৪.৬ (খানা আয়- ব্যায় জরিপ, ২০১০) | ২৭.৮ ২৮.৭ (খানা আয়-ব্যায় জরিপ, ২০১৬) | প্রাপ্ত নয় | হালনাগাদ তথ্যের অভাব |
| লক্ষ্যমাত্রা ১.ক.২ প্রয়োজনীয় সেবায় মোট সরকারী ব্যয়ের অনুপাত | | | | |
| স্বাস্থ্য | ৪.৮ | ৬.৫ | ৫ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন |
| শিক্ষা | ১২.৮ | ১৪.৪ | ১৫ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| সামাজিক সুরক্ষা | ১২.৭ (এফডি, ২০১৪-১৫) | ১৫.৩ (এফডি, ২০১৬-১৭) | ১৫ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন |
| এসডিজি ২: ক্ষুধা মুক্তি | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ২.১ ক্ষুধা নিবারণ এবং বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্যে সুযোগ নিশ্চিতকরণ | | | | |
| ২.১.১ ১৫-৪৯ বছর বয়স্ক নারীদের মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা (%) | ২৪ (বিডিএইচএস, ২০১১) | ১৯ (বিডিএইচএস, ২০১৪) | | সাম্প্রতিক তথ্যের অভাব |
| ২.২ পাঁচ বছরে নিচে শিশুদের খর্বতা এবং কৃশতা লক্ষ্য মাত্রা অর্জনসহ সকলপ্রকার অপুষ্টির অবসান | | | | |
| ২.২.১ কৃশতার অনুপাত (%) | ৪১ (বিডিএইচএস, ২০১১) | ৩৬ ((বিডিএইচএস, ২০১৪) | ২৫ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| ২.২.১ কৃশতার অনুপাত (%) | ১৬ (বিডিএইচএস, ২০১১) | ১৪ (বিডিএইচএস, ২০১৪) | ১২ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| ২.ক.১ কৃষিমুখীতার সূচক (%) | ০.৫৬ (এফএও, ২০১৪) | ০.৫৩ (এফএও, ২০১৫) | ০.৮ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| ২.ক.২ কৃষিখাতে মোট বৈদেশিক সরকারি অর্থ প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ২১৫ (ইআরডি, ২০১৫) | ২১০.২ (ইআরডি, ২৯১৭) | ৩০০ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ্যও কল্যাণ | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৩.১ মাতৃমৃত্যুর অনুপাত হ্রাস করা | | | | |
| ৩.১.১ প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত | ১৮১ (এসভিআরএস, ২০১৫) | ১৭২ (এসভিআরএস, ২০১৭) | ১০৫ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ৩.১.২ জন্মকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি (%) | ৪২.১ (বিডিএইচএস, ২০১৪) | ৫০ (বিএমএমএইচসিএস, ২০১৬) | ৬৫ | যথাযথ আছে |
| লক্ষ্যমাত্রা ৩.২ নবজাতক ও < ৫ বছরের নিচে শিশুদের নিবারণীয় মৃত্যুর অবসান | | | | |
| ৩.২.১ প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে < ৫ মৃত্যুর হার | ৩৬ (এসভিআরএস, ২০১৫) | ৩১ (এসভিআরএস, ২০১৭) | ৩৪ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| ৩.২.২ প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুর হার | ২০ (এসভিআরএস, ২০১৫) | ১৭ (এসভিআরএস, ২০১৭) | ১৯ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| লক্ষ্যমাত্রা ৩.খ. গবেষণা ও উন্নয়নে সহয়তা | | | | |
| ৩.খ.২ স্বাস্থ্য গবেষণা এবং মৌলিক স্বাস্থ্য খাতে মোট নীট ওডিএ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ১৭৭.৪ (ইআরডি, ২০১৫) | ২৫২.৫ (ইআরডি, ২০১৭) | ৩০০ | যথাযথ (অন ট্র্যাক) |
| এসডিজি ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাসম্পূর্ণ গুনগত শিক্ষা | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৪.২ সকল ছেলে ও মেয়েদের জন্য প্রাক-শৈশব গুনগত উন্নয়নে, পরিচর্যা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ | | | | |
| ৪.২.২ জেন্ডার ভেদে সংঘটিত বিদ্যার্জনে অংশগ্রহণের হার (প্রাথ মিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণে সরকারী বয়সের ১ বছর আগে) | ছেলে:৩১<br>মেয়ে:৩১.৫<br>(ডব্লিউডিআই, ২০১৫) | ছেলে:৩৩.৭<br>মেয়ে:৩৪.৯<br>(ডব্লিউডিআই, ২০১৬) | ছেলে:৮০<br>মেয়ে:৮০ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| লক্ষ্যমাত্রা ৪.৫ শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্যের অবসান | | | | |
| জেন্ডার প্রাথমিক সূচক: প্রাথমিক | ১.০৮ | ১.০৬ | ১.০ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| জেন্ডার প্রাথমিক সূচক: মাধ্যমিক | ১.১২৯ | ১.১০৫ | ১.১৪ | যথাযথ আছে |
| জেন্ডার প্রাথমিক সূচক:<br>উচ্চ শিক্ষা<br>ঞবৎঃরধৎু | ০.৭৩৭* | ০.৭০১ | ০.৭০ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| জেন্ডার প্রাথমিক সূচক: কারিগরী | ০.৩১৫ | ০.৩১৫ | ০.৪১ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| | (ডব্লিউডিআই, ২০১৫)<br>(ডব্লিউডিআই, ২০১৪)* | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৪.গ: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি | | | | |
| ৪.গ.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিপিইডিসি-ইন-ইডি শিক্ষকের অনুপাত | সব:৮২<br>ছেলে:৮০<br>মেয়ে:৮৬<br>(এমওপিএমই, ২০১৫) | সব:৯৪.৩<br>ছেলে:৯৪.৮<br>মেয়ে:৯৪.১<br>(এমওপিএমই, ২০১৮) | সব:৮২<br>ছেলে:৮০<br>মেয়ে:৭৫ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ নারীর পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সকল ক্ষেত্রের নৈতৃত্বে সমান সুযোগ | | | | |
| ৫.৫.১ জাতীয় সংসদে নারী আসনের অনুপাত | ২০.২১ (বিপিএস, ২০১৫) | ২০.৫৭ (বিপিএস, ২০১৭) | ৩৩ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| এসডিজি ৬: পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের প্রাপ্তি ও টেকসই ব্যাবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৬.১: ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাবার পানিতে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক সুযোগের লক্ষ্য অর্জন | | | | |

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| লক্ষ্যমাত্রা ৬.১.১ নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত | ৮৭ (%) (ইউএনজেএমপি, ২০১৫) | প্রাপ্ত নয় | ১০০% | যথাযথ। যাইহোক, পানযোগ্য পানির উৎসের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেই অনুযায়ী মাত্র ৫৫.৭ শতাংশ জনগণের এই সুযোগ আছে (ইউএন-এসকাপ বার্ষিক পরিসংখ্যান বই ২০১৭) |
| লক্ষ্যমাত্রা ৬.২: নারী ও মেয়ে সহ অরক্ষিত পরিস্থিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে সুযোগ নিশ্চিত করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো | | | | |
| ৬.২.১ হাত ধোয়ার সাবান ও পানি সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত | ৬১ (%) (ইউএনজেএমপি, ২০১৫) | প্রাপ্ত নয় | ৭৬% | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| এসডিজি ৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৭.১ মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিতকরণ | | | | |
| ৭.১.১ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত | ৭৫.৯২ (বিবিএস, ২০১৬) | ৮৫.৩ (বিবিএস, ২০১৭) | ৯৬ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| ৭.১.২ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত | ১৬.৬৮ (বিশ্বব্যাংক, ২০১৫) | ১৭.৭২ (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬) | ২৫ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| লক্ষ্যমাত্রা ৭.২ বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা | | | | |
| ৭.২.১ চূড়ান্ত জ্বালানী ভোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ | ২.৭৯ (এসআরইডিএ, ২০১৫) | ২.৮৭ (এসআরইডিএ, ২০১৭) | ১০ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| এসডিজি ৮: অব্যাহত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শোভন কাজ | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৮.১ জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা | | | | |
| ৮.১.১ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%) | ৫.১৪ (বিবিএস, ২০১৫) | ৬.০৫ (বিবিএস, ২০১৭) | ৬.৭ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ বহুমুখীতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন | | | | |
| ৮.২.১ প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%) | ৪.৪৯ (আইএলও, ২০১৫) | ৫.০ (বিবিএস, ২০১৭) | ৫.০ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| লক্ষ্যমাত্রা ৮.৩ উন্নয়নমূলক নীতিমালা প্রবর্তন যা উৎপাদনশীল কর্মকান্ড, শোভন কাজ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন সমর্থন দিবে এবং আনুষ্ঠানিকতাকে উৎসাহ যোগাবে | | | | |
| ৮.৩.১ জেন্ডার ভেদে অ-কৃষি কাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত | উভয়:৭৭.৮<br>পুরুষ:৭৫.২<br>নারী:৮৮.৭<br>(কিউএলএফএস, ২০১৫-১৬) | উভয়:৭৮.০<br>পুরুষ:৭৬.০<br>নারী:৮৫.৫<br>(কিউএলএফএস, ২০১৬-১৭) | উভয়: ৭৫ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| লক্ষ্যমাত্রা ৮.৫ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন | | | | |
| ৮.৫.১ পুরুষ ও নারীর গড় মাসিক উপার্জন (টাকা) | উভয়:১২,৮৯৭<br>পুরুষ:১৩,১২৭<br>নারী:১২,০৭২<br>(কিউএলএফএস, ২০১৫-১৬) | উভয়:১৩,২৫৮<br>পুরুষ:১৩,৫৮৩<br>নারী:১২,২৫৪<br>(কিউএলএফএস, ২০১৬-১৭) | উপার্জনে ২০% বৃদ্ধি | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| ৮.৫.২ জেন্ডার ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে, বেকারত্বের হার | উভয়:৪.২<br>পুরুষ:৩.০<br>নারী:৬.৮<br>(কিউএলএফএস, ২০১৫-১৬) | উভয়:৪.২<br>পুরুষ:৩.১<br>নারী:৬.৭<br>(কিউএলএফএস, ২০১৬-১৭) | উভয়:৪.০<br>পুরুষ:২.৭<br>নারী:৪.২ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| লক্ষ্যমাত্রা ৮.৬ কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকের অনুপাত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা | | | | |
| ৮.৬.১ শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এমন যুবকদের (১৫-২৪ বছর বয়স্ক) অনুপাত (%) | উভয়:২৮.৮৮<br>পুরুষ:৯.৯<br>নারী:৪৬.৯<br>(কিউএলএফএস, ২০১৫-১৬) | উভয়:২৯.৮<br>পুরুষ:১০.৩<br>নারী:৪৯.৬<br>(কিউএলএফএস, ২০১৬-১৭) | উভয়:২২ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| লক্ষ্যমাত্রা ৮.৮ সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ প্রদান ও শ্রম অধিকার সংরক্ষণ | | | | |
| ৮.৮.১ জেন্ডার ও অভিবাসীর অবস্থান ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হওয়ার ঘটনার হার | (ক) উভয়:৩৮২<br>পুরুষ:৩৬২<br>নারী:২০<br>(খ) উভয়:২৪৬<br>পুরুষ:১৭৭<br>মহিলা:১৯<br>(ডিআইএফই, ২০১৫) | (ক) উভয়:৭৫<br>পুরুষ:১০৫<br>নারীা:২৭<br>(খ) উভয়:৪৮৮<br>পুরুষ:২৮৫<br>নারী:২৪৮<br>(ডিআইএফই, ২০১৭) | (ক) <২০০<br>(খ) <১৫০ | মিশ্র; দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| এসডিজি ৯: অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবন | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ৯.১: গুনগত, নির্ভরশীল, টেকসই এবং অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ | | | | |
| ৯.১.১ প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটারে রাস্তার ঘনত্ব | ১৪.৪৮ (বিবিএস, ২০১৫) | ১৪.৬১ (বিবিএস, ২০১৭) | | সাম্প্রতিক তথ্যের অভাব |
| লক্ষ্যমাত্রা ৯.২: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি | | | | |
| ৯.২.১ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজন অবদান (%) | ২০.১৬<br>(বিবিএস, অর্থবছর ১৫) | ২১.৭৪<br>(বিবিএস, অর্থবছর ১৭) | ২১.৫ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| মাথাপিছু (স্থির মূল্যে ২০১০ মার্কিন ডলার) | ২৬০৭ (হিসাবকৃত, ২০১৩) | ৪২১০ (হিসাবকৃত, অর্থবছর ১৭) | | লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে |
| ৯.২.২ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং- কর্মসংস্থান (%) | ১৪.৪ (কিউএলএফএস, অর্থবছর ১৬) | ১৪.৪ (কিউএলএফএস, অর্থবছর ১৭) | ২০ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| লক্ষ্যমাত্রা ৯.গ.১ মোবাইল নেটওর্য়াক ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত | | | | |
| ২এ | ৯৯.৪ | ৯৯.৪৯ | ১০০ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ৩এ | ৭১ (বিটিআরসি, ২০১৫) | ৯২.৫৫ (বিটিআরসি, ২০১৭) | ৯২ | লক্ষমাত্রা অর্জিত |
| এসডিজি ১০: অসমতা হ্রাস | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ১০.১: সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০ (%) জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা | | | | |
| ১০.১.১ সর্বনিম্ন আয়ের ৪০ (%) জনসংখ্যার মধ্যে মাথাপিছু আয় বা খানা ব্যায়ের প্রবৃদ্ধির হার | জনগণের বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার: (ক) নিচের ৪০%: ৩.১% (খ) মোট জনসংখ্যার: ৬.৬% (এইচআইইএস) | | (ক) ৮% (খ) ৮% | সাম্প্রতিক তথ্যের অভাব |
| ১০.খ.১ উন্নয়নে সম্পদের রকমঅনুযায়ী প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ওডিএ:৩০০৫.৫ এফডিএ:১৮৩৩.৯ (ইআরডি, ২০১৫) | ওডিএ:৩৬৭৭.২৯ এফডিএ:২৪৫৪.৮ (ইআরডি, ২০১৭) | ওডিএ:৬০০০ এফডিআই: ৯০০০ | ওডিএ যথাযথ আছে; (অন ট্র্যাক) এফডিআই এর ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| এসডিজি ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ | | | | |
| লক্ষমাত্রা ১৩.১: সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রার্কতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা | | | | |
| ১৩.১.১ প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত ও নিখোঁজ মানুষসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সংখ্যা | ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা: ২০১৪ সালে প্রতি ১০০,০০০ মানুষের মধ্যে ১২,৮৮১ জন (আইসিসিএইচএল, বিবিএস, ২০১৫) | প্রাপ্ত নয় | ৬৫০০ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| ১৩.১.২ দুযোর্গ ঝুঁকি হ্রাস করণে সেনড্যাই কাঠামো (২০১৫-২০৩০) অনুসরণ করে যে সব দেশ দুর্যোগ ঝঁকি হ্রাসে কৌশল অবলম্বন ও ব্যস্তবায়ন করেছে সেই সব দেশের সংখ্যা | | বাংলাদেশের জন্য এমওডিএমআর দূযোর্গ, ঝুঁকি হ্রাস ও কৌশল গ্রহণ করেছে (২০১৬-২০২০) | | কৌশল পত্র অনুমোদনের জন্য খসড়া হিসাবে আছে |
| লক্ষমাত্রা ১৩.২: জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি | | | | |

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১৩.২.১ একটি সম্বনিত নীতি/কৌশল/পরিকল্পনা প্রণীত বা প্রযুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিসহ গ্রিনহাইজ গ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনা যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয় (যেমন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান, জাতীয় যোগাযোগ, দ্বিবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা অন্যান্য) | জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান (২০১৫) | বিসিসিএসএপি (২০০৯-২০১৮) | | প্যারিস জলবায়ু চুক্তির জন্য প্রস্তুতি দরকার |
| এসডিজি ১৪: টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৫ ২০২০ নাগাদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রাপ্ত সবচেয়ে ভালো বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার কমপক্ষে ১০% সংরক্ষণ | | | | |
| ১৪.৫.১ সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি | | ৭.৯৪% (ডিওএফ, ২০১৬-১৭) | ১০% | যথাযথ আছে(অন ট্র্যাক) |
| এসডিজি ১৫: স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পনুরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভুমির অবক্ষয় রোধ ও ভুমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পনুরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৫.১ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তজার্তিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলির সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা | | | | |
| ১৫.১.১ মোট ভুমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত | ১৭.৫% (ডিওই, ২০১৫) | প্রাপ্ত নয় | ২০% | ক্যানপির বিস্তৃতি প্রয়োজন |
| ১৫.১.২ বাস্তুতন্ত্রের ধরণ অনুযায়ী সংরিক্ষত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত | (ক) পৃথিবী সম্পর্কিত: ১.৭% (২০১৪-১৫, এমওইএফ) (খ) মিঠাপানি: ১.৮% (২০১৩-১৪, এমওইএফ) | প্রাপ্ত নয় | (ক) ২.৪% (খ) ৫% | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৫.৫ প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোর অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য জরুরিভিত্তিতে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়রোধ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসূমহের বিলোপ প্রতিরোধ ও সুরক্ষাদান | | | | |

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১৫.৫.১ লালতালিকা সূচক (আরএলআই) | (ক) স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী:০.৫৫<br>(খ) পাখি: ০.৯১<br>(গ) সরীসৃপ: ০.৭৬<br>(ঘ) উভচর প্রাণী: ০.৮৫<br>(ঙ) মিঠা পানির মাছ: ০.৮১<br>(চ) কাকড়া জাতীয় প্রাণী: ০.৯০<br>(ছ) প্রজাপতি: ০.৬৪<br>(আইইউসিএন, ২০১৭) | প্রাপ্ত নয় | নির্ধারণ হয় নাই | ২০১৫ সালে সর্বশেষ আরএলআই করা হয় |
| এসডিজি ১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১ সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা | | | | |
| ১৬.১.১ জেন্ডার ও বয়স ভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা॥ | উভয়:১.৮<br>পুরুষ:১.৪<br>নারী:০.৪<br>(এমওএইচএ, ২০১৫) | উভয়:১.৬৫<br>পুরুষ:১.২৩<br>নারী:০.৪২<br>(এমওএইচএ, ২০১৭) | উভয়:১.৬<br>পুরুষ:১.৩<br>নারী:০.৩ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৬.২ শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশুপাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতা অবসান | | | | |
| ১৬.২.২ জেন্ডার বয়স ও শোষণের ধরন ভেদে, প্রতি ১০০,০০০ জনে মানবপাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা | উভয়:০.৮৫<br>পুরুষ:০.৫৩<br>নারী:০.৩২<br>(এমওএইচএ, ২০১৫) | উভয়:০.৫৮<br>পুরুষ:০.৩৬<br>নারী:০.২২<br>(এমওএইচএ, ২০১৮) | উভয়:০.৫ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| ১৬.২.৩ যৌন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে, এমন ১৮-২৯ বছর বয়সী তরুন-তরুণীর অনুপাত (%) | মহিলা:৩.৪৫<br>(ভিএডব্লিউ জরিপ, ২০১৫) | নারী: ০ | নার: ৩ | |
| এসডিজি ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা | | | | |
| ১৭.১.১ উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত (%) | ৯.৬<br>(এফডি, অর্থবছর১৫) | ১০.১৬<br>(এফডি, অর্থবছর১৭) | ১৬ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| ১৭.১.২ অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত (%) | ৬৩<br>(এফডি, অর্থবছর১৫) | ৬৬.৪<br>(এফডি, অর্থবছর১৭) | ৬৫ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৩ বহুবিধ উৎস হতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ আহরণ | | | | |
| ১৭.৩.১ মোট অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত হিসাবে বৈদেশিক প্রত্যেক্ষ বিনিয়োগ (%) | ৫.৭<br>(বিআইডিএ, ২০১৫) | ৭.৪<br>(এফডি, অর্থবছর১৭) | ১৪ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |

| অভিষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক | ভিত্তি-বছর | বর্তমান অবস্থা | ২০২০ মাইলফলক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১৭.৩.১ক মোট অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত হিসাবে সরকারী উন্নয়ন সহায়তা (%) | ৮.৯ (ইআরডি, অর্থবছর১৫) | ১০.৯ (ইআরডি, অর্থবছর১৭) | ১১ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| ১৭.৩.২ মোট জিডিপি'র অনুপাতে রেমিট্যান্স পরিমাণ (মার্কিন ডলারে) | ৭.৮৫ (বিবি, অর্থবছর১৫) | ৫.১ (বিবি, অর্থবছর১৭) | ৭.৬০ | দৃষ্টি দেওয়া দরকার |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৪ যথোপযুক্ত সমন্বিত নীতিমালার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-পরিশোধ সক্ষমতা অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা দান | | | | |
| ১৭.৪.১ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা রপ্তানির অনুপাত হিসাবে ঋণ সেবা | ৫.১২ (ইআরডি, অর্থবছর১৫) | ৩.২৪ (এফডি, বিইআর, ২০১৮) | ৫ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনা বিষয়ে এবং এ সংশ্লিষ্ট অভিগমত্যার ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও অন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং (বিশেষত জাতিসংঘ পর্যায়ে) বিদ্যামান প্রক্রিয়াসূমহের মধ্যে উন্নত সমন্বয় ও বৈশিক প্রযুক্তিগত সমর্থন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তে জ্ঞানের আদান-প্রদান বাড়ানো | | | | |
| ১৭.৬.২ গতিভেদে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে স্থায়ী ব্রডব্যান্ড গ্রহীতার সংখ্যা | ২.৪১ (বিটিআরসি, ২০১৫) | ৩.৭৭ (বিটিআরসি, ২০১৬) | ৮ | যথাযথ আছে (অন ট্র্যাক) |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৮ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা | | | | |
| ১৭.৮.১ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের অনুপাত (%) | ৩০.৩৯ (বিটিআরসি, ২০১৫) | ৪৯.৫ (বিটিআরসি, ২০১৬) | ৪০ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |
| লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৯ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনার সমর্থনে দক্ষ ও সুনির্দিষ্ট সক্ষমতা-বিনির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিপাক্ষিক সহযোগীতা সহ আন্তর্জাতিক সহায়তা বাড়ানো | | | | |
| ১৭.৯.১ অঙ্গীকার অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মার্কিন ডলারে আর্থিক ও কারিগরী সহয়তার মূল্য (উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যম সহ) | ৫৭০.৮ (ইআরডি, ২০১৫) | ৩৬৭৭.২৯ (ইআরডি, ২০১৬) | ৯০০ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত |

## ২০১৬ থেকে প্রকাশিত এসডিজি বিষয়ক প্রকাশনা, জিইডি

| | |
|---|---|
| 1. | Integration of Sustainable Development Goals into the 7th Five Year Plan (February 2016) |
| 2. | A Handbook on Mapping of Ministries by Targets in the Implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) (September 2016) |
| 3. | Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (January 2017) |
| 4. | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনূদিত) (প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১৭) |
| 5. | Bangladesh Voluntary National Review (VNR) 2017: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world (June 2017) |
| 6. | SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective (June 2017) |
| 7. | A Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan (June 2017) |
| 8. | Bangladesh Development Journey with SDGs [Prepared for Bangladesh Delegation to 72nd UNGA Session 2017] (September 2017) |
| 9. | Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (March 2018) |
| 10. | National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs (June 2018) |
| 11. | Journey with SDGs : Bangladesh is Marching Forward [Prepared for Bangladesh Delegation to 73rd UNGA Session 2018] (September 2018) |
| 12. | এসডিজি অভিযাত্রা: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (সেপ্টেম্বর ২০১৮) |
| 13. | Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation (November 2018) |
| 14. | Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 (December 2018) |
| 15. | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮, প্রকাশ কাল এপ্রিল ২০১৯ইং |

# ২০০৯ থেকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

1. Policy Study on Financing Growth and Poverty Reduction: Policy Challenges and Options in Bangladesh (May 2009)
2. Policy Study on Responding to the Millennium Development Challenge Through Private Sectors Involvement in Bangladesh (May 2009)
3. Policy Study on The Probable Impacts of Climate Change on Poverty and Economic Growth and the Options of Coping with Adverse Effect of Climate Change in Bangladesh (May 2009)
4. Steps Towards Change: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction II (Revised) FY 2009-11 (December 2009)
5. Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2009 (2009)
6. Millennium Development Goals: Needs Assessment and Costing 2009-2015 Bangladesh (July 2009)
7. এমডিজি কর্ম-পরিকল্পনা (৫১ টি উপজেলা) (জানুয়ারি-জুন ২০১০)
8. MDG Action Plan (51 Upazillas) (January 2011)
9. MDG Financing Strategy for Bangladesh (April 2011)
10. SAARC Development Goals: Bangladesh Progress Report-2011 (August 2011)
11. Background Papers of the Sixth Five Year Plan (Volume 1-4) (September 2011)
12. 6th Five Year Plan (FY 2011-FY 2015) (December 2011)
13. Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2011 (February 2012)
14. Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021: Making Vision 2021 a Reality (April 2012)
15. Public Expenditure for Climate Change: Bangladesh Climate Public Expenditure and Institutional Review (October 2012)
16. Development of Results Framework for Private Sectors Development in Bangladesh (2012)
17. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) বাংলা অনুবাদ (অক্টোবর ২০১২)
18. Climate Fiscal Framework (October 2012)
19. Public Expenditure for Climate Change: Bangladesh CPEIR 2012
20. First Implementation Review of the Sixth Five year Plan -2012 (January 2013)
21. বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ণ (ফেব্রুয়ারি ২০১৩)
22. National Sustainable Development Strategy (2010-2021) (May 2013)
23. জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) [মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুদিত] (মে ২০১৩)
24. Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2012 (June 2013)
25. Post 2015 Development Agenda: Bangladesh Proposal to UN (June 2013)
26. National Policy Dialogue on Population Dynamics, Demographic Dividend, Ageing Population & Capacity Building of GED [UNFPA Supported GED Project Output1] (December 2013)
27. Capacity Building Strategy for Climate Mainstreaming: A Strategy for Public Sector Planning Professionals (2013)
28. Revealing Changes: An Impact Assessment of Training on Poverty-Environment Climate-Disaster Nexus (January 2014)
29. Towards Resilient Development: Scope for Mainstreaming Poverty, Environment, Climate Change and Disaster in Development Projects (January 2014)
30. An Indicator Framework for Inclusive and Resilient Development (January 2014)

31. Manual of Instructions for Preparation of Development Project Proposal/Prforma Part-1 & Part 2 (March 2014)
32. SAARC Development Goals: Bangladesh Progress Report-2013 (June 2014)
33. The Mid Term-Implementation Review of the Sixth Five Year Plan 2014 (July 2014)
34. Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2013 (August 2014)
35. Population Management Issues: Monograph-2 (March 2015)
36. GED Policy Papers and Manuals (Volume 1-4) (June 2015)
37. National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh (July 2015)
38. MDGs to Sustaiable Development Transforming our World: SDG Agenda for Global Action (2015-2030)- A Brief for Bangladesh Delegation UNGA 70th Session, 2015) (September 2015)
39. 7th Five Year Plan (205/16-2019/20) (December 2015)
40. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০ (জুন ইংরেজি থেকে বাংলা অনূদিত) (অক্টোবর ২০১৬)
41. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (অক্টোবর ২০১৬)
42. Population Management Issues: Monograph-3 (March 2016)
43. Bangladesh ICPD 1994-2014 Country Report (March 2016)
44. Policy Coherence: Mainstreaming SDGs into National Plan and Implementation (Prepared for Bangladesh Delegation to 71st UNGA session, 2016) (September 2016)
45. Millennium Development Goals: End- period Stocktaking and Final Evaluation Report (2000-2015) (September 2016)
46. A Handbook on Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) (September 2016)
47. Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (January 2017)
48. Environment and Climate Change Policy Gap Analysis in Haor Areas (February 2017)
49. Integration of Sustainable Development Goals into the 7th Five Year Plan (February 2017)
50. Banking ATLAS (February 2017)
51. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুদিত) (এপ্রিল ২০১৭)
52. EXPLORING THE EVIDENCE : Background Research Papers for Preparing the National Social Security Strategy of Bangladesh (June 2017)
53. Bangladesh Voluntary National Review (VNR) 2017 : Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world, (June 2017)
54. SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective (June 2017)
55. A Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan (June 2017)
56. 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 01: Macro Economic Management & Poverty Issues (June 2017)
57. 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 02: Socio-Economic Issues (June 2017)
58. 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 03: Infrastructure, Manufacturing & Service Sector (June 2017)
59. 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 04: Agriculture, Water & Climate Change (June 2017)
60 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 05: Governance, Gender & Urban Development (June 2017)

61. Education Sector Strategy and Actions for Implementation of the 7th Five Year Plan (FY2016-20)
62. GED Policy Study: Effective Use of Human Resources for Inclusive Economic Growth and Income Distribution-An Application of National Transfer Accounts (February 2018)
63. Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (March 2018)
64. National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the implementation of Sustainable Development Goals (JUne 2018)
65. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 1: Water Resources Management (June 2018)
66. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 2: Disaster and Environmental Management (June 2018)
67. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 3: Land use and Infrastructure Development (June 2018)
68. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 4: Agriculture, Food Security and Nutrition (June 2018)
69. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 5: Socio-economic Aspects of the Bangladesh (June 2018)
70. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 6: Governance and Institutional Development(June 2018)
71. Journey with SDGs, Bangladesh is Marching Forward (Prepared for 73rd UNGA Session 2018) (September 2018)
72. এসডিজি অভিযাত্রা: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৮)
73. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ) (অক্টোবর ২০১৮)
74. Bangladesh Delta Plan 2100: Bangladesh in the 21st Century (Abridged Version) (October 2018)
75. Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation (November 2018)
76. Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 (December 2018)
77. Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 (December 2018)
78. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টঃ বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ (ইংরেজি থেকে অনূদিত) (এপ্রিল ২০১৯)
79. Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh (May 2019)

Notes Date: ...../...../.....

Notes Date: ...../...../.....

Notes Date: ...../...../.....

Notes Date: ...../...../.....